মুহূর্ত্তেই জানকীনাথ অদৃশ্য হইলেন। সরযূও তাহাকে কিছু বলিল না, বা কোনরূপ বাধা দিল না।

(৫)

বিপদের উপর বিপদ! তাহার উপর বিপদ। বিপদের উপর দারুণ মনস্তাপ! স্বামীর বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে অলঙ্কার দিবার সময় সরযূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কথা একবার ভাবিয়া দেখে নাই। পর দিন প্রত্যুষেই তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে বালা অনন্তের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন; তখন সরযূ কি উত্তর দিবে? কিন্তু তাহার মনে সে প্রশ্ন একবারও উদিত হয় নাই। সংসারের প্যাকচক্রের কথা সরযূ কিছুই বুঝিত না।

পরদিন প্রাতঃকালে সরযূ শয্যা ত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র শ্বাশুড়ী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বউ মা! বালা অনন্ত খুলিয়া রাখিয়াছ কেন?" সরযূ চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্রী তাহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "যাও, যাও, আগে পরিয়া আইস।" তথাপি সরযূ উত্তর করিল না। তখন কর্ত্রী স্বয়ং তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শয্যা আলোড়িত করিলেন, কিন্তু অলঙ্কার দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বিস্ময় বাড়িল। তিনি জানিতেন তাঁহার গুণধর পুত্র গত রাত্রে ঘরে ছিলেন; তবে কি তিনিই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন? কর্ত্রী আসিয়া সরযূকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও সরযূ নীরব রহিল। কর্ত্রী যাইয়া সেই কথা কর্ত্তাকে বলিলেন। উভয়ে বিস্তর গবেষণা হইল; অবশেষে স্থির হইল, বধূ অলঙ্কার গোপনে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে; জানকীনাথ তেমন বদমায়েস নহেন। এইবার সকল দোষ সরযূর উপর পড়িল। কর্ত্তাগিন্নি বালিকাকে অবিরত বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তথাপি সরযূ স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথাই বলিল না।

এইরূপে ক্রমেই দিন যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সরযূর বিপদ ও যন্ত্রণা দিন দিন দ্বিগুণিত হইতে আরম্ভ করিল। জানকীনাথের পিতামাতা তাঁহাকে একবার বধূর অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যবাদী পুত্র কোন কথাই স্বীকার করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের সন্দেহ বাড়িল; তাঁহারা সরযূকে সর্ব্বদাই বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্য্যাতনের নানা যন্ত্রও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে সরলা বালিকার তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি?

(৬)

সব ফুরায়। ধন, জন, যৌবন কালে সকলই ফুরায়। ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা, পদগৌরব সময়ে সমুদায়ই ফুরাইয়া যায়। সকলই ফুরায়; কিন্তু ফুরায় না কেবল—আশা। যাহার স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সকলই চলিয়া গিয়াছে, ধন সম্পত্তি সমস্তই ফুরাইয়াছে, জীবন দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার তখনও আশা থাকে। যে মুমূর্ষু, ভীষণ যমদণ্ড প্রতিমুহূর্ত্তে যাহার মস্তকোপরি উদ্যত, আত্মীয় স্বজন যাহার জীবনাশা ছাড়িয়া দিয়াছে, সে কিন্তু নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি, সবই ফুরায় কিন্তু আশা ফুরায় না। আজি সরযূর কি তাহাই হইল? সরযূর যাতনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। স্বামীর নিষ্ঠুরতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। শ্বশ্রূ অবশেষে প্রকৃত বাঘিনী হইয়া দাঁড়াইলেন; শ্বশুর কংশের প্রতিনিধি হইলেন। অনশনে—অনিদ্রায়—অত্যাচারের অশেষ মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহ্য করিয়াও সরযূ পিতাকে কোন কথা জানায় নাই;—পিতা যতবার লইতে আসিয়াছিলেন, শ্বশুর শ্বাশুড়ী পাঠাইতে সম্মত হইলেও সরযূ সুখচরে যায় নাই। তাহার সকল আশা ফুরাইয়াছে; কেবল এই একমাত্র ভরসা আছে যে, স্বামী একদিন তাহাকে সরযূ বলিয়া ডাকিবে, একবার তাহাকে যত্ন আদর সোহাগ করিবে। কিন্তু ক্রমে সে আশাও ফুরাইয়া আসিল। এ জীবনে সরযূ একবার ক্ষণকালের জন্যও স্বামীর ভালবাসা, যত্ন, আদর, আপ্যায়ন—কিছুই পাইল না। তবে আর কি সুখে এ পাপ সংসারে থাকিবে? তবে আর কাহার মুখ চাহিয়া সকল যাতনা সহ্য করিবে? জানকীনাথ প্রত্যহ বাটীতে আসেন, আহারাদি যথা নিয়মে সমস্তই করেন; কিন্তু সরযূর সহিত একবারও দেখা করেন না। এককালের আদরের পুত্রবধূ আজি যেন বাপের কুটা,—দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণীপাকে যেন আলোড়িত হইতেছে; কেহ তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখে না; কেহ তাহার কোন খোঁজ খবরই রাখে না। একদিনের গৃহলক্ষ্মী যেন আজি কালি অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন বাটী

হইতে সে বিদায় হইলেই সকলে সুখী হয়। সরযূ তাহা বুঝিল। মানবের ভণ্ডতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। এ পাপ পৃথিবীতে আর তাহার থাকিবার ইচ্ছা হইল না। কাহার কাছে থাকিবে? সংসারে তাহার সকলই আছে; পতি আছে, পিতা আছে, মাতা আছে, শ্বশুর আছে, শাশুড়ী আছে, পিতার ধন আছে, শ্বশুরের ঐশ্বর্য্য আছে। কিন্তু তাহার এমনই দুর্ভাগ্য যে, সব থাকিয়াও কিছুই নাই। সেই জন্য সরযূ এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। এখন মনে হইতেছে, একবার স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইবে। একবার তাঁহার চরণে মুখ রাখিয়া জনমের শেষ বিদায় লইবে। তিন বৎসর হইল সরযূ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। এই তিন বৎসরে সে ত্রিশ বৎসরের বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে; এই তিন বৎসরে সে ত্রিশটী দুঃখময় জীবনের যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। আজি দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে; বিষের বাটী উথলাইবার উপক্রম করিতেছে। তবে আর কেন?

বৎসরান্তে আবার সেই জন্মাষ্টমী আসিয়া দেখা দিল। আজি জীবের যাতনা দূর হইবে; পৃথিবী হইতে দুঃখ শোক বিদায় গ্রহণ করিবে। লোকে সুখী হইবে। কিন্তু সরযূর সুখ কোথায়? ইহ সংসারে সরযূর সুখ নাই,—পরলোকে তাহার সুখ, অনন্ত দেবের অনন্ত সংসারে তাহার অনন্ত সুখ, ভগবানের গোলকধামে তাহার অনন্ত সুখ। সরযূ আজি সেই সুখের জন্য পাপ সংসার ত্যাগ করিবে। জন্মাষ্টমীর গভীর নিশীথে বহির্দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া বাটীর বাহিরে আসিল। ধীরে—ধীরে—ধীরে, পা আর সরে না; মন তীব্র তুরঙ্গের ন্যায় তরস্বী, কিন্তু পা আর সরে না। তখনও আশা একবার প্রাণপতিকে দেখিয়া লয়। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। জানকীনাথ কোথায়?—দূরে কলিকাতায়—কদর্য্য কুস্থানে। কে দেখা দিবে? ধীরে—ধীরে—ধীরে, বন্দী যেমন শৃঙ্খলবদ্ধ পদদ্বয় অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যায়; স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হতোদ্যম হইয়া সরযূ সেইরূপ ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটে অবতরণ করিল। সেই নিবিড় জলদ দল সেই ভীম গর্জ্জনে উন্মত্ত ভৈরব বেগে শত শত মদমত্ত মাতঙ্গযূথের ন্যায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। জানি না জগতের কোন্ দিকে কোন্ প্রান্তে কোথায় এক সুখের সংসার আছে, তাহারই অন্বেষণে বুঝি মেঘগণ ধাবমান হইতেছে। মেঘের সে সন্দেহ থাকিতে পারে, সংসার বিরাগী যোগীর সে সন্দেহ থাকিতে পারে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও বরং সে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু সরযূর সে সন্দেহ নাই। সরযূ আশৈশব গঙ্গাকূলে থাকিত; আজীবন গঙ্গা মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিতা, গঙ্গা পতিতপাবনী; গঙ্গা স্বর্গের সোপান। গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভবা—শম্ভুর জটাবিহারিণী। সেই গঙ্গায় স্নান করিতে সকলে জানে না; কিন্তু সরযূ জানে। তাই সরযূ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন দৃঢ় রাখিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে সেই সুর-তরঙ্গিনীর পবিত্র জলে ডুব দিল;—ডুব দিল, কিন্তু আর উঠিল না! * * * *

এক বৎসর পরে সেই জন্মাষ্টমীর দিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীরামপুরের সেই ঘাটে একটা পুরুষ আসিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল :—

Howl, howl, howl!—O! you
are men of stones:
Had I your tongues and eyes, I'd
mention so
that heaven's vault should
crack."

অনেকে পাগল বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল; অনেকে তাহাকে চিনিতে পারিল। সে—শ্রীযুক্ত জানকী নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ। অনুতাপের দারুণ দাবদাহে সে পাগল হইয়া গিয়াছে। সেই দিন,—সেই দুর্দ্দিন হইতে সাত বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু সেই বিকট কণ্ঠে সেই বিকট "Howl, howl!" বাক্য আজিও গঙ্গাতীরস্থ অনেক শ্মশানে অনেকে শুনিতে পায়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

# কবিতা-গুচ্ছ।

## দক্ষিণা।

যবে মহাপ্রেমদান সমাপন করি
হাসিমুখে সুধাইনু "অয়ি হৃদিরাণি,
আরো কিবা চাও? সব দিয়াছিত তুলে
একে একে ওই তব চারু পাদ-মূলে
ভক্ত ভৃত্য মত।" তুমি রোষ নেত্র ভরে
দানের দক্ষিণা কিছু চাহিয়া আমারে
করিলে বিব্রত সখি! বিশ্বামিত্র সম
নির্ম্মম নিষ্ঠুর। বিতরিয়া মন মম
তোমারে দক্ষিণা দিনু মোর 'তৃষা'খানি
পাত হাত, লও তুলে অয়ি মনোরাণি!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তিবিনোদ।

* * *

## প্রদীপ-হস্তা।

বাম করে দীপ ল'য়ে কে তুমি ললনা!
চলিয়াছ আঁধার এ বন-পথ বাহি'?
তব পদ অনুশরি', তোমা পানে চাহি'
চলিয়াছি, আঁখি তব আলোক-লগনা!
জানিনা যেতেছি কোথা কোন্ পথ দিয়া
বিদিত বা অবিদিত। শুধু ওগো প্রিয়া!
রুণু রুণু রুণু রুণু নূপুরের ধ্বনি
মরমের মাঝে মম চলিয়াছি গণি';
নয়নের 'পরে শুধু দীপ-শিখা তব
জ্বলিছে আলোক-তনু আশার মতন।
কোথা মোরে নি:ত চাও কোন্ অভিনব
আলোকের দেশে? কণ্টকিত দু'চরণ
চলিতে পারে না আর লতার বাঁধনে,—
কোথা শেষ কোথা শেষ বল গো ললনে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

* * *

## দুঃখ।

(১)

চিরসঙ্গী নহ তুমি জানিয়াছি মনে
ছায়া ওগো জীবনের পথে!
আঁধার-বসন পরি' আরোহি' এসেছ
মায়া ওগো অশ্রু-মনোরথে।
মেঘে বজ্রে হুড়াহুড়ি দু'দণ্ডের তরে
দেখিয়াছি কত শত বার
জীবন-গগন-তলে কেন কাঁপে প্রাণ
নেহারিয়া উদয় তোমার?

(২)

গগনে গো ঘন মেঘ অন্তরালে লয়
শুচি শশিরুচি মনোহর
তোমার ও ছায়া কিগো কেবলি আঁধার
পিছে কিছু নাহি কি সুন্দর?
মেঘে বজ্রে আস্ফালন ক্ষণকের তরে
তার পরে বিপুল বর্ষণ
তোমার মেঘের মন্দ্রে শুধু হাহারব
পাছে তার কোথায় মিলন?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

* * *

## সৌন্দর্য্য।

কোথা' তুমি ওগো, চিরবাঞ্ছিত, চিরসুন্দর মূরতি?
ক্ষুব্ধ হৃদয়, চির অশান্ত, নাহিক নিমেষ বিরতি।
এনেছি পুষ্প গন্ধমোদিত,
বক্ষ রক্ত চন্দন চিত,
লহ দেবি! লহ অর্ঘ্য চরণে করিগো বারেক আরতি।
(ওগো) চিরসুন্দর মূরতি!
ফুটিলে ইন্দু শারদ-গগনে,
তুমি কিগো দেবি! শুভ্র বসনে,
জোৎস্না মূরতি ধরি' আনমনে খেলাও স্বরগে ভুবনে?
(ওগো) চির চঞ্চল চরণে?
যবে বসন্ত শ্রান্ত গমনে,
নেমে আসে ধীরে মর্ত্ত্য ভবনে,
পাই কিগো তব বসন গন্ধ অন্ধ মলয় পবনে?
(ওগো) স্বপ্ন মোদিত বসনে!
মৃদু মঞ্জুল কুঞ্জ ভবনে,
গুঞ্জন রত ভৃঙ্গবদনে,
শিঞ্জিত তব মঞ্জরী গীতি পশে কিগো দেবি শ্রবণে?
(ওগো) চির অনুমেয় বচনে!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রদীপ।



শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী।

MOHILA PRESS 36, *Patuldanga Stree*




৫ম ভাগ। | শ্রাবণ—অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। | ৮—১২ সংখ্যা।

## রোমে রাজ-তন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র।

( ১ )

রোম একদিনে গঠিত হয় নাই। রোমের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলস্, কিন্তু সংগঠন ও বিস্তার-কর্ত্তা অনেক, বোধ হয় অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক রোম্যান্। সে যাহা হউক, সেই সকল বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ কিংবা তত্ত্ব অনুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্যের বাহিরে। রোমের আদিম অবস্থার দুই চারিটি কিম্বদন্তির ব্যাখ্যান করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট রহিব।

এল্বালঙ্গার রাজা প্রোকারের দুই পুত্র, নিউমিটর্ ও এমিউলিয়স্। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ মিউমিটর রাজ্যভার গ্রহণ করিলে কনিষ্ঠ এমিউলিয়সের গাত্রদাহের আর অবধি রহিল না। দুর্য্যোগ বুঝিয়া অগ্রজ নিশ্চেষ্ট হইলেন; পিতৃ-সিংহাসনে অনুজ অধিষ্ঠিত হইলেন। এই নশ্বর জীবলোক নিউমিটরের পুত্রপৌত্রাদির বাসস্থানের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা রাজ-প্রসাদেই দিব্যধামে প্রেরিত হইলেন; মর্ত্ত্যভূমে অবস্থানের অবসর পাইলেন কেবল কন্যা রিয়া। তিনিও চিরকৌমার্য্য ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই পিতৃব্যের কুটিল দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তবুও আপদ ঘুচিল না; আবার নিউমিটরের বংশলোপের পথে কণ্টক উপস্থিত, কুমারী রিয়া অন্তঃসত্ত্বা! যথাসময়ে দুইটী জমজ সন্তান প্রসূত হইল। এমিউলিয়সের আদেশ "কুলটা রিয়ার কলঙ্ক-চিহ্ন টাইবার-বক্ষে নিক্ষিপ্ত হউক।" কার শক্তি রাজ-আজ্ঞা প্রতিরোধ করে।

সৌভাগ্যবশতঃ জোয়ারের জলে কুল প্লাবিত থাকিলেও তখন নদে ভাঁটার আরম্ভ হইয়াছিল; শিশু দু'টি এক বৃক্ষতলে ডাঙ্গায় রহিয়া গেল; জল নিম্নে সরিয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে মৃতবৎসা এক ব্যাঘ্রী তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া স্বীয় স্তন-ক্লেশ দূর করিল। তদবধি ব্যাঘ্রী প্রত্যহই তাহাদিগকে স্তনদান করিত। অবশেষে এক মেষপালক সন্তান দুইটীকে কুড়াইয়া লইয়া নিরপত্যা গৃহিণীকে উপহার প্রদান করিল। সেই স্নেহশীলার অবিশ্রান্ত যত্নে রমিউলস্ এবং রিমস্ দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বয়োপ্রাপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিপালকের মেষচারণের ভার গ্রহণ করিয়া চারকবৃন্দের নেতৃত্বে বৃত হইলেন। পালে কখন বাঘ পড়িলে তাঁহারাই রক্ষাকর্ত্তা, গ্রামে কখন ডাকাত আসিলে তাঁহারা দুজনই সকলের অগ্রগামী। বীরত্বে তাঁদের সুযশ গ্রামে গ্রামে প্রসিদ্ধ; দলে দলে ডাকাত ভয়ে ত্রস্ত। ভ্রাতৃযুগলের দেশখ্যাত পৌরষ ও জন্মবৃত্তান্ত রাজসমীপে পৌছিতে আর কালবিলম্ব ঘটিল

না। রাজা এমিউলিয়স অঙ্কুরেই বিষবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে অচিরে চেষ্টিত হইলেন; চেষ্টা ব্যর্থ হইল। জয়ী রমিউলস্ ও রিস্ মাতামহ নিউমিটরকে এল্বালঙ্গা রাজ্য পুনঃপ্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এখন আর এই রাজ্যমধ্যে অবস্থান অধীনতায় অনভ্যস্ত দৌহিত্রদের মনঃপূত নহে; ভিন্ন একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনই ইঁহাদের সঙ্কল্প। সমুদ্রতীর হইতে নয় ক্রোশ দূরে, টাইবার নদের বাম পার্শ্বে, বাল্য-লীলা ক্ষেত্র পেলেটাইন্ পর্ব্বতে সপ্ত-শৃঙ্গ ব্যাপিয়া এক সহর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই ভূমধ্যসাগরতটস্থ সভ্যজগতের ভূতপূর্ব্ব-রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম। রোমের নামকরণ সম্বন্ধে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার নিমিত্ত রমিউলস্ আজও জগতের সমক্ষে ভ্রাতৃহত্যার অপবাদগ্রস্ত। সে যাহা হউক, তাঁহার বাল্যসখা মেষপালকগণ ও এল্বালঙ্গার উদ্বৃত্ত জনসমূহ রোমের অধিবাসী হইলেন, এবং অন্যান্য স্থান হইতেও যথেষ্ট নাগরিক জুটিয়াছিল। পুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও নারীজাতির অভাবে রোম শীঘ্রই জনহীন হইয়া পড়িবে এই ভাবনায় অস্থির রমিউলস্ পার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহে বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। সেই প্রস্তাব সকলেই সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিল।

আজ রোমে বরুণোৎসব। চতুর্দিকস্থ রাজ্যাদির প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সপরিবারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; সকলেই স্বীয় স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও দুহিতা কিংবা ভগিনী-দিগকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। বলা বাহুল্য, আহূতগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী, এবং স্ত্রীদলে বৃদ্ধা অথবা বালিকা অপেক্ষা যুবতীর সংখ্যাই প্রবল। মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে আমোদ প্রমোদ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে; সকলেই আহ্লাদে আত্মহারা। অকস্মাৎ সঙ্কেতে আদিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রোম্যান্ যুবক এক একটী কিশোরীকে বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিল। অবস্থায় পড়িয়া বাক্যে প্রতিবাদ ভিন্ন তৎক্ষণাৎ কার্য্যে প্রবল বাধা প্রদান করিতে নিমন্ত্রিতগণ সম্পূর্ণ অক্ষম। যাহা ঘটিবার ঘটিল; কিন্তু সেবাইন্ জাতি প্রতিহিংসা ভুলিল না। আয়োজন উদ্যোগ বাহুল্যরূপে সম্পূর্ণ হইলে রাজা টাইটস্ টেটিয়সের পরিচালনে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত; রমিউলসের সহচরগণ কখনই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অপ্রস্তুত ছিল না। উভয় দলে অস্ত্র-বিনিময় আরম্ভ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে রণ ঘোরতর রূপ ধারণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে বিঘ্নের আশঙ্কিতা, আলু-লায়িত-কেশা, ছিন্নবসনা সেবাইন্ দুহিতা ও ভগিনীগণ,—সম্প্রতি যাহারা রোম্যান্ গৃহিণী ও জননী,—যুদ্ধোন্মত্ত স্বামী এবং পিতা ও ভ্রাতৃগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সকলকেই এই অস্বাভাবিক যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইলেন। উপস্থিত স্থলে বৈরভাবে সম্মিলিত দুই জাতি পরস্পরে মিলিয়া সখ্য-সূত্রে এক হইয়া গেল।

দীর্ঘকাল রাজত্বের পর একদা রমিউলস্ তাঁহার সুসজ্জিত অনুচরদিগকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যরাহুগ্রস্ত এবং বসুন্ধরা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে রমিউলসের জন্মদাতা দেবতামঙ্গল, একখানা জ্যোতির্ম্ময় রথে আবির্ভূত হইয়া—তাঁহাকে সালিঙ্গনে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান-করিলেন। রাহুমুক্ত দিবালোকে আর কেহ কখনও তাঁহাকে ভূতলে দেখিতে পায় নাই।

রমিউলসের অন্তর্ধানে দুঃস্থ প্রজাগণ ধর্ম্মপ্রকৃতি নিউমাকে রাজপদে বরণ করিলে এই রাজর্ষির সুশাসনে রাজ্যের দেবক্রিয়াদির সুব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্য প্রভাবে দেবমন্দিরের অচেতন প্রস্তর মূর্ত্তিগুলিও নাকি নিউমার সহিত কথোপকথন করিত!

নিউমার মৃত্যুর পর প্রজাকুলের মনোনয়নে টিউলস্ হষ্টিলিয়স্ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহার শাসন-সময়ে এল্বালঙ্গা বিনষ্ট ও রোমরাজ্যে ভুক্ত হয়। বিবাদের প্রথম সূত্রপাত উভয় রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে। এতাবৎকাল দুই নগরে অত্যন্ত সদ্ভাব ও প্রীতি থাকা সত্বেও বল পরীক্ষা ভিন্ন আর সীমা নির্দ্ধারণের কোনই উপায় রহিল না। দুই পক্ষেই যুদ্ধার্থীগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত; পরস্পরের শত্রুপক্ষে নিজেদের অনেকানেক বন্ধুবান্ধব দেখিয়া সকলেই একটু অর্জ্জুনত্ব প্রাপ্ত হইলেও তখন শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের আর প্রয়োজন হয় নাই। তাহারা নিজেরাই স্থির করিলেন, "মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত রাজা যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা আমরা করিতে বাধ্য; তাহাতে যদি দোষ থাকে, সে দোষ,রাজার ও মন্ত্রীসভার।" এখন সকলেই সংগ্রামে উদ্যত। ইতিমধ্যে দুই দলের

সেনানীগণ স্থির করিয়াছেন বৃথা জ্ঞাতিবধের প্রয়োজন নাই, প্রতিপক্ষ হইতে তিন জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, ইহাতে যে পক্ষ পরাভূত, হইবেন তাহারা নিরাপত্যে জেতৃদলের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিবেন। রোমের পক্ষ হইতে হরেসিয়স্ উপাধিক তিন ভাই ও অপর পক্ষ হইতে কিউরেসিয়স্ নামধেয় তিন ভাই সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দূরে দুই পক্ষের সেনা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। এমন সময়ে এক জন হরেসিয়স্ হত হইলেন, তথনও রোম্যান্‌গণ আশায় বুক বাঁধিয়া আছে। এখন আর একটী হরেসিয়সের লীলা সাঙ্গ হইল; তৃতীয়টীও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে ভুলিলেন না। বিজয়োন্মত্ত তিন ভাই কিউরেসিয়স্ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। রোম্যান্ সৈনিকপুরুষগণ ক্ষোভে জর্জ্জরিত; অবশেষে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। ইত্যবসরে হরেসিয়সের অনুবর্ত্তী তিন ভাই কিউরেসিয়স্ গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুযোগ পাইয়া আবার হরেসিয়স্ বীর্য্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিউরেসিয়স্‌গণ তিন সহোদরই একে একে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এব্বালঙ্গা বাহিনীর অধিনায়ক মেটিয়স্ বিনা বাক্যব্যয়ে সসৈন্যে রোম্যান্‌দিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

রোমের বিবাদের আর শেষ নাই! কয়েকদিন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে না হইতেই আবার অন্য এক শত্রু উপস্থিত। এখন রোমের আদেশ অনুসারে মেটিয়স্ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে রোমের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কার্য্যকালে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া দৃশ্যপটে অঙ্কিতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অবশেষে রোম্যান্ পক্ষে বিজয়লক্ষ্মীর আবির্ভাব দেখিয়া রোমের যশোগানে তাহার স্বর পঞ্চমে চড়িল। কিন্তু রোম্যান্ জাতি শুদ্ধ মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইবার পাত্র নহে। রোমের কোপানলে এব্বালঙ্গার রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্র-কুটীর কিছুরই চিহ্নমাত্রও রহিল না। কেবল তাহাই নহে। মেটিয়সের দুই পা দুইখানা রথের চক্রে সুদৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইলে, রথ দুইখানা বিপরীত দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল; তাহার পুরুষোচিত দেহ দ্বিধা হইয়া গেল। ইহাও তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড কি না, বর্ত্তমান যুগে কে তাহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ।

আর একটী কথা বলা হয় নাই। জেতা হরেসিয়স্ বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ জিত কিউরেসিয়স্‌দের দেহাভরণাদি লুণ্ঠন করিয়া আনন্দ কোলাহলে রোমনগরে প্রবেশ করিলে, পথিমধ্যে তাঁহার ভগিনী লুণ্ঠিত দ্রব্যাভ্যন্তরে একটী আঙ্গরাখা চিনিতে পারিলেন। ইহা তাহারই স্বহস্তে প্রস্তুত এবং বাগ্‌দত্তস্বামী কিউরেসিসকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। জীবনের সকল আশারই শেষ দেখিয়া ভগিনী আর বিলাপ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু দিগ্‌ব্যাপি আনন্দোৎসবে এই ক্ষীণ বিলাপস্বর বীর হরেসিয়সের সম্পূর্ণ অসহ্য। বিজয়ীপুরুষের যে অসি উত্তপ্ত বীরশোণিতে পুষ্ট তাহা আর অবশেষে এই অবলার জল-শীতল রক্তপানে সঙ্কুচিত হইল না।

পরবর্ত্তী রাণা এঙ্কাস্ মার্সিয়সের সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার অভাব। ইঁহার রাজত্বকালে টার্‌কুইনিয়স্ প্রিস্কাস্ নামে এক ক্রোরপতি বণিক রোমে আগমন করেন। তিনি জেনিকিউলম্ পাহাড়ে উপস্থিত হইলে একটী ঈগল পাখী আকাশ হইতে তাহার মস্তকাভরণ কাড়িয়া লইল এবং ক্ষণেক অস্ফুট চিৎকার করিয়া আবার যথাস্থানে স্থাপন করিল। এতদ্‌সম্বন্ধে আবহবিদ্যালঙ্কৃতা সহধর্ম্মিণীর ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্ভর করিয়া তিনি রোমে সর্ব্বোচ্চ সম্মানলাভে সচেষ্ট হইলেন। মনস্কামনা অপূর্ণ থাকিল না। এঙ্কাসের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া তিনিই সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এঙ্কাসের পুত্রগণ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিশোধের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাহাদের উপদেশক্রমে দুইটী রাখাল বালক রাজার দৃষ্টিমধ্যে ঘোরতর কলহের ভান করিল এবং তৎপর রাজা প্রিস্কাসের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলে যখন তিনি নিবিষ্টমনে এক জনের অভিযোগ শ্রবণ করিতেছিলেন তখন অপর জন পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার মস্তকে সাংঘাতিক কুঠারাঘাত করিল। তেজস্বিনী রাণী টেনাকীল্ স্বামীকে অন্দরাভ্যন্তরে অপসারণ করিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং লোকসমাগম নিষেধ করিয়া প্রাসাদ ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে রাণী

বহির্দ্বারে সমাগত নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্বামী ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন ; সম্প্রতি তাঁহার আদেশ, যতদিন না তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন ততদিন আপনারা সকলে রাজ-জামাতা সার্‌ভিয়সের আজ্ঞাক্রমে নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য সমাধা করিতে থাকুন।" সার্‌ভিয়স্ টিউলিয়স্ দাসীর সন্তান হইলেও যে গুণে তিনি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহারই প্রভাবে রাজ্যে স্বীয় শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিলে প্রকাশ করা হইল, 'রাজা প্রিস্কাস্ আর জীবিত নাই।' এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্ব্বিয়স্ টিউলিয়স্‌ই রাজমুকুট পরিধান করিলেন।

কালক্রমে বয়োপ্রাপ্ত লিউসিয়স্ ও এরান্স নামে প্রিস্কাসের দুই পুত্র সার্‌ভিয়সের দুই কন্যার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। লিউসিয়স্ অত্যন্ত উদ্ধত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ; শান্তপ্রকৃতি স্ত্রী তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর দুর্ব্বল স্বভাব এরান্স ও বিলাসা-ভিলাসিনী গর্ব্বিতা স্ত্রী টিউলিয়ার প্রণয়লাভে হতাশ। কিন্তু টিউলিয়া লিউসিয়সের এবং লিউসিয়স্ টিউলিয়ার স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। শীঘ্রই তীক্ষ্ণধার ক্ষুর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জঞ্জাল অপসারিত করিলে প্রণয়ী-যুগল হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া আপনাদিগের রূপ ও গুণ ধন্য করিলেন। এখন মনোমত স্বামী পাইয়া উৎসাহে টিউলিয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ জলিয়া উঠিয়াছে। তাহারই নিয়ত উত্তেজনায় উত্তেজিত লিউসিয়স্, পিতার সিংহাসনে নিজের দাবী স্থাপনপূর্ব্বক সিনেট্ সমক্ষে দাসীর পুত্র সার্ভিয়সের নির্ব্বাসন-প্রার্থী হইয়া, কক্ষে প্রবেশ ও বিতণ্ডায় উদ্যত শ্বশুরকে পদাঘাতে সিনেট গৃহের নিম্নতলে নিক্ষেপ এবং স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তখনই টিউলিয়া আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে রাজোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন অভিবাদন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ইত্যবসরে ভগ্নপদ সার্ব্বিয়স্ হামাগুড়ি দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন দেখিয়া লিউসিয়সের জনৈক অনুচর এই অকর্ম্মণ্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ হইতে তাঁর অবিনশ্বর আত্মা মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাগমন কালে টিউলিয়ার রথ তথায় উপস্থিত হইলে সারথি রথের গতি সম্বরণ করায় তিনি তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া আদেশ করিলেন, "দাসীর সন্তানের মৃতদেহ রাণীর রথচক্রে দলিত ও নিষ্পেশিত হউক।"

লিউসিয়স্ এইরূপে রাজ্যধন লাভ করিয়া গর্ব্বিত টারকুইন্ নামে পরিচিত হইলেন! নিরন্তর প্রজা উৎপীড়নে ব্যস্ত থাকিলেও বিদেশে তাহার বিক্রম প্রকাশ করার ইচ্ছা এবং অবসর ছিল। তিনি এখন আর্ডিয়া আক্রমণ এবং অবরোধ করিয়াছেন। একদা সূর্য্যাস্তের পর তাঁহার দুই পুত্র সেক্সটস্ ও কলেটিনস্ শিবিরে বয়স্যপরিবেষ্টিত হইয়া মদ্যপানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁহাদের উভয়ের স্ত্রীর গুণাগুণের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল তাঁহারা তখনই রোমে ফিরিয়া যাইয়া দেখিবেন কাহার স্ত্রী কোন্ কার্য্যে ব্যাপৃতা। উভয়েই নিশিথে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেক্সটসের স্ত্রী সখীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ এবং হাস্য পরিহাসে মত্ত, আর কলেটিনসের স্ত্রী লুক্রেসিয়া স্বামীর নিমিত্ত একটী অঙ্গরাখা বয়নে ব্যস্ত। তাঁহারা আবার আর্ডিয়াতে ফিরিয়া আসিলে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিল লুক্রেসিয়া অধিক গুণবতী। কিন্তু সেক্সটসের ইহা অসহ্য হইল।

আবার আজ সেক্সটস্ কোন কার্য্যের ভান করিয়া আর্ডিয়া পরিত্যাগ করিলেন এবং আসিয়া ভ্রাতৃ জায়া লুক্রেসিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন নির্ম্মলচরিত্রা লুক্রে-সিয়া দেবরকে সসম্মানে গ্রহণ করিলে নিবিড় অর্দ্ধরজনীতে সেই পাপিষ্ঠ সাধ্বীর উপর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইল। সতীর সবল হৃদয় কিছুতেই অভিভূত করিতে না পারিয়া দুষ্টাত্মা ভয় প্রদর্শন করিল যে এখনই তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া এবং আর একটী ক্রীতদাস তাহার শয্যায় ছিন্নমুণ্ড রাখিয়া পরদিন তাহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ এবং স্বকৃত হত্যা স্বীকার করিবে। ভীতা লুক্রেসিয়া এতক্ষণে আর তাহার অমূল্য রত্ন লুণ্ঠিত হইতে বিশেষ বাধা প্রদান করিতে পারিলেন না। মণিহারা ফনিনী পরদিন প্রত্যুষে স্বামী এবং পিতাকে ডাকিয়া তাঁহাদের কাছে গত রজনীর সকল অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্বামীর পদতলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িলেন।

যখন এই দুর্ঘটনা নগরময় রাষ্ট্র হইল তখন প্রত্যেক রোম্যান্ অসিহস্তে প্রতিজ্ঞা করিল, "অত্যাচারী, ব্যভিচারী টারকুইনবংশের আর এই পবিত্র রোমরাজ্যে স্থান হইবে না।

(২)

রাজা ও রাজপদ এখন রোমের পদদলিত। ৫০৯ পূঃ খৃঃ অব্দে গর্ব্বিত টারকুইন সিংহাসনচ্যুত ও সবংশে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। রাজার রাজ্য এখন প্রজাসাধারণের নিজস্ব। সতীর সতীত্ব হরণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী প্রচণ্ড রাজবংশ আজ দেশে বিদেশে সাহায্যের ভিখারী।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। স্বদেশপ্রীতির লীলাক্ষেত্র রোম নগরেও স্বদেশদ্রোহীর অভাব হইল না। আবার টারকুইন্‌বংশ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চক্রান্তের সুরু হইল। চক্রান্ত পরিপক্কপ্রায়, এমতাবস্থায় সকল দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, দুষ্ট দল ধৃত হইল, তাহাদের নেতা স্বয়ং কন্সাল্ ব্রুটসের দুই পুত্র।

বিচারালয় আজ জনতায় পূর্ণ। বিচারাসনে পিতা, আর অভিযুক্ত লৌহদণ্ডবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ দুই পুত্র। সমগ্র জনতা স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। অপরাধীদ্বয় গর্ব্বিত দৃষ্টিতে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। বিচারপতি নয়ন উন্মিলন করিলেন ও আসামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—"এখানে আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ নাই, আমি বিচারপতি তোমরা অভিযুক্ত, আমিও রোম্যান্ তোমরাও রোম্যান্ ; বল তোমরা স্বদেশদ্রোহী কি না ; বল তোমরা নরপিশাচ টারকুইন্‌কে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছ কি না।"—"আমরা স্বদেশদ্রোহী নহি। আমরাও রোম্যান্, আমরাও তোমারই পুত্র, আমরাও তোমারই মত স্বদেশপ্রেমিক। আমরা জানি রাজার অভাবে রোমরাজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না, আমরা জানি এই রাষ্ট্রবিপ্লবে রোম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই শত্রুর আক্রমণে এই মহানগর, স্বর্গাদপি গরিয়ান্ আমাদের এই জন্মস্থান বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। রাজদণ্ড টারকুইন্‌দের হাতে পুনরার্পণ করা ব্যতীত রোমের আর রক্ষার উপায় নাই। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন আমাদের এই অভ্রান্ত বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে পূর্ব্ববৎ প্রয়াস পাইব।" প্রথম জন নিরস্ত হইলে দ্বিতীয় জন আরম্ভ করিল :—পুত্র পিতারই সদ্‌গুণের অধিকারী। তুমি যাহা দেশের মঙ্গলকর বুঝ তাহা করিতে বিরত হও না ; আমরাও যদি মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতাম তবে আমরা রোম্যান্ নামের গর্ব্ব উপভোগ করিতে পারিতাম না, তোমার পুত্রত্বের অনুপযুক্ত হইতাম। কিন্তু পিতা পুত্র উভয়ে একই বিষয় দেশের হিতকর বলিয়া মনে করিবে এবং একই উপায়ে তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিবে কে বলিল? সকলেরই চিন্তাশক্তি স্বাধীন। পিতার বাৎসল্য অপেক্ষা জননী জন্মভূমির প্রসন্নদৃষ্টি অত্যন্ত অধিক মূল্যবান্।"

একটী অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিচারপতি আদেশ করিলেন, "কোতোয়াল, মশান ভূমিতে লইয়া চল। জহ্লাদ, প্রস্তুত হও আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিব।"

অনতিবিলম্বে সকলই শেষ হইল। পুত্রহারা ব্রুটাস্ বধ্যগৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে জনতার মধ্য দিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

একে একে টারকুইন্‌দের অনেক অভিসন্ধিই ব্যর্থ হইল, তবুও চেষ্টার শৈথিল্য নাই। এবার রাজ্যচ্যুত রাজা টার্‌কুইন্ রোমের পুরাতন শত্রু ইট্রাস্ক্যান্ জাতির পদলেহনে প্রবৃত্ত হইলে ক্লুসিয়ম্ রাজ লার্ পর্সেনা তাহার বিপত্তিতে বিগলিত হইলেন। রোমবিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান আরম্ভ হইল। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লার্ পার্সেনা জ্যানিকিউলম্ পাহাড় অধিকার করিলেন, রোম্যান সৈন্য হটিয়া পড়িল। জ্যানি কিউলমের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে ইট্রাস্ক্যান্ জয়পতাকা সগর্ব্বে বাতাসের সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া রোম্যান্‌দিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

পর্সেনা এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার বিজয়োন্মত্ত সেনা পলায়নপরপ্রায় রোম্যান্‌দের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। টাইবার নদ পারাপারের একমাত্র সেতুর পার্শ্বে সৈন্যে সৈন্যে সম্মুখীন হইল, সংগ্রাম তুমুল বাঁধিল। এক দিকে স্বাধীনতা-ধন, অপর দিকে বিজয়স্পর্দ্ধা ; উভয়েরই উত্তেজনা তুল্য প্রবল। দলে দলে ইট্রাস্ক্যান্ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল ; তলোয়ার তীর বল্লম, পদ অশ্ব রথ, দলের পর দল আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু রোম্যান্ বীর হটিল না। বুকে ভিন্ন একটী রোম্যান্‌ও পৃষ্ঠদেশে আহত হইল

না। রোম্যান্ স্বাধীনতার গৌরব বুঝে, রোম্যান্ স্বাধীনতার মূল্য জানে যতই উচ্চদরে হউক আজ রোম্যান্ স্বাধীনতা ক্রয় করিবেই করিবে। আজ মূল্যদানে রোম্যান্ কৃপণতা করিল না, বীরহৃদয়ের তপ্তশোণিতে টাইবারের শীতল জল উষ্ণ হইয়া উঠিল; তবুও বুঝি স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইল না!

আর না! আর কতক্ষণ এই ক্ষুদ্র রোম্যান্ সেনা ঐ বিশাল ইট্রাস্ক্যান্ সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে! তূর্য্যধ্বনি হইল, "রোম্যান্, পশ্চাতে সেতু অতিক্রম কর, টাইবার নদ পার হইয়া যাও।" তাহাই হইল। কিন্তু যতক্ষণ সেতুটী বর্ত্তমান ততক্ষণ রোমের আশঙ্কার অবসান নাই। তিন জন রোম্যান্ বীর অগ্রসর হইলেন, যতক্ষণ না সেতুর অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় ততক্ষণ তাঁরা একটী বৈরীকেও সেতুর উপর পা ফেলিতে দিবেন না; ক্ষিপ্রহস্তে সেতুর ধ্বংশ আরম্ভ হইল। প্রবল বেগে ইট্রাস্কান্গণ তাহা রক্ষার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু সেই তিনটী বীর হৃদয় তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। তাঁদের হস্তে শত্রুগণ কদলিবৃক্ষের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত হইতে লাগিল। কোন পক্ষেই বীরত্বের অভাব নাই। স্বদেশ বাৎসল্য ও বিজয়লিপ্সা কেহই কাহার কাছে হার মানিল না।

কুঠারের আর কয়েকটী আঘাতে টাইবার বক্ষে সেতুর চিহ্নও থাকিবে না, তিনজনকেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করা হইল, কিন্তু হরেসিয়স্ আশঙ্কার ক্ষীণাদপি ক্ষীণ চিহ্ন রাখিয়াও নিরস্ত হইতে পারেন না। অন্য দুই জন নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে পৌছিলেন। এ দিকে পর্সেনা ও হরেসিয়স্ দ্বন্দযুদ্ধে মাতিয়া উঠিলেন, পর্সেনার অভ্রান্ত লক্ষে হরেসিয়স্ দক্ষিণ নেত্র হারাইলেন, তাহার উগ্র যন্ত্রণা অদম্য উৎসাহী রোম্যান্ বীরের অনুভূতিতেও তখন প্রবেশ লাভ পাইল না। ইতাবসরে আর একটীমাত্র আঘাতে সকল বিঘ্ন দুর হইল, আজকার মত রোম রক্ষা পাইল, হরেসিয়সের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। তিনি টাইবার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পাড়লেন। তাঁর পিছু পিছু একটা ইট্রাস্ক্যান্ বল্লম, আর পর্সেনার নিজ হস্তের বল্লম, ধাবিত হইল, তার বাম পদটী কাড়িয়া লইল। পঙ্গু বীর হরেসিয়স্ শীঘ্রই মাতৃক্রোড়ে, রোমনগরে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

অমিতবিক্রমী পর্সেনা রোম অবরোধ করিলেন। তাহার সেনা দলে দলে বাহির হইয়া দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নগরাভ্যন্তরে রসদ ফুরাইয়া গেল, রোম অনাহারে মুমূর্ষু। তখনও রোম মস্তক অবনত করিল না, পর্সেনার সন্ধির প্রস্তাবে কান পাতিল না, অত্যাচারী টার্কুইনকে আবার রাজপদে বরণ করিতে স্বীকৃত হইল না। অনাহারে মরিবে তাও ভাল তবুও রোম স্বাধীনতা বিকাইবে না।

ইট্রাস্ক্যান্ শিবিরে উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া রক্তবস্ত্র পরিহিত এক কবাটরক্ষা পুরুষ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত। অকস্মাৎ ছুরিকাঘাতে তাহার বপু নমিয়া পড়িল, নিমেষ মধ্যে দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। হন্তা রোম্যান্ যুবক কেইয়স্ মিউকিয়স্ ধৃত এবং পর্সেনার আসন সমীপে নীত হইলেন। তখন রাজ আদেশে এক প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কেইয়স্ মিউসিয়সকে ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে পর্সেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কেন তুমি ইহাকে হত্যা করিয়াছ, কে বা তোমার সঙ্গী, আর কি করিয়াই বা তুমি ইট্রাস্ক্যান্ শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ। সকল দুরভিসন্ধি সকল চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে এখন তোমার রক্ষা নতুবা এইক্ষণই জীবিতাবস্থায় তোমাকে দগ্ধ করা হইবে।" রোম্যান্ যুবক গর্ব্ববিকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "পর্সেনাকে হত্যা করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প ছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার ভুল হইয়াছে। আর এই দেখ পর্সেনা-বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় রোম্যান্ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে সব ভস্ম হইয়া গেল। তবুও একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দুর্দ্দান্ত পর্সেনা আমি একা নই, আরও তিন শত রোম্যান্ যুবক অষ্টপ্রহর তোমারই মৃত্যুচিন্তায় চিন্তিত, তোমারই মৃত্যুচেষ্টায় চেষ্টিত।" কথা শেষ হইতে না হইতে যুবকরত্ন এক লম্ফে অনল মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। রোমের স্বাধীনতা-স্থূর যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইল।

মানুষের যাহা সাধ্যায়ত্ব রোম তাহা করিল। মানুষ মানুষকে যুঝিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ স্বতঃই দুর্ব্বল। রোম্যান্ সম্মুখ সমরে মরিতে জানে কিন্তু

অনাহারে সবংশে ধ্বংশ হইতে চায় না। সন্ধি সিদ্ধ হইল। টাইবার নদের পরপারে সমস্ত রোম্যান্ অধিকার ইট্রাস্ক্যান্ রাজ্যে ভুক্ত হইল; সদ্ব্যবহারের প্রতিভূস্বরূপ সদ্বংশজাত কুড়িজন রোম্যান যুবক যুবতী পর্সেনার হস্তে প্রদত্ত হইল। কৃষিকার্য্যে ব্যতীত লৌহধাতু ব্যবহারের বহির্ভূত রাখিতে রোম প্রতিশ্রুত হইল তবুও টার্‌কুইন্ বংশ ফিরাইয়া গ্রহণ করিল না।

রোম্যান্ যুবতী ক্লোয়েলিয়া ও অপর নয় জন কিশোরী প্রতিভূ রক্ষকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন। এক গাঢ় অমানিশিথে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া টাইবার নদীতে ভাসিয়া ভাসিয়া রোমনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রোম বাক্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে ঘৃণা করিল, ক্লোয়েলিয়া সদলে পর্সেনার হস্তে পুনঃ প্রেরিত্ হইলেন। রোম্যানের দেবব্যবহার নিজের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় ভাবিয়া টার্‌কুইন্ পথেই ইহাদিগকে বিনাশ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই অপরাধে ইট্রাস্ক্যান শিবিরে বিশ্বাসঘাতক টার্‌কুইনের আর স্থান হইল না। তাহার শেষ আশা, রোম্যান্ সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের ভরসা চিরকালের নিমিত্ত শুকাইয়া গেল। রোমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পর্সেনা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন; কেবল তাঁহার পুত্র অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া জ্যানিকিউলম অধিকার করিয়া রহিলেন। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, "রোমের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং এরিসিয়া জয় করিও।'

পিতৃ আদেশ অনুসারে এরিসিয়া আক্রান্ত হইলে পর্সেনা-তনয় যুদ্ধের প্রারম্ভেই হত হইলেন। আসন্ন ধ্বংশের ভয়ে ভীত নেতাহীন ইট্রাস্ক্যান্ বাহিনী আজ দলিত শত্রু রোমের দ্বারে আশ্রয় ভিখারী। রোম আতিথ্যধর্ম্ম ভুলিল না। নগরতোরণ উন্মুক্ত হইল, শাণিত এরিসিয়্যান্ খড়্গাঘাত হইতে ইট্রাস্ক্যানগণ ত্রাণ পাইল। পর্সেনাও অকৃতজ্ঞ নহেন। রোম পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ব্বরাজ্য সকলই পুনর্লাভ করিল। এখন হইতে রোম সুপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের অধীনে অপ্রতিহত গতিতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইল।

শ্রীমনোমোহন রায়।

# গুল-বাহারের উদ্দেশে।*

কে তোরা বাজাতি বীণা, গভীর নিশায়
তুলিতি কেমন তান? হেলায় খেলায়
সুরে সুরে কোন্ মায়া করিয়া সৃজন
ভুলাইতি রাজ্যহারা ভূপতির মন?
ভাই বোন্ তোরা দুটি রাজার সন্তান,
পিতার দুলাল, কবে শুকাইল প্রাণ,
চকিতে মিলায়ে গেলি যুগ্ম স্বপ্নপ্রায়,
পাশাপাশি দোঁহে! না জানি সে দিন, হায়,
কি দারুণ বেজেছিল করুণার বুকে,
হতভাগ্য পিতা যবে অশ্রুশূন্য দুখে
চেয়েছিল উর্দ্ধে! কি অজ্ঞাত মোহভরে
এ কা'র অন্তর মাঝে, কত বর্ষ পরে
উঠিছে তোদের পানে সে স্মৃতি উছাসি;
স্বদেশী কবির অশ্রু নিস্ ভালবাসি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

* নবাব মিরকাসিমের কন্যা গুল, ও পুত্র বাহার ভাগ্যচ্যুত পিতার সহিত গুপ্তাবাসে আশ্রয় লইয়াছিল। কথিত আছে, উহারা প্রতিদিন বীণাবাদন করিয়া চিন্তাপ্রপীড়িত নবাবের চিত্ত বিনোদন করিত। এক দিন মিরকাসিম কার্য্যব্যপদেশে বহুক্ষণ বাহিরে ছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পুত্র কন্যার মৃত দেহ পাশাপাশি শায়িত রহিয়াছে।




## যক্ষ-পত্নী।

প্রভুশাপে ফিরে পতি বিরহে বিজনে।
প্রাণসমা প্রিয়তমা চক্রবাকী প্রায়
সুদীর্ঘ যামিনী দিবা কাটে বা কেমনে—
ক্ষুণ্ণ মনে দিন গনে শূন্য অলকায়!
রুখু-কেশ-মেঘে আছে চাঁদমুখ ঢাকি',
শিশির-বিশীর্ণ কিবা বিবর্ণ নলিনী;
জানালায় জ্যোৎস্না হেরি' মুদি' আসে আঁখি—
বারি-সিক্ত আধ-সুপ্ত স্থল-কমলিনী!
বিরহ-সুতনু অঙ্গ গৃহকোণে লীন,
পেতেছে হৃদয় খানি করিয়া বিস্তার—
লুপ্ত অন্তরাল নদী নগেন্দ্র গহিন।
স্বপ্নে আলিঙ্গন, জাগি' অশ্রু উপহার!
একি দুঃখ যক্ষবালা অয়ি বিরহিণী,
জাগ্রত স্বপনে প্রিয়-উৎসঙ্গ-সঙ্গিনী!

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

# রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন,

শিবপুর।

একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষের শাসনভার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানির কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে অনেক ধন-সম্পদ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঐ সকল ধনীগণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহরের বাহিরে এক একটি উদ্যান-ভবন থাকিত। ঐ সকল বাগান-বাটি কলিকাতার অনতিদূরে সাধারণতঃ ভাগীরথীর তটদেশেই নির্ম্মিত হইত। বাটির সংলগ্ন বাগানগুলি নানাবিধ বৃক্ষলতাদিপূর্ণ ও বৃহদায়তনের ছিল। প্রতি সপ্তাহের শেষেই ঐ উদ্যানসমূহের অধিকারীগণ, বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিমল শান্তিলাভের আশায় তথায় আসিয়া দুই এক দিন করিয়া বাস করিতেন।

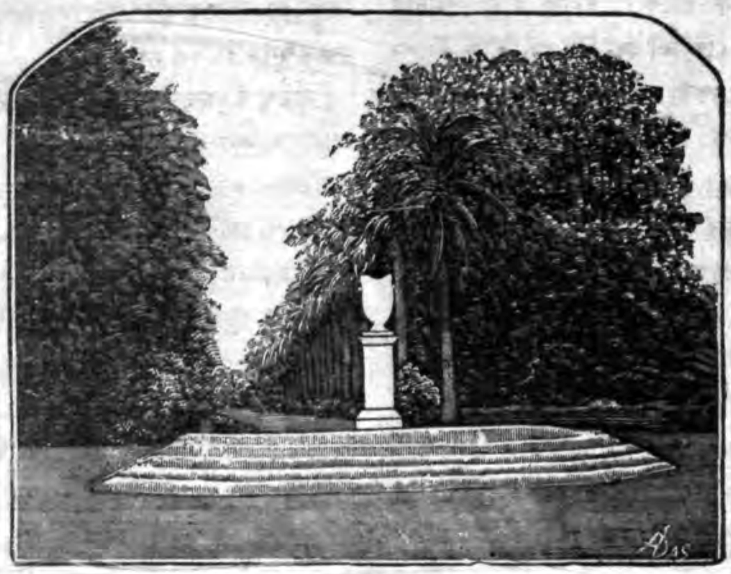
কলিকাতার দক্ষিণাংশস্থিত বর্ত্তমান খিদিরপুরের, পরপারে যে স্থানে ভাগীরথী বক্রভাব ধারণ করিয়াছেন, সেই স্থানের নাম শালীমার। পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারের সৈনিক-সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কীডের একটি গ্রাম্য-আবাস ছিল। কীড বিবিধ বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন, সাধারণতঃ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ও শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের স্থাপয়িতা বলিয়াই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। শালীমার পয়েন্ট হইতে পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ যে স্থানে স্থাপিত আছে, ঐ সমুদয় ভূমিই কর্ণেল কীডের উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি নানা দেশ হইতে বহুবিধ মূল্যবান বৃক্ষের চারা আনাইয়া নিজ উদ্যানে রোপণ করিয়াছিলেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কীড বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট সেগুন কাষ্ঠ, চা, তামাক, কাফি, তুলা ও নানাবিধ মসলাদির চাষবাসের পরীক্ষার্থে কলিকাতার অনতিদূরে কোন স্থানে একটি উদ্যান স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলাতে কোর্ট-অব-ডিরেক্টরগণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা ইহা অনুমোদন করেন।

কীডের নিজ উদ্যানের পশ্চিমে প্রায় তিনশত একার জমি উক্ত উদ্যানের জন্য লওয়া হয় এবং কর্ণেল কীডকেই তথাকার অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তিনি, সেগুন কাষ্ঠ কোম্পানির জাহাজাদি নির্ম্মানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া, প্রথমে ঐ বৃক্ষ রোপণ করিয়া উদ্যানের কার্য্য আরম্ভ করেন। চতুস্ত্রিংশ বৎসরের চেষ্টার পর তিনি সেগুনের আবাদে সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ হন। তৎপরে ঐ স্থানের কিয়দংশ বিশপ মিডল্‌টন্‌কে বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে প্রদান করা হয়। তিনি যে বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উহাই এক্ষণে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বিশপকে উক্ত ভূমি প্রদান করিয়া যে দুইশত একার জমি অবশিষ্ট রহিল, উহাতেই বর্ত্তমান বোটানিক্যাল গার্ডেন নির্ম্মিত হইয়াছে।

কীড্ সেগুন কাষ্ঠের আবাদে অকৃতকার্য্য হইয়া দারুচিনি ও অন্যান্য মসলার চাষে ব্যাপৃত হন। ইহাতে তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যার্থ হয় নাই। তৎপরে তিনি পরীক্ষার্থে চা ও সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষ করেন, ইহাতেও তিনি সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দের ২৬এ মে তারিখে কর্ণেল কীড কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। যদিও তিনি তাঁহার উইলে নিজ উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। সাউথপার্ক ষ্ট্রীটের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধি স্তম্ভ এক্ষণে আর চিনিতে পারা যায় না। কীডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মেজর এলেক্‌জেণ্ডার কীড (Major Alexandar Kyd R. E.) বোটানিক্যাল গার্ডেনে তাঁহার একটি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মনোরম স্তম্ভ স্থাপন করেন; সেটি অদ্যাপিও উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। পর পৃষ্ঠায় তাহার ফটোগ্রাফিক চিত্র প্রদত্ত হইল। কর্ণেল কীডের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পদে আর কাহাকেও অবৈতনিক ভাবে না রাখিয়া, ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস্ হইতে একজন উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্ উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করাই স্থির করিলেন। ডাক্তার রক্সবর্গকে (Dr. Roxburgh) কীডের পদে নিযুক্ত করা হইল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে উদ্যানের ভিতর গঙ্গার


কর্ণেল কীডের স্মৃতিস্তম্ভ।

ধারে অধ্যক্ষদিগের বাসের নিমিত্ত একটি সুরম্য বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া ডাঃ রক্সবার্গ তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থিতি কালে 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' (Flora Indica) নামক একখানি ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার মৃত্যুর পর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রক্সবার্গ ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন।

রক্সবর্গের পর ওয়ালিচ, (Wallich) ফ্যাকোনার (Falconer) গ্রিফিথ (Griffith) টমসন, (Thomson) এবং এণ্ডারসন (Anderson) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একে একে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে সার জি, কিং (Sir G. King, M. D., K. C. I. E., F. R. S.) ইহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে। বোটানিক্যাল গার্ডেন পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। এতাবৎকাল উদ্যানের অনেক উন্নতি সাধিত হইলেও কিং সাহেবের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য বৈজ্ঞানিক বৃক্ষলতাদি সংগৃহীত হওয়াতে উদ্যানের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইঁহারই সময়ে উদ্যানের স্থানে স্থানে নূতন বৃক্ষ শ্রেণীকৃত ক্ষুদ্র পথ, মনোরম সরোবর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া (Victoria Regia) নামক বৃহৎ জলপদ্ম ও অন্যান্য বিবিধ জাতীয় পদ্ম এবং নানা প্রকার বিলাতি পুষ্প বৃক্ষ সকল তাঁহারই যত্নে আনীত হইয়া প্রথমে এই উদ্যানে স্থান পায়।

ডাক্তার কিং কেবলমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াই নিরস্থ হন নাই; তিনি ইহার আভ্যন্তরিণ উন্নতি সাধন করিতেও যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য তরুলতা দূরদেশ হইতে আনাইয়া তিনি এই উদ্যানে রোপন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভিদতত্ত্ব বিজ্ঞানের ছাত্র মণ্ডলীর নিকট এই উদ্যানের উপকারিতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

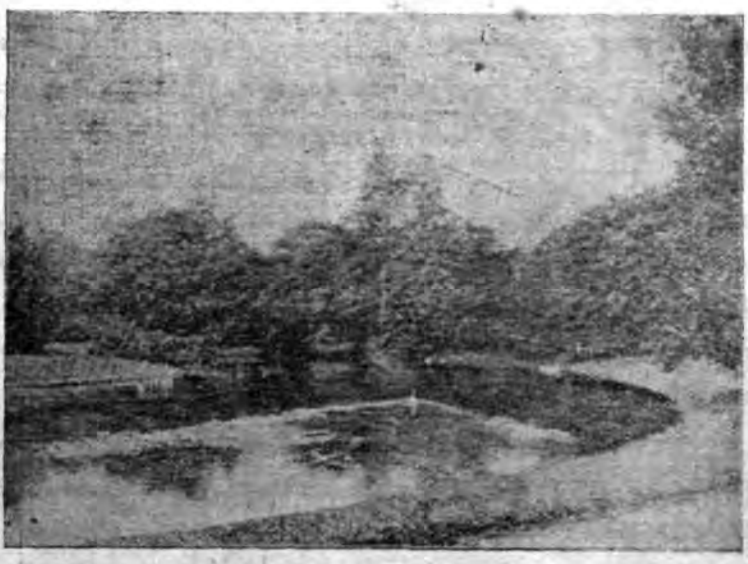
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কিং 'শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। অদ্যাবধি এই পুস্তকের সাত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট এই পুস্তক অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ব্রিটিশ-সিকিমে সিনকোনার প্রচলন দ্বারা ভারতবর্ষে উক্ত ঔষধের মূল্য হ্রাস করার মূল ডাক্তার কিং। এদেশে যখন কুইনাইনের প্রচলন প্রথম আরম্ভ হয়, তখনকার তুলনায় ইহার বর্ত্তমান মূল্য অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার কিংএর সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, তিনি যে পূর্ব্ব অধ্যক্ষগণের অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তাহা বোধ হয় আর পুনরায় বলিতে হইবে না।

অতি সংক্ষেপে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের উৎপত্তি ও পূর্ব্ব ইতিহাস বলা হইল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মধ্যে যে সকল মূল্যবান ও মনোরম বৃক্ষলতাদি এবং রমণীয় দির্ঘিকা, বৃক্ষশ্রেণীকৃত রম্যপথ ও কুঞ্জ সকল শোভা উৎপাদন করিতেছে তাহাদের বর্ণনা করা অসম্ভব।

সূর্য্যোদয়কাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই সরকারি বাগান

সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ইহার মধ্যে রক্সবার্গ এভেনিউ, ওরিওডক্সা এভেনিউ প্রভৃতি পথ গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওরিওডক্সা এভেনিউয়ের এক প্রান্তে কয়েকটী প্রশস্ত শ্বেত সোপানোপরি কর্ণেল কীডের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে। অপর তিন দিক হইতে তিনটি পথ আসিয়া এই স্তম্ভের নিকট শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কি সমস্ত উদ্যানের মধ্যেও ওরিওডক্সার সমতুল্য একটিও পথ নাই। ইহার উভয় পার্শ্বে মর্ম্মর স্তম্ভ সদৃশ কিউবা দেশীয় একপ্রকার বৃহদাকারের তালবৃক্ষ আছে, তাহার পরই গাঢ়বর্ণের মেহগিনী তরু বিরাজিত। জ্যোৎস্নালোকে এই তালবৃক্ষগুলি মেহগিনীর কৃষ্ণছায়ার পার্শ্বে রজত স্তম্ভবৎ দেখায় এবং অদূরে কীডের স্মৃতি-স্তম্ভটি এক অনুপম শোভায় শোভিত রহিয়াছে।

ওরিওডক্সা এভেনিউ হইতে কিছু দূরে গমন করিলেই উচ্চতরুশ্রেণী পরিবৃত একটি সুন্দর সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার নাম হংস সরোবর। ইহাতে হংস ও নানা জাতীয় জলচর পক্ষী সকল বাস করিয়া থাকে। ইহার নিকটে বিদেশীয় লতা, গুল্ম রক্ষণোপযোগী তৃণাচ্ছাদিত লৌহ নির্ম্মিত একটি বৃহৎ বৃক্ষবাটিকা আছে। উহার মধ্যে উষ্ণপ্রধান দেশের বিবিধ প্রকারের উদ্ভিদ সকল যত্নের সহিত সুসজ্জিত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ তিনটি বৃক্ষবাটির মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই সকল বৃক্ষবাটিগুলি পুষ্পপল্লবাদিতে বড়ই মনোহর শোভা ধারণ করে। এই বাটির কিঞ্চিৎ উত্তরে অষ্টকোন বিশিষ্ট এইরূপ আর একটি লৌহ নির্ম্মিত 'পামহাউস' আছে। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবিধ প্রকার ছোট ছোট তাল জাতীয় বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে।



হংস সরোবর।

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার রক্সবার্গের নাম স্মরণীয় রাখিবার জন্য 'রক্সবার্গ এভেনিউ' নামে অশোকশ্রেণী শোভিত একটি রাস্তা আছে, উহার এক প্রান্তে রক্সবার্গের একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপিত আছে। এই পথ অতিক্রম করিয়াই উদ্যানের গৌরব স্বরূপ, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত দৃশ্য মহান্ বটবৃক্ষ দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হুকার তাঁহার 'হিমালয়া জরনেল'এ এই বিশাল তরুর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, তখন উহা উচ্চে ৮০ ফিট্ ছিল। ডাক্তার ফ্যকোনার যখন প্রথম আইসেন, তখন ইহার কেবলমাত্র উননব্বইটি লম্বমান শিকড় শাখা হইতে ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহার সংখ্যা চারি শতেরও অধিক। প্রবল ঝটিকায় এই বিশাল বটবৃক্ষের সামান্য অংশ নষ্ট হইয়াছে। পরপৃষ্ঠায় ইহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

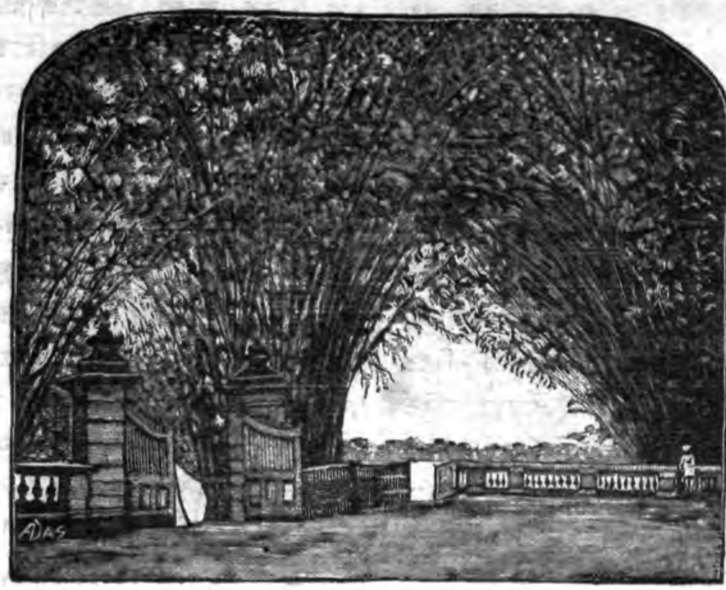
উদ্যানের উত্তর-পূর্ব্ব কোনে আর একটি বটবৃক্ষ আছে সেটির আকারও নিতান্ত ছোট নহে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বৃক্ষের উপরও বিশেষ যত্ন রাখিয়াছেন, যাহাতে ইহাও ভবিষ্যতে উদ্যানের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই বট ভিন্ন শিশু, সেগুন ও কতকগুলি শত বৎসরের মেহগিনী বৃক্ষ আছে; ঐ সকল বৃক্ষের অধিকাংশ ডাক্তার রক্সবর্গের সময় রোপিত হইয়াছিল। এদেশে আমরা সচরাচর পাঁচ, সাত জাতীয় বংশ দেখিতে পাই, কিন্তু এই উদ্যানে যেরূপ বহুজাতীয় বংশের সংগ্রহ আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।



বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রসিদ্ধ পামহাউস্।



বোটানিক্যাল গার্ডেনের মহানুবটবৃক্ষ।




বাঁশবক্ষ।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝটিকায় বাগানের যে ক্ষতি হইয়াছিল, এই কয়েক বৎসরে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এই ঝড়ের পঞ্চদশ বৎসর পরে শিবপুরের পরপারে অযোধ্যার নবাবের চিড়িয়াখনা হইতে কোনরূপে পিঞ্জরমুক্ত হইয়া একটা ব্যাঘ্র সন্তরণ দ্বারা বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করে এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ বিয়ারম্যানকে নিকটে পাইয়া আক্রমণ করে ; তিনি দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সে যাত্রায় রক্ষা পান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক বৎসর পরেই বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

এই উদ্যানের অনুপম শোভা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। আমরা সকলকে একবার শিবপুরে যাইয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীহরিহর সেঠ।

# খেদা।

—০:*:০—

( ৩ )

বন্য-হস্তিযূথকে কিরূপে খেদামধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়, তাহা আমরা গত বারে সংক্ষেপে বলিয়াছি ; এখন কি প্রণালীতে এই দুর্দ্দান্ত হাতীগুলিকে বন্ধন করিয়া বশীভূত করিতে হয়, তাহাই বলিব। হাতীর দল খেদায় প্রবিষ্ট হইলে প্রথমতঃ কুন্‌কী হাতী খেদার মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিয়া যে হাতীগুলিকে প্রথমে বন্ধন করিতে হইবে তাহা নির্ব্বাচন করে, পরে দুইটি কুন্‌কী হাতী এক একটি খেদা-প্রবিষ্ট বন্যহস্তীর পাশে গিয়া এরূপভাবে তাহাদের শরীরে হেলিয়া পড়ে যেন এই হাতীটী কিছুতেই নড়িতে চড়িতে না পারে। তার পর শিক্ষিত কুন্‌কী হাতী দুইটি উহাকে মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া চাপ দিতে দিতে খেদার বেড়ার নিকটে লইয়া যায় ; শেষে বেড়ার নিকটে গিয়া আরও একটুকু জোরে চাপ দিলেই গরীব জঙ্গলী হাতী বেচারি নীচে গড়িয়া যায় ; তখন চতুর শিকারী ক্ষিপ্রহস্তে বেড়ার সহিত বন্য হস্তীর পিছনের পা দুটি খুব শক্ত দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দেয়। এই প্রকারে উপযুক্ত সংখ্যক হস্তী

বদ্ধ হইলে ধৃত ও কুন্‌কী হস্তীর গলায় গলায় বাঁধা হয়, তখন বেড়ার বাঁধও খুলিয়া দিতে হয়। এই স্থলে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আরও একটুকু কাজ করিতে হয়। বন্য হাতীর পিছনের পায়ে পায়ও বাঁধিয়া দেওয়া উচিত; এই কার্য্যগুলি সুসম্পাদিত হইলে ধৃত হাতীগুলিকে খেদার বাহিরে আনিয়া বহিঃস্থিত বড় বড় গাছে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। গাছের নিকট গেলে আবার দুইটি কুন্‌কী হাতী আসিয়া প্রত্যেক বন্য হস্তীর দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুর্ব্বের ন্যায় চাপিয়া ধরে। ইহাতে বিপন্ন হাতীটি নড়িতে চড়িতে না পারায় শিকারী আসিয়া সেই গাছের সহিত শক্ত দড়ি দ্বারা হাতীটিকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। এই বন্ধনকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্পন্ন করার নিয়ম অর্থাৎ শিকারীর বুদ্ধি প্রভাবে গাছের সহিত হাতীর পিছনের পা ও গলা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হয়।

এইরূপ বন্ধন-দশায় কিয়ৎকাল রাখিলেই ধৃতহস্তীর শক্তি সামর্থ্য বা মদোন্মাদ সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হয়। বন্ধন সময়ে বিপন্ন হাতীটি যে প্রকার ভীষণ ধস্তাধস্তি হুড়াহুড়ী করে তাহা না দেখিলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। যখনই এই বদ্ধ হস্তী ছাড়িয়া দেওয়া হয় অমনি সে ভূমিতে পড়িয়া নিজের শক্তি-প্রভাবে পুনরায় স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, এই বৃথা চেষ্টা বা ধস্তাধস্তির ফলে উহার চতুর্দ্দিকস্থ ভুমি বেশ কর্ষিত হইয়া হয়। এই ব্যাপারের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বুদ্ধিহীন হস্তী জাতীর অযথা-শক্তি প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। এই আবদ্ধ ক্রোধান্ধ হস্তি-যূথ ভূমিতল আহত করে এবং শুণ্ড প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ বিকট শব্দ করে যে, তাহা শুনিলে রণপ্রিয় সাহসিক সৈনিক পুরুষেরও মুহূর্ত্তের জন্য হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হাতীর দল শুধু ভূমি কর্ষণ বা বৃথা গর্জ্জন করিয়াই নিশ্চেষ্ট রহে না। ইহারা তখন যাহা কিছু সম্মুখে পায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই শুড় দ্বারা আছড়াইয়া ফেলে। তখন হাতীর ঐ ভীষণ শুণ্ড-অস্ত্রের নিকটে যিনি যাবেন, তাহারই ভবের খেলা সমাপ্ত হইল মনে করিতে হইবে। অনেক সময়ে দূরে অবস্থিত থাকিলেও বিপন্ন হইতে হয়। ইহারা শুড় দিয়া ঢিল লাঠী ইত্যাদি ছুড়িয়া মারিতে বেশ কৃতবিদ্য। যে হাতী ধরার বিষয় বর্ণনা করিতেছি, তাহার আর একটি ভীষণ দৃশ্য এই স্থলে চিত্রিত করিয়া প্রদীপের পাঠকদিগকে উপহার প্রদানের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই খেদায় ২০৩টী হাতী আবদ্ধ হইয়াছিল। এই দ্বিশতাধিক হস্তী ভিন্ন ভিন্ন রূপে শৃঙ্খলিত, হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বন্ধন মুক্তির চেষ্টা করিতেছে, প্রত্যেকে হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ করিতেছে। সকলেই ক্লেশের সহিত শরীর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতেছে, এক গভীর দুঃখে প্রত্যেকেরই চক্ষু দিয়া উষ্ণ অশ্রু পতিত হইতেছে। ইহাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে এক বচনাতীত ভাবের উদয় হয়। উল্লিখিত প্রক্রিয়াতেই হাতীগুলি ক্রমশঃ শীকারীগণের অধিনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যখন দেখা যায়,হাতীর দল সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে, তখনই উহারা যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বশীভূত হস্তীযূথ যখন স্থানান্তরে নীত হয়, তখন ইহাদের বাচ্চা গুলি বড়ই আমোদ প্রদান করিয়া থাকে। বদ্ধ হস্তী তাহার বাচ্চাটিকে এরূপে টানিয়া নিয়া যায় যে, দেখিলে মনে হয় যেন একটি ধাত্রী অবাধ্য ছেলেকে বলপূর্ব্বক টানিয়া নিয়া যাইতেছে। ঐ হস্তী শাবকটীও বাস্তবিক ধাত্রী-আকৃষ্ট ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ক্রোধে চীৎকার করিতে থাকে। উপমাটা একটু হাস্য জনক হইল। কিন্তু কি করিব, ঘটনাতে এইরূপেই মনে হয়। হাতীগুলি বশীভূত হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অতি সন্তর্পণে চালনা করিতে হয়। কোনও একটি বন্য ধৃত হস্তীকে স্নান করাইতে হইলে দুইটি কুন্‌কী হাতীর সাহায্যে উহা নির্ব্বাহ করিতে হয়। প্রাণী জগতে হস্তী দেহ ও বল বিভবে যেরূপ সৌভাগ্যবান্ আয়ুষ্কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ। হাতী বিশাল দেহশালী হইলেও সামান্য প্রাণীর ন্যায় সন্তরণপটু। বড় বড় নদী হাতী বেশ সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে। হাতী যে অতি মূল্যবান জন্তু তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে কি? হাতী কিরূপে ধরিতে হয় তাহাই সাধারণের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র গুপ্ত।

সম্পূর্ণ।

# কবীর।

কবীর রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই বিষ্ণু ভজে সেই সর্ব্বপূজ্য হয়॥

হীনবংশোদ্ভব হইলেও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কবীর সকলের পূজ্য। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান আছে যে, স্বীয় বিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতামহ একদিন রামানন্দের নিকট গমন করেন। কন্যাটিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। "পুত্রবতী হও" বলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই অব্যর্থ আশীর্ব্বাদের ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। যথাসময়ে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

একে যুবতী, তায় পতিহীনা, সুতরাং প্রচ্ছন্ন-প্রসূতা মাতা বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। পুত্র লইয়া কি করিবেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অপযশ ভয়ে তাঁহাকে পুত্রের মায়া ত্যাগ করিতে হইল। পথের ধারে সদ্যপ্রসূত পুত্রটীকে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহে আসিলেন।

কথায় আছে, "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?" একটী জোলা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। পথপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত শিশুটীকে দেখিয়া তাঁহার মায়া জন্মিল। তিনি তাহাকে গৃহে আনিয়া পত্নির হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং অপত্যনির্ব্বিশেষে কবীর তাঁহাদিগের গৃহে প্রতিপালিত হইলেন।

কবীর নীচজাতীয়, সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষাগ্রহণে অধিকার নাই। তবে তিনি রামানন্দের শিষ্য হইলেন কিরূপে? কথিত আছে যে, একদিন তিনি কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়া আছেন, ভোর হয় হয়, সূর্য্যোদয় তখনও হয় নাই, আলো আঁধারে মিশিয়া কোলাকুলি করিতেছে, এমন সময়ে রামানন্দ স্নানার্থী হইয়া যেমন ঘাটে নামিবেন, কবীরের গাত্রে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। তিনি সশব্যস্তে রাম রাম বলিয়া উঠিলেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "মনই গুরু।" মনই কবীরের গুরু হইলেন; মনই তাঁহার উপদেষ্টা হইলেন। সেইদিন হইতে কবীর রাম নামই ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং মনোমন্দিরে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

কাপড় বুনিয়া কবীর জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। কাপড় বুনিবার সময়ে, নলী চালাইতে চালাইতে তিনি "সীতারাম সীতারাম" ভজন করিতেন। কাম ও নাম, এক সঙ্গে তাঁর দুইই চলিত। একদিন তিনি একখানি কাপড় বুনিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে গেলেন। তাঁহার হাতে কাপড়খানি দেখিয়া একজন বৈষ্ণব সেখানি চাহিলেন। বস্ত্র প্রার্থীকে বস্ত্রখানি দিয়া মাতার ভয়ে তিনি এক স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া রাম নাম জপ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র কবীরের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলদের পৃষ্ঠে অনেক দ্রব্য চাপিয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন।

ফুলের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িলে মধুমক্ষিকারা সেখানে আসিয়া আপনিই যুটে; তাহাদিগকে আর খবর দিতে হয় না। তাঁহার হৃদয়ে যেই ভক্তির ফুল ফুটিল, অমনি তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি-পিপাসু অনেক লোক তাঁহার নিকট আগমন করিল। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার গৃহে ভক্তের হাট বসিল।

এক ঈশ্বরের সন্তান জ্ঞানে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমানচক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, "আলি ও রামের সন্তানেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার ভগবান, তিনিই আমার পীর," তাঁহার পবিত্র জীবন দর্শনে ও মধুর উপদেশ শ্রবণে অনেক হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে লাগিল। ধর্ম্ম মত লইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ জন্মিতে পারে, সেই আশঙ্কায় তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন, "সকলের সহিত আলাপ করিবে, সকলের সহিত মিশিবে, হাঁজী হাঁজী সকলকে বলিবে, কিন্তু আপনার স্থানে অবস্থান করিবে।" আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানে কোন ফলোদয় হয় না। গঙ্গায় স্নান, একাদশী পালন,

মস্তক মুণ্ডন, তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন এবং নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যদি ভগবৎ প্রেমে শির সমর্পিত না হয়, মনের ময়লা না যায়, হৃদয়ের ঘোর দূর না হয়, তবে এ সব বৃথা শ্রম মাত্র। হাড়ের মন্দির মাংসের দ্বারা বাঁধা আছে ইহাতে ভগবান আছেন। ভগবদ্দর্শনের জন্য কাশী গয়ায় যাইতে হইবে না; শান্ত, দান্ত ও সমাহিত হইয়া আত্ম-পুরীতে প্রবেশ করিলে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে। সত্য, দয়া, ক্ষমা, ধীর ও বিচার, এই কয়টী নীতি পালন করিলে জগতের সুখ বৃদ্ধি হয় ও নিজের মঙ্গল সাধিত হয়। কবীরের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম।

তাঁহার তিরোভাবে দেহ সৎকার লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে দৈববাণী হইল "শবাবরণ উন্মোচন কর।" অনন্তর শবাবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল যে, কয়েকটী মাত্র ফুল পড়িয়া আছে; শব নাই। বিবাদ মিটিল। অর্দ্ধেক ফুল লইয়া হিন্দুরা দাহ করিল অপরার্দ্ধ লইয়া মুসলমানেরা সমাধিস্থ করিল।

গীতায় আছে, ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ধর্ম্মই সুখ ও শান্তির পথজ্ঞানে জীবন্মৃত ভারতে মহাপ্রভু কবীর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক জগাই মাধাইর উদ্ধার হইল, উদ্ধত প্রকৃতি শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিল, সংসার শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, পাহার ও জঙ্গলে অবস্থান করিয়া জীবন্মুক্ত কবীরদেবের ধ্যান ধারণায় কতলোক তাঁহার দেব প্রকৃতি লাভ করিল। পাতঞ্জল ঋষি যথার্থই বলিয়াছেন যে, মহাপুরুষের চিন্তায় মানুষ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করে। হায়! মানবীয় চরিত্রের মহাপুরুষদিগের এরূপ প্রভাব দর্শন করিয়াও লোকে মহাপুরুষের চিন্তা ছাড়িয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গের অনুসরণ না করিয়া, স্বেচ্ছাচরণ পূর্ব্বক সংসারকে দুঃখ ও কষ্টের রঙ্গভূমিতে পরিণত করিতেছে!!!

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

## আবাহন।

(আজি) শারদ নিশিতে, এস প্রাণ সখা  
আমার কুটীর পানে,  
আমি তোমার লাগিয়া, রয়েছি জাগিয়া,  
একাকী তোমারি ধ্যানে।  
পূত জ্যোছনায় ধোয়া, সুরভী কুসুম  
দলে, দলে, আছে ফুটি,  
হের আনন্দ যেনবা পড়েছে ছড়ায়ে  
দুঃখের বাঁধন টুটি।  
কিম্বা ত্রিদিব নিবাসী দেব শিশুগণ  
করিতেছে সুধা ফেলি,  
তা'রা আপনা পাশরি, সুধা সাগরের  
দিয়াছে প্রণালী খুলি।  
আজ, বিষাদ আঁধার গিয়াছে সরিয়ে  
সব (ই) শান্তি হাসি মাখা,  
তুমি বিষাদ সরায়ে এ হৃদয় মাঝে,  
ধীরে ধীরে দেও দেখা।  
আজি পূজিব তোমারে, অভিষেক করি'  
নয়নের শত ধারে,  
মোর, পরাণের যত গূঢ় অভিলাষ  
অরপিব উপহারে।  
শুধু বিমল সোহাগ, নব অনুরাগ—  
খেলিবে অসীম ভাবে,  
তারা নিতি নব ভাবে উঠিবে ফুটিয়া,  
কত মত শোভা পাবে।  
কভু, আমি, তুমি হব, তুমি, হবে আমি  
অপরূপ নব সাজে,  
পুনঃ, দু'জনে মিলিয়া, খেলিব হরষে  
প্রেমের সাগর মাঝে।  
তবে, এস প্রাণ সখা, ত্রিদিব হইতে,  
তুমিতো দেবতা এবে,  
আমি তো মানব, মোর আবাহন  
তুমি কি চরণে নেবে?

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা।

# ভূষণ।

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মের বশেই আরব্ধ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মোসলমান-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল। পরপদানত অবসন্নপ্রায় হিন্দু জাতির মধ্যে বহুদিনের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তেজস্বিতার সঞ্চার হইতেছিল।

আত্মশক্তির প্রতি প্রণষ্ট বিশ্বাসের পুনরুদ্রেক, বোধ হয়, এই প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অসাধারণ যোধশক্তিগুণে প্রাচীন হিন্দুগণ নবোৎসাহসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী আরব-পাঠানদিগের বীর্য্যকৌশল ব্যর্থ করিয়া বহুদিন আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেও সঙ্ঘশক্তির অভাবে পরিশেষে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক বিজেতার বশ্যতা-স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের চিরঘৃণিত জাতির তেজোদর্পের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হওয়ায় আত্মশক্তির পর্য্যাপ্ততা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে সন্দেহাশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহাই এদেশে মোসলমান শাসন বদ্ধমূল হইবার পক্ষে এক প্রধান কারণস্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু নরপতিগণ স্বাভাবিক তেজস্বিতা বশতঃ মধ্যে মধ্যে মস্তকোত্তলন-পূর্ব্বক মোসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনে সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্বপরাজয়ফলে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে যে নৈরাশ্য ও অবসাদের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহাদিগের উদ্যম সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। মোসলমানগণের নিয়োগ-ক্রমে উচ্চ রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু সর্দ্দারগণ শাসন-সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় তাঁহাদিগের ভাগ্যে জেতৃজাতির নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা-লাভ ঘটিতে লাগিল। যে হিন্দুগণ "কাফের" বলিয়া পদে পদে বিজেতার নিকট অবজ্ঞাত হইতেন, যাঁহাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম ও শুদ্ধান্তচারিণী-দিগের মর্য্যাদা প্রবলপরাক্রম বিধর্ম্মীদিগের ঔদ্ধত্যে পুনঃ পুনঃ উপহত হইত, তাঁহারা এক্ষণে নানা বিষয়ে জেতৃ-সমাজের সমকক্ষতা-লাভ-পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের প্রধান রক্ষক বা আধারস্তম্ভ বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। তখন হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে আত্মশক্তির অভাব সম্বন্ধে অমূলক আশঙ্কা স্বতঃই অপনোদিত হইল। ক্রমশঃ নৈরাশ্যের স্থানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পদলেহনপরতার স্থানে তেজস্বিতা ও আত্মগ্লানির স্থানে জাতীয় গৌরবগর্ব্বের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র হিন্দুজাতির অন্তস্তলে যে নূতন ভাবপ্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা শাসক-সম্প্রদায়ের সামান্য দুর্ব্ব্যবহারে বা ঈষৎ অবজ্ঞায় সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষেত্র-ভেদে কোথাও ধর্ম্ম-অবলম্বনে, কোথাও হৃদয়-অবলম্বনে এবং কোনও স্থানে বা ব্যক্তিগত ও জাতিগত মর্য্যাদা-রক্ষার সূত্র-অবলম্বনে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভারতবর্ষের শাসন-বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

এই প্রতিক্রিয়ার স্রোতকে যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা ও অপরিমেয় ক্ষমতাবলে প্রবল প্রবাহে পরিণত করিয়া মোসলমানদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগের নাম বিশদ অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদিগের ভাগ্যে সেরূপে স্বীয় প্রতিভা-পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটে নাই, অথচ যাঁহারা সেই নবীন ভাবস্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মহত্ত্বও হিন্দুজাতির চক্ষে কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে। তাই বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় কাব্যেতিহাসের জীর্ণ মলিন পৃষ্ঠা হইতে তাঁহাদিগের নাম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। পুরুষ-পরম্পরাগত কিংবদন্তী এখনও ঐ সকল মহত্ত্ব-পূর্ণ নামের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কোন শ্বেতাঙ্গের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে এতদিনে হয়ত তাঁহাদিগের অনেকেই সুবর্ণমণ্ডিত দেহে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাগ্য এখনও ততদূর সুপ্রসন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে এদেশে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি রক্ষার্থ যত্নের পরিমাণ যেরূপ হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় বিদ্যমান এবং বর্ত্তমান কালে উহা যেরূপ মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের স্বদেশের মহৎ ব্যক্তিগণ যে স্বল্প দিনের মধ্যে পুরাতন গ্রন্থের ধূলিসমাচ্ছন্ন সমাধি ও প্রাচীন জনপ্রবাদের কুহেলিকাবরণ ভেদ করিয়া নবোজ্জ্বল পরিচ্ছদে সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সে আশা সুদূর-পরাহত।

কিন্তু যাঁহার চরিতকথা উপলক্ষ্য করিয়া এই সুদীর্ঘ ভূমিকা রচিত হইল, সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার ঐতিহাসিক অদৃষ্ট নিতান্ত অপ্রসন্ন নহে। তিনি উত্তর ভারতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও মহারাষ্ট্রবাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসপ্রিয় মারাঠাগণ আপনাদিগের বখর গ্রন্থে তাঁহার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। উত্তর ভারতের বিবিধ গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতির উল্লেখ আছে, কয়েক বৎসর হইল, তাহার কতকগুলি বোম্বাইয়ের জনৈক গ্রন্থ-প্রকাশকের যত্নে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র "কাব্যেতিহাস সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রেও এতৎসংক্রান্ত বহুল উপকরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ফলতঃ মহারাষ্ট্রভূমির অনুগ্রহে কবিবর ভূষণ ঐতিহাসিক দুর্দ্দশার হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছেন।

ভূষণ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে নবোৎসাহ ও অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষার যে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার একটী হিল্লোল এই ব্রাহ্মণ যুবকের তরুণ হৃদয়ে উন্মাদ সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার অলোকসাধারণী তেজস্বিতা সন্দর্শনে দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা-পাঠে কাপুরুষের হৃদয়ও বীরোন্মাদে উন্মত্ত হয়। তদানীন্তন হিন্দু নরপতিগণ তাঁহাকে গজবাজী সহ সুবর্ণরাশি দান করিয়া তাঁহার গুণে সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার শিবিকা স্কন্ধে বহন করিয়াও তাঁহাকে সম্মানিত ও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সেকালের গুণগ্রাহী নৃপতিসমাজে তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি ও সমাদর ছিল, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

ভূষণ যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতার নাম রত্নাকর ত্রিপাঠী ছিল। তিনি কালিন্দীর তীরবর্ত্তী ত্রিবিক্রমপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। (১) কানপুরের সন্নিহিত বর্ত্তমান "টিকমাপুর" নামক পল্লীই প্রাচীন ত্রিবিক্রমপুর বলিয়া প্রত্নসন্ধিগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। কথিত আছে, রত্নাকর ত্রিপাঠী বহুদিন অপুত্রক ছিলেন; পরে "বনভূমিকা" নাম্নী দেবীর উপাসনা করিয়া কাব্যকলাধর চারিটি পুত্র লাভ করেন। তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে ভূষণ দ্বিতীয়। রত্নাকর দরিদ্র হইলেও তাঁহার প্রতি বাগ্দেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ ছিল। ভূষণ ও তাঁহার সহোদরগণ পিতৃগুণে নৈসর্গিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা সকলেই হিন্দী সাহিত্যকে নানা অমূল্য রত্নাভরণে ভূষিত করিয়া তাঁহাদিগের পিতৃনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ভূষণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিন্তামণি কবিত্বগুণে তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ শাহ্জাহাঁর দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী ভাষায় "ছন্দোবিচার", "কাব্যবিবেক", "কবিকুল-কল্পতরু", "কাব্যপ্রকাশ", রামায়ণ ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলন ও বিবিধ কবিতার রচনা করিয়া হিন্দি-সাহিত্যের আচার্য্য-সমাজে আসন লাভ করিয়াছেন।

মতিরাম ভূষণের অনুজ। তিনি নানা স্থানের দেশীয় ভূপতিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া হিন্দী সাহিত্যের সেবা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "ললিত-ললাম" "ছন্দসার" ও "রসরাজ" এই তিনখানি অতি প্রসিদ্ধ। "অলঙ্কার পঞ্চাশিকা" নামক তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের বিষয়ও অধুনা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য-সংস্থাপক ছত্রপতি শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজীর রাজসভায় থাকিয়া তিনি বহুদিন তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, "শিবসিংহ-সরোজ" নামক হিন্দী গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

ভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম জটাশঙ্কর। স্থানে স্থানে তিনি নীলকণ্ঠ ত্রিপাঠী নামেও অভিহিত হইয়াছেন। কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ভিন্ন তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

কবিবর ভূষণও তাঁহার সহোদরদিগের ন্যায় কতিপয় উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কবিতার গতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিল। বোধ হয় এই কারণেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ভূষণের ভ্রাতৃবর্গ যখন পিতৃদত্ত শক্তির বিকাশ দেখাইয়া ধনবান্ ব্যক্তিদিগের চিত্তবিনোদন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভূষণের হৃদয়ে তখনও কবিতার অঙ্কুর উদ্গত হয় নাই। তিনি তখনও

(১) তিনমৈ আরো এক কবি, ভূষণ কহিয়তু জাহি॥
দ্বিজ কনৌজ কুল কশ্যপি, রত্নাকর-সুত ধীর।
বসতি ত্রিবিক্রমপুর সদা তরণী-তনূজা-তীর॥ শিবরাজ-ভূষণ।

সহোদরগণের সৌহার্দ্দ্য-গুণে উদ্বেগশূন্য চিত্তে সংসারের সুখতপ্ত ক্রোড়ে লালিত হইতেছিলেন। কিন্তু গৃহে মুখরা ভ্রাতৃজায়া থাকিলে অনেকের পক্ষেই বহুদিন নির্ব্বিবাদে ভ্রাতার অন্নধ্বংস করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভূষণেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। ভ্রাতৃ-জায়ার বিদ্রূপবক্র তিরস্কারে ভূষণ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন।

কবির পক্ষে রাজাশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের অন্য সুগম পন্থা সেকালে ছিল না। এই কারণে গৃহত্যাগের পর কুমায়ু নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের নরপতি উদ্যৎচন্দ্রের সভায় ভূষণের উদয় হইল। তাঁহার কথালাপ-চাতুর্য্যে ও কবিত্ব-সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কুমায়ু-নরেশ তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন। ভূষণ রাজার সন্নিধানে থাকিয়া নিত্য নূতন কবিতা-প্রসঙ্গে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল তথায় অবস্থানের পর কবি স্বদেশগমনের বাসনা প্রকাশ করিলে ভূপতি বহুমান পুরঃসর তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক-প্রদানে সন্তুষ্ট করিলেন। অতঃপর কবির সহিত বিদায়-সম্ভাষণ-প্রসঙ্গে তাঁহার কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসার পর রাজা বলিলেন,—"ভূষণ! পৃথিবীতে এরূপ প্রভূত পুরস্কার-দাতা তুমি আর কোথাও পাইবে না!" ব্রাহ্মণ সন্তান ভূষণ অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরচিত্তানুরঞ্জনব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও কুমায়ুপতির এই গর্ব্বোক্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এরূপ দাতা জগতে শত সহস্র বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু যিনি লক্ষ মুদ্রাকেও, অহঙ্কারপূর্ব্বক প্রদত্ত বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞানে স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করেন, এরূপ যাচক কখনও আপনার দৃষ্টিগোচর হইবে না!" এই কথা বলিয়া কবিবর ভূষণ ভূপতির প্রদত্ত ধনরাশির প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ-পূর্ব্বক রাজসভা ত্যাগ করিলেন। ভূষণের হৃদয় যে তেজোময় অনলরাশির আধারস্বরূপ ছিল, এই প্রকারে তাহার প্রথম স্ফুলিঙ্গ কুমায়ুবাসীর নয়নগোচর হইল!

যাঁহার হৃদয় এরূপ তেজস্বিতার আধার ছিল, তিনি যে স্বদেশের পরাধীনতা ও শাসককুলের অত্যাচার দর্শন করিয়া মূকভাবে অবস্থান করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে; তাই ভূষণের কবিতায় আমরা স্বাধীনতার তন্ত্রীরব শুনিতে পাই। কথিত আছে, বাল্যাবধি যবন-সেবার প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে বিরাগ যবন-বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিধর্ম্মী শাসকের হস্তে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র-সমূহের দুর্দ্দশা, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নির্য্যাতন প্রভৃতি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে মোসলমান শাসনের উচ্ছেদ-কামনা বলবতী হইয়াছিল। ওজস্বিনী ভাষায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ভূষণের অসাধারণ ছিল। উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসের সমাবেশে তাঁহার কবিতা শ্রোতৃবর্গকে উত্তেজিত করিত, দুর্ব্বল ব্যক্তির হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিত, হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রাণে স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিত! স্বদেশবাসীকে আত্মশক্তি-বিষয়ে আস্থাবান্ করিবার জন্য তিনি হিন্দুবীরত্বের গৌরবগাথা রচনা করিয়া দেশে দেশে ও গ্রামে গ্রামে গান করিয়া বেড়াইতেন। তিনি যেখানে কোনও হিন্দুনরপতিকে যবনশাসনের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে দেখিতেন, সেইখানেই উপস্থিত হইয়া স্বীয় উন্মাদনী কবিতা দ্বারা তত্রত্য হিন্দুদিগের হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে যত্নশীল হইতেন। হিন্দু সমাজকে জাতীয়ত্ব-রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁহার কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ভূষণ স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। যে সকল ভারতীয় রাজন্য দিল্লীশ্বরের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়া মোগলদিগের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতেন, ভূষণ কখনও জীবিকার জন্য তাঁহাদিগের ছায়া স্পর্শ করেন নাই। এই কারণে আমরা তাঁহাকে মহারাষ্ট্র-রাজ্য-সংস্থাপক মহাত্মা শিবাজী ও বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের স্বাধীনতা-সম্পাদনকারী রাজা "ছত্রশাল" ভিন্ন আর কাহারও সভায় আসন গ্রহণ করিতে দেখি না। মহারাষ্ট্রীয় চরিতাখ্যায়কগণ বলেন,—কুমায়ু-রাজের সভা পরিত্যাগের পর মোগল শাসনের উচ্ছেদ-প্রয়াসী হিন্দু ভূপতির অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূষণ দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন। সেই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ছত্রপতি শিবাজী মহারাষ্ট্র ভূমিকে যবনদিগের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু স্বাধীনতাপ্রয়াসী শিবাজীর অধ্যবসায়াদি সন্দর্শন করিয়া ভূষণের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইল। শিবাজী তাঁহার স্বদেশানুরাগপূর্ণ বীর-রস-প্লুত কবিতাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলে। শিবাজীর সহিত

ভূষণের মিলনে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল। স্বাধীন মহারাষ্ট্রপতির আশ্রয়লাভ করিয়া ভূষণের কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। নিত্য নূতন কবিতা-রচনা দ্বারা তিনি জাতীয় সাহিত্যকে বীরশ্রীতে বিভূষিত ও যবন-দলনে শিবাজির উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, শিবাজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারকালে ভূষণ গাহিয়াছিলেন—

ইন্দ্র জিমি জম্ভপর, বাড়ব সুঅম্ভপর,
রাবণ সুদম্ভ পর রঘুকুল রাজ হায়।
পৌন বারি-বাহ পর শম্ভু রতিনাহ পর,
জ্যোঁ সহস্রবাঁহ পর রাম দ্বিজরাজ হায়।
দাবা দ্রুমদুণ্ড পর চিত্তা মৃগঝুণ্ড পর,
ভূষণ, বিতুণ্ড পর জৈসে মৃগরাজ হায়।
তেজ তিমিরংশ পর কাহ্ন জিমি কংস পর,
ত্যোঁ ম্লেচ্ছবংশ পর শের শিবরাজ হায়॥

জম্ভাসুরের পক্ষে যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র, সমুদ্রের পক্ষে বাড়বাগ্নি, দাম্ভিক রাবণের পক্ষে রঘুকুলরাজ রামচন্দ্র, মেঘের পক্ষে পবন, রতিপতির পক্ষে মহাদেব, সেইরূপ সহস্র বাহু অর্জ্জুনের পক্ষে দ্বিজরাজ পরশুরাম (অন্তক সদৃশ ছিলেন)। আর দ্রুমরাজির পক্ষে যেরূপ দাবাগ্নি, মৃগযূথের পক্ষে যেরূপ চিত্রক (চিতা বাঘ), হস্তীর পক্ষে যেরূপ মৃগরাজ, তিমিরের পক্ষে যেরূপ কিরণ-জাল, কংসের পক্ষে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ভূষণের মতে, ম্লেচ্ছকুলের পক্ষে সিংহবিক্রম শিবরাজও সেইরূপ (যমতুল্য)।
এই কবিতার আবৃত্তি করিয়া ভূষন পঞ্চ হস্তী সহ পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি মহারাষ্ট্রপতির রাজকবির পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ভূষণের উন্মাদনা-পূর্ণ কবিতায় অনেক সময় শিবাজীর অবসন্ন প্রাণে তাড়িত শক্তির সঞ্চার হইত, তাঁহার উদ্দীপনা শিবাজীকে নৈরাশ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিত। শিবাজীর সৈন্যনির্য্যাণ-সময়ে ভূষণ যখন গাহিতেন,—

প্রেতনী পিশাচর নিশাচর নিশাচরীন,
মিলি মিলি আপসমে গাওত বধাই হায়;
ভৈঁরো ভূত প্রেত, ভূতী ভূম্বর ভয়ঙ্করসে,
যুথ যুথ যোগিনী জমাত জুরি আই হায়।
কিলক কিলক কৈ কুতূহল করত কালী,
ডিমক ডিমক ডৌরু দিগম্বর বজাই হায়;
শিবা পুছে শিবসো সমাজ আজ কহাঁ চলে?
কাহুপৈ শিবনরেন্দ্র ভ্রূকুটী চঢ়াই হায়॥

পিশাচী ও পিশাচ ও নিশাচর ও নিশাচরী দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পরকে অভিনন্দিত করিতেছে! বহু-সংখ্যক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভৈরব, ভূত, প্রেত, ভূত-পেত্নী ও যোগিনীকুল যূথবদ্ধ হইয়া দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে। অট্টহাস্যচ্ছটায় কালিকাদেবী কৌতুক প্রকাশ করিতেছেন। দিগম্বর ডিমিকি ডিমিকি শব্দে ডমরু বাজাইতেছেন, এই সকল দেখিয়া শিবানী শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "আজ এই সমাজ লইয়া কোথায় যাওয়া হইতেছে?" (উত্তরে মহাদেব বলিতেছেন)—"শিব-নরেন্দ্র আজ কোনও শত্রুর প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়াছেন।"

তখন হিন্দুসৈনিকদিগের ধমনীতে শোণিতবেগ কিরূপ বর্দ্ধিত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার যখন তিনি গাহিতেন,—

কুম্ভকরণ অসুর অবতারী অওরঙ্গজেব,
কীহ্নী মথুরা কতল দুহাই ফেরি রবকি।
খোদ ডারি দেবীদেব সহর মহল্লা বাঁকে,
লাখোঁ কিয়ে মুসল্লা মালা ছুট গই তবকী।
ভূষন ভণত, ভাগ্যো কাশীপতি বিশ্বনাথ,
অওর কৌন গিন্‌তি মৈ ভুলি গত ভবকী;
চারো বরণ ধর্ম্মছোড় কল্‌মা নিওয়াজ পঢ়ে,
শিবাজী ন হোতা তো সুন্নত হোতী সব্‌কি॥

অওরঙ্গজেব অসুরাবতার কুম্ভকর্ণের ন্যায় সর্ব্বসংহারক। সে মথুরাক্ষেত্রের দেব দেবী, উৎকৃষ্ট সহর মহলা প্রভৃতি খুঁড়িয়া ফেলিয়া ও বহুব্যক্তির নিধন সাধন করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব ঘোষণা করিয়াছে। তত্রত্য লক্ষ লক্ষ লোককে তিলকমালাদি ত্যাগ করাইয়া মোসলমান করিয়াছে। ভূষণ বলে, আর অপরের কথা কি বলিব, স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বনাথ তাহার ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। চারি বর্ণের লোকই এখন স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া কল্‌মা নমাজ পড়িতেছে। শিবাজী না থাকিলে এতদিন সকলেরই সুন্নত হইত, সন্দেহ নাই।

বেদ রাখে বিদিত, পুরাণ রাখে, সারযুত।
রামনাম রাখ্যো অতি রসনা সুঘরমে,
হিন্দুনকি চোটী রোটী রাখি হ্যায় সিপাহিন্‌কি,
কাঁধেমে জনেউ রাখ্যো মালা রাখি গরমে।

নীড় রাখে মুগল, মরোড় রাখে বাদশাহ,
বৈরী পীস রাখে বরদান রাখে করমে,
রাজনকি হদ্দ রাখি তেগ-বল শিবরাজ,
দেব রাখ্যো দেবল, স্বধর্ম্ম রাখ্যো ঘরমে।

হে সার-স্থত ( স্বপুত্র ) ! তুমি বেদকে বিদিত রাখিয়াছ, পুরাণসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছ, তুমি সকলের সুন্দর রসনায় রামনাম রাখিয়াছ। তুমি হিন্দুদিগের শিখা, শিপাহীদিগের অন্ন, ( ব্রাহ্মণের ) স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ও ( ভক্তের ) গলাস্থ মালা রক্ষা করিয়াছ। তোমার প্রতাপে মোগলগণের হৃদয়ে দুঃখ-শল্য রোপিত হইয়াছে, বাদশাহ হৃদয়ে দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেছেন। তুমি বৈরীদিগকে নিষ্পেষিত অবস্থায় রাখিয়াছ, এবং হস্তে অভয় দান করিতেছ। হে শিবরাজ ! অসিবলে তুমি সকল রাজার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি মন্দিরে দেবতা ও সকলের গৃহে গৃহে স্বধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ !

গরুড়কো দাবা জৈসে নাগকে সমূহ পর,
দাবা নাগযূথ পর সিংহ সিরতাজকো ;
দাবা পুরুহূতকো পহারনকে কুলপর,
পক্ষিণকে গণপর দাবা জৈসে বাজকো
ভূষণ অখণ্ড নবখণ্ড মহীমণ্ডলমে,
তম পর দাবা রবিকিরণ সমাজকো ;
পূরব পছাহ দেশ উত্তরতে দখিন লৌ,
জহাঁ বাদশাহী তহাঁ দাবা শিবরাজকো ॥

সর্পকুলের উপর গরুড়ের, হস্তিযুথের উপর পশুরাজের, পর্ব্বতনিচয়ের উপর পুরুহূত ইন্দ্রের, পক্ষিকুলের উপর শ্যেনের, এই নবখণ্ডময় সমগ্র মহীমণ্ডলের তমোরাশির উপর রবি-কিরণমালার যেরূপ অধিকার বা দাবী, সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ( ভারতের ) যেখানেই যবনশাসন ( বাদশাহী ) আছে, সেইখানেই শিব-রাজের আক্রমণাধিকার বিদ্যমান, অর্থাৎ মোসলমান-শাশিত প্রদেশ মাত্রের উদ্ধারে শিবাজী যত্নশীল।

মার কর বাদশাহী খাকশাহী কিহ্নী জিন,
জের কিহ্নী জোরসো লেই হদ্দ সব মারেকি ;
খিসগই সেখী ফিসগই শূরতাই সব,
হিসগই হিম্মত হজারো লোগ প্যারেকি।
বাজত দমামে লাখোঁ ধোঁসা আগে ধুর জাত,
গরজত মেঘ জ্যোঁ বরাত চঢ়ে ভারেকি ;
দুল্হো শিবরাজ ভয়ো দচ্ছনী দমামেওয়ালে,
দিল্লী দুলহিন ভয়ী শহর সিতারেকি ॥

যিনি সমরানলে বাদশাহীকে খাকশাহীতে (ভস্মরাশিতে) পরিণত করিয়াছেন, বলপূর্ব্বক তাহার সমস্ত সীমা অধিকার করিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছেন, যাঁহার প্রতাপে সহস্র সহস্র বাদশাহী সৈন্যের দর্প চুর্ণ, বীরত্ব নিঃশেষিত ও সাহস বিলুপ্ত হইয়াছে, যাঁহার লক্ষ লক্ষ দামামা ও ঢক্কানিনাদ দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শ্রুত হইয়া বরযাত্রীর সমারোহের অনুকরণ করিতেছে, সেই শিবরাজ এখন বর বা বিবাহের পাত্র হইয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণী সৈন্য দামামা-বাদক হইয়াছে, এবং দিল্লী নগরী সেতারা সহরের ( অধিপতি শিবজীর ) বধূ হইয়াছে !

তখন শিবজীর ন্যায় প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে নবোৎসাহের সঞ্চার হইত, স্বধর্ম্ম-রক্ষা ও হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন বিষয়ে যত্নশীল হইবার বাসনা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইত। এরূপ উৎসাহবর্দ্ধনী কবিতাবলী হিন্দী সাহিত্যে দুর্ল্লভ। হিন্দী সাহিত্য-কোবিদ্গণের মতে, ভূষণ আদিরস-বহুল হিন্দীসাহিত্যে অদ্ভুত স্বদেশানুরাগপূর্ণ বীররসের অবতারণা করিয়াছিলেন ; অন্য কোনও হিন্দীকবি তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। অর্থগৌরব, পদলালিত্য ও উপমা-লঙ্কারাদির বিন্যাসগুণেও তিনি স্বদেশীয় কবীন্দ্রসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থানলাভ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিবাজীর ন্যায় শৌর্য্যশালী স্বাধীন ভূপতির আশ্রয় ও উৎসাহ পাইয়াই ভূষণের কবিত্ব-শক্তি এরূপ প্রগল্‌ভতা লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং ভূষণও একথা নিম্ন-লিখিত কবিতায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

"শিব-চরিত্র লিখি যোঁ ভয়োঁ কবি ভূষণকো চিত্ত।
ভাঁতি ভাঁতি ভূষণনিসোঁ ভূষিত করৌঁ কবিত্ত॥"

অর্থাৎ শিবাজীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া কবিবর ভূষণের চিত্তে কবিতাসুন্দরীকে নানালঙ্কারে বিভূষিত করিবার বাসনা উদ্দীপিত হইল। সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা "শিবরাজ-ভূষণ কাব্য" নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত "ভূষণ-হাজরা" "ভূষণ-উল্লাস" "দূষণ-উল্লাস" "শিবা-বাওনী" "ছত্রশালদশক" প্রভৃতি ক্ষুদ্র

বৃহৎ কয়েকখানি গ্রন্থও এই কবির লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে "শিবরাজ-ভূষণ কাব্য" খানি ১৭৩০ বিক্রমাব্দে বা ১৬৭৩ অব্দে রচিত হয় বলিয়া ঐ গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে।

চারি পাঁচ বৎসরকাল মহারাষ্ট্রদেশে অবস্থানের পর আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভূষণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। বিদায়কালে মহারাজ শিবাজী তাঁহাকে গজবাজী রত্নাদিসহ লক্ষাধিক মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াও কবি সময়ে সময়ে মহারাজের নিকট অনেক বহুমানসূচক উপঢৌকনাদি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভূষণ বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীন নরপতি ছত্রশালের সভায় গমন করেন। ছত্রপতি শিবাজীর উদ্দীপনায় রাজা ছত্রশাল বুন্দেলখণ্ডকে মোগল সম্রাটের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে স্বাধীনতার উপাসক ভূষণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় বীররসবর্দ্ধিনী কবিতাদ্বারা তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য বুন্দেলখণ্ডে পদার্পণ করেন। রাজা ছত্রশাল প্রথিত-যশা কবির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন কবি তাঁহার অতুল শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া গাহিলেন,—

নিকসত ম্যানতেঁ ময়ুখৈঁ প্রলৈ ভান কৈসী,
ফারৈ তম তোমর গয়ন্দনকে জালকো;
লাগত লপট কণ্ঠ বিরিনকে নাগিনুসী,
রুদ্র হি রিঝাবৈ দৈ দৈ মুণ্ডনকী মালকো।
লাল ছিতিপাল ছত্রশাল মহাবাহুবলী,
কহাঁলো বখান করেঁা তেরী করবালকো;
প্রতিভট-কটত কটালে কেতে কাটি কাটি,
কালিকাসী কিলকী কলেউ দেত কালকো।"

প্রলয়কালীন ভানুর প্রচণ্ড ময়ুখমালার ন্যায় যাঁহার অসি নিষ্কোষিত হইবা মাত্র তমোরাশিকে বিনষ্ট করে, যাঁহার অসি বৈরিকণ্ঠে "নাগিনীর" ন্যায় সংলগ্ন হয়, ও মুণ্ডমালা দানপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে নিত্য সন্তুষ্ট করে, সেই মহাবাহুবলসম্পন্ন প্রিয় ক্ষিতিপাল ছত্রশাল! তোমার করবালের প্রশংসা আমি আর কত করিব! তোমার অসিধারা শত্রুপক্ষীয় কটকের শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক কালিকাদেবীর ন্যায় কালকে প্রাতরাশ প্রদান করে।

কীবেকে সমান প্রভু ঢুণ্ঢ দেখ্যো আন পৈ,
নিদান দান যুদ্ধমে ন কোউ ঠহরাত হায়;
পঞ্চম প্রচণ্ড ভুজদণ্ডকো বখান শুনি,
ভাজিবেকোঁ পক্ষীলোঁ পঠান থহরাত হায়।
শঙ্কামান সুথত আমীর দিল্লীবারে জব,
চম্পতকে নন্দকে নগারে ঘহরাত হায়;
চহু ওর তকিত চকত্তাকে দলন পর,
ছত্তাকে প্রতাপকে পতাকে ফহরাত হায়॥

তাবার্থ এই যে—আপনার সহিত যুদ্ধে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। পঞ্চমবংশীয়ের (ছত্রশালের) ভুজদণ্ডের প্রতাপ শ্রবণ করিয়া পাঠানেরা শ্যেনবিতাড়িত পক্ষীর ন্যায় থরথর কম্পমান হয়। চম্পৎরায়ের পুত্রের রণভেরী যখন গম্ভীর ধ্বনি করে, তখন দিল্লী অঞ্চলের লোকের শঙ্কাকুল হৃদয় শুষ্ক হইতে থাকে। ফলতঃ চারিদিকে চাকতাইদিগের (মোগলদিগের) দলের উপর ছত্রশালের প্রতাপসূচক জয়পতাকা পত পত শব্দে উড়িতেছে।

কথিত আছে, রাজা ছত্রশাল এ সকল অমূল্য কবিতার উপযুক্ত মূল্য প্রদানে অসমর্থ হইয়া ভূষণের শিবিকা বহনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সহৃদয় কবি নরবরকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার বহুল প্রশংসাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি দ্বারা প্রতিসম্মানিত করিলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

# ছোট বৌ।

(গল্প)

(১)

"মরণও ত নেই—ম'লে হাড় জুড়ু'ত।" এই বলিয়া জনৈক বর্ষিয়সী রান্নাঘরে ত্রস্তে প্রবেশ করিলেন।

"কেন—কি হ'য়েছে মা? অমন ক'রে কা'কে গাল দিচ্ছ?" কোন নবীনা বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই কথা বলিয়া রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল।

"কি আর হ'বে—আমার শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডি। এক কড়া দুধ সব উৎলে প'ড়ে গেছে, আহা বাছারা আমার সারাদিন না খেয়ে মারা যাবে। সর্ব্বনাশী ম'লে ত বাঁচ-তুম্, ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তুম্।"

মেয়ে দেখিল কটাহের দুগ্ধ উথলিয়া রান্নাঘরের মেজে তরঙ্গায়িত ; বৃদ্ধা কটাহের অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু সন্তাড়নে তৎ-পর হইয়া তাঁহার পুত্রবধূর উদ্দেশে উক্ত প্রকার শুভ চিন্তায় উত্তেজিত হইয়াছেন।

কন্যা বলিল—"ছি মা! অমন ক'রে গাল দিলে ছোট বৌদিদি মনে বড়ই কষ্ট পাবে।"

"গাল্ দেব না পূজো ক'রবো।" বৃদ্ধা আরও উত্তে-জিত হইয়া বলিলেন, "তুই বাছা আর জালাস্‌নি। ওতেই ত যত আস্পদ্ধা পায়। সব দুধ খানি ফেলে দিলে আর আমার বাছারা আজ যে না খেয়ে মারা যাবে ?"

"তুমি মা বড় অন্যায় ক'রে বল কিন্তু। কড়া থেকে দুধ উৎলে পড়েছে, সে ফেল্‌লে কেমন ক'রে ?"

বৃদ্ধা আরও রাগান্বিতা হইয়া বলিলেন,—"আমি ত সবই অন্যায় ক'রে বলি—আমার কাজই ঐ। তোরা সব যা বলিস্ করিস্ সবই ন্যায়। এখন সবাই তোর ছোট বৌদিদির পা ধুয়ে খাবে এখন।" এই বলিয়া ক্রোধান্বিতা জননী সবলে দুধের কাটি দুরে ফেলিয়া গণ গণ করিতে করিতে উঠিয়া গৃহান্তরে গেলেন।

"ও ঘরে গোল কিসের গা ?" এই বলিয়া জনৈক যুবতী বাহির হইলেন। তাঁহার তাম্বুল রাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিস্ফারিত, তন্মধ্য হইতে শুভ্র দন্তপংক্তি অল্প পরিদৃশ্যমান হইতেছিল। যুবতী বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, দেহ যষ্টিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকাইয়া নাতিদীর্ঘ একটী হাই তুলিলেন, পরে চূর্ণকুন্তলগুলিকে সযত্নে গুচ্ছ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্তা যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনু, কিসের গোল না ? মায়ের গলার আওয়াজ শুনলুম না ?"

"আর বাছা শুনবে কি রান্না ঘরে এসে দেখে যাও আর তোমরা বল, আমি মিছে ক'রে লোকের নামে লাগা নাগি করি কি মিছে ক'রে বকি।"

যুবতী ততটা কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মতা হইলেন না। গ্রীবা হেলাইয়া অর্দ্ধ মুদিত চক্ষু দুটিকে ঈষৎ বাঁকাইয়া বিরক্তির ভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন,—"কি হ'য়েছে ব'ললেই ত হয়। আমি বাপু অত শত বায়নাক্কা বুঝি নি।"

বৃদ্ধা ত্রস্তে বলিলেন,—"তা মা আমি ত তখনই বলেছিলুম অমন বাপ-মা-খেকী মেয়ে ঘরে এন না—সংসার উচ্ছিন্নি যাবে। তখন তোমরা আমার কথা শুন্‌লে না।"

যুবতী এইবার রাগত হইলেন। সুবঙ্কিম ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া লাল ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া বলিলেন,—"তুমি ত যখন তখন ঐ খোঁটা দাও। আমি ত কোমর বেঁধে আর তোমার ছেলের বে দিতে যাই নি। যারা মোড়লী ক'রে বে দে'ছেল তাদের বল গে।" এই বলিয়া যুবতী 'তাদের' উদ্দেশে নানাপ্রকার মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা প্রমাদ গণিলেন। ইতিমধ্যে একটী অষ্টম বৎ-সরের বালিকা তথায় উপস্থিত হইয়া যুবতীর অঞ্চল ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—"ওমা দেখ্‌বি আয় রান্না ঘরের মেজেয় দুধের ঢেউ খেল্‌ছে। ছোট কাকীমা সব দুধটুকুন ফেলে দিয়েছে। কড়ায় আর একটুও দুধ নেইকো।"

বৃদ্ধা তখন বিনাইয়া বিনাইয়া আদ্যোপান্ত দুগ্ধবিষয়ক ইতিহাস ব্যাখ্যা করিলেন। বলা বাহুল্য আবেগের বেটীর যে সবই দোষ, তাহা বিশেষ করিয়া বড় বৌমাকে বুঝাইবার জন্য তাহাতে রংফলাইতেও ভুলিলেন না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ—আর রক্ষা আছে ? তার পর যাহা হইল তাহা আর লিখিলাম না—পাঠকগণ বুঝুন। অবশেষে যুবতী মেয়েটাকে "ছাই খাও" বলিয়া সজোরে একটী চপেটাঘাত করিয়া নিজ ঘরের অর্গল বন্ধ করিলেন। মেয়ে এই আকস্মিক চপেটাঘাতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনু ওরফে বিনোদিনী তাহাকে কোলে লইয়া "মা লক্ষ্মী কেঁদনা," "খাবার দেব' প্রভৃতি প্রলোভনে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিলেন,—"মা! এই ভরা দুপুর বেলা, তুমিই এই গোলটা বাধালে। ছোট বোয়েরও বাপু কোন দোষ নাই—সে ব'সে দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। বড় বৌদিদি বল্‌লেন, ও রেখে এসে খোকাকে ধর। আমাকে ডেকে রান্না ঘরে যেতে বল্‌লে—এতে আর বাপু কতই দোষ হ'য়েছিল! এইজন্যই বড় বৌদিদি কত বক্‌তে লাগ্‌লেন।"

"মিছে ক'রে কি আর বকেছে। এক কথা দশ্বি-বার না বল্‌লে যে কাণে সেঁদোয় না। এত বল, নচ্ছার বেটার কিছুতেই ত লজ্জা হয় না; আমাকে বাড়ীর বাঁদী মনে করে,—কথা বল্‌লে গ্রাহ্যি করে না। আমি নয় ব্যাটার বৌ ব'লে সইলুম, কিন্তু বড় বৌ পরের মেয়ে সে সইতে যাবে কেন?"

বিনোদিনী মনে মনে বলিল 'তুমি যা সও তা' ঈশ্বরই জানেন। প্রকাশ্যে বলিল,—"মা তুমি সইবে না ত কে সইবে। দেখ ওর মা-বাপ নাই—একটু যত্ন আইত্তি ক'র-বার কেউ নাই। তুমি যদি যত্ন না কর—অমন ক'রে রাত দিন গাল দেও, আর খিট খিট কর তাহ'লে ও মনে বড়ই কষ্ট পা'বে। আহা ওর মুখখানি সদাই মলিন; ছেলে মানুষ, দুবেলা রেঁধে, আর এই সংসারের সব কাজ ক'রে এক তিলও জিরুতে পায় না। মা তোর দু'খানি পায়ে ধরি ছোটবৌকে আর অমন ক'রে বকিস্‌নি।"

মেয়ে মাকে বিস্তর অনুনয় করিল। বৃদ্ধা তখন শুইয়া নাতনীকে পাকা চুল তুলিতে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার অনুরোধে 'রাজপুত্র' 'রাজকন্যা' 'বিহঙ্গমী' প্রভৃতির রূপ কথা আরম্ভ করিলেন। বিনোদিনী ছোট বৌয়ের নিকট গেল।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী কলিকাতার নিকট কোন পল্লীগ্রামে। তিনি কলিকাতার কোন আপিসে এক শত টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বি, এ, পড়েন। উভয়ে প্রত্যহ কলি-কাতায় যাতায়ত করেন। দেবেন্দ্র পূর্ব্বে নিস্ব ছিলেন, নিজ চেষ্টায় এখন একঘর গৃহস্থ হইয়াছেন। মাতা, ভ্রাতা ও একটী ভগিনী ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। দেবেন্দ্রের স্ত্রীর, তাঁহাদের গ্রামের মধ্যে, সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। দেবেন্দ্রের যখন ৩০৲ টাকা বেতন, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। দেবেন্দ্রের শ্বশুর নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন—বিবাহ একরূপ শাঁখা শাড়ী দ্বারাই হইয়াছিল। কন্যার পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দেবেন্দ্র এই বিবাহে সম্মত হন। আসল কথাটা কিন্তু বালিকার রূপ। দেবেন্দ্র মনে মনে বড়ই সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, মুখে কিন্তু বিপরীত।

বড় বৌয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই একটু দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার রূপ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার গর্ব্বে দেশে লোক থাকিত না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীর 'ধাত' মারিয়া দিলেন। তৎপরে ক্রমেই দেবেন্দ্রের বেতন বৃদ্ধি—'স্ত্রীভাগ্যে ধন' এই কথাটা তাঁহার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। বড় বৌ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—মা কলের পুতুল—সর্ব্বদা ভীত। স্নুষায় অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন। বড় বৌয়ের একটী মেয়ে এবং দুটী ছেলে হইয়াছে। তিনি কোন কর্ম্মই করিতে পারেন না, সর্ব্বদা শরীরটা কেমন কেমন করে—তাহাতে আবার মাঝে মাঝে 'হিষ্টিরিয়া' হয়, সেইজন্য ডাক্তারে তাঁহাকে রান্না ঘরে যাইতে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। সংসারের খরচ পত্র বড় বৌই সব করেন, বাবু কিছুই দেখিতে পারেন না। তিনি সকালে আহার করিয়া আপিসে যান আর রাত্রে ফিরিয়া দুটি মুখে দিয়াই শয্যা অধিকার করেন। বড় বৌ সকালে সকালে আহারাদি সারিয়া বেলা ১টা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকেন, পরে একে একে পাড়ার দু একজন প্রতিবেশিনী একত্র হইলে, তাহাদের সহিত তাস খেলেন, গল্প করেন, পরের কুৎসা করেন, অথবা 'বই শুনেন'। তিনি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। তৎপরে গা ধুইয়া চুল বাঁধিতে প্রায় সন্ধ্যা হইত। দেবেন্দ্র বাবু আপিস হইতে আসিলে তাঁহার সহিত একথা সে কথা কহিয়াই বাকী সময়টা অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং তাঁহার অবসর মোটেই ছিল না—ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত কোলে নিবার সময় পাইতেন না। শাশুড়ীই সে কার্য্য করিতেন। ছোট বৌ একাকী সব কাজই করিত। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে বড় বৌকে তাঁহার ঘরে খাবার দিয়া আসিতে হইত, কারণ ঐরূপই ডাক্তারের আদেশ। সব কাজ সারিয়া ছোট বৌ প্রায় ২টার সময় আহার করিত। ইহার পর একটু বিশ্রাম করিবারও অবসর ছিল না, ছেলেকে দুধ খাওয়ান এবং তাহাকে শান্ত করিয়া রাখা আবশ্যক হইত, কারণ শাশুড়ী একা ত আর তিনটী রাখিতে পারেন না। এত করিয়াও তাহার নিস্তার ছিল না, প্রায় প্রতি কাজেই তাহাকে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত। সামান্য ত্রুটিতে আর রক্ষা থাকিত না—যা মুখে আসিত, বড় বৌ তাই বলিয়া কটূক্তি করিতেন। শাশুড়ীও সেই সঙ্গে

যোগ দিতেন, কারণ তাঁহার পক্ষ হইয়া দু'চার কথা না বলিলে তিনি শাশুড়ীর উপর বিরক্ত হইতেন। এই জন্য বৃদ্ধা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ছোট বৌকে তিরস্কার করিতেন। দেবেন্দ্র ইহা না জানিতেন এমন নয়—তিনি প্রথম প্রথম স্ত্রীকে দু'এক কথা বলিতেন কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইত দেখিয়া তিনি ইদানীং আর কোন কথাই বলিতেন না। সত্য বলিতে গেলে, তিনি এখন স্ত্রীকে একটু একটু ভয়ও করিতেন।

( ২ )

বিনোদিনী ছোট বৌয়ের ঘরে গিয়া দেখিল ছোট বৌ নিদ্রিতা, কিন্তু বিনোদিনী নিঃশব্দে শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, সে বাস্তবিক ঘুমায় নাই—কাঁদিতেছে। বিনোদিনী তখন ব্যথিত হৃদয়ে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে ছোট বৌয়ের হাত ধরিয়া কোমল স্বরে বলিল,—"ছিঃ বোন, এমন ক'রে শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছ বুঝি। এখন উঠে খাবে দাবে চল।" এই বলিয়া সে জোর করিয়া ছোট বৌয়ের হাত ধরিয়া শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইল। অনন্তর বিনোদিনী তাহার প্রতি সমবেদনা জানাইয়া নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সে যতই তাহাকে প্রবোধ দেয়, ততই চোখের জলে তাহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যায়। বিনোদিনীর চোখের কোণেও মুক্তার মত অশ্রু-বিন্দু দেখা না দিয়াছিল এমন নয়। সংসারের নিয়মই এই—ব্যথিতের অশ্রু তোমার অশ্রুকে টানিয়া বাহির করিবে।

বিনোদিনী জানিত ছোট বৌ এখনও অভুক্ত। সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ছোট বৌ আহার করিবে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-পরম্পরা হইয়া গিয়াছে।

বি। এস ভাই খাবে এস। ভাতের উপর রাগ কেন?

ছো। আমি ভাই রাগ করিনি।

বি। তবে না খেয়ে পিত্তি প'ড়লে যে অসুখ ক'রবে।

ছো। অসুখ হ'লে লোকের কষ্ট হয়—আমার ভাই তার উল্‌টো। আমি অসুখ হবার জন্যে কত চেষ্টা করি, কিন্তু পোড়া অসুখ আমার হয় না ত।"

এই বলিয়া ছোট বৌ একটু হাসিল। বিনোদিনীও হাসিয়া ভাবিল বড়ই মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার এই কথা কয়টী বাহির হইয়াছে।

বি। এমন ক'রে ক'দিন শরীর বইবে?

ছো। যে কয়দিন বয়। তুমি ত ভাই জাননা এমন আমার মাঝে মাঝে হয়—আমার অভ্যাস আছে।

বি। সাবাস বলি তোকে, তুই তাই এতটা সয়ে থাকিস। আমি হ'লে যে কি কত্তুম বল্‌তে পারি না; বোধ হয়—

ছোট বৌ যেন বিনোদিনীর মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"বোধ হয় বিষ খেয়ে সকল জ্বালার শেষ কত্তুম।"

কথাটা শুনিয়া বিনোদিনী শিহরিয়া উঠিল। ছোট বৌ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি অনেক আগে থেকে সেই মতলবেই ছিলুম, কিন্তু বোন, একটা কারণে এতদিন তা পারি নি।"

বিনোদিনী বুঝিল সেই 'একটা কারণ' কি। ছোট বৌয়ের দু'খানি হাত স্নেহভরে ধরিয়া কাতরতার সহিত বলিল—"ভাই, আমি জানি তুই নিতান্ত অবুঝ না। আমার মাথা খাস বল অমন অশুভ চিন্তাকে আর মনে ঠাঁই দিবি নি—আমার মাথায় হাত দিয়ে বল, নইলে আমি তোকে কিছুতেই ছাড়ব না।"

"এর আগে আর একজনের কাছে কড়ার করেছি, জানি নি ঈশ্বর তা রাখ্‌তে দেবেন কি না। তাঁর মুখ দেখে আর কথা শুনে আমার প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায়—সব কষ্ট ভুলে যাই; তবে আর নতুন ক'রে দিব্যি করে কি হবে?" দুই বিন্দু অশ্রু বালিকার কপোল বাহিয়া পড়িল।

বিনোদিনী তাহার চক্ষু মুছাইয়া বলিল,—"ভাই তোর যে কি কষ্ট তা আমি সবই বুঝি। এই ক'দিন এসে অবধি বড়বৌ ও মায়ের অন্যায় দেখে মনে বড়ই কষ্ট হ'য়েছে। বড় বৌকে বল্লে তিনি রেগে বলেন, 'নে ছুঁড়ি তোর আর জ্যাঠামি ক'র্‌তে হবে না'। আর মাকে কত বুঝাই, কত হাতে পায়ে ধরি—নির্ব্বংশের বেটী তবুও ত বুঝবে না। বড় বৌয়ের ভয়েই মরেন। অত যদি ভয়, তবে এ সংসারে না থাক্‌লেই পারেন। দাদাকে ব'লে কাশী গেলেও ত পরকালের কাজ হয়। আচ্ছা

ভাই, দাদা এ সব কেমন ক'রে দেখেন। তিনি কি বড়বৌকে একটু ধমকে বারন করতে পারেন না ?"

ছোটবৌ এবার একটু মধুর হাসিয়া বলিল—"তিনি কি আর বল্‌তে কসুর ক'রেছেন। তিনি ব'লেই ত আরও বাড়াবাড়ি হ'য়েছে। উপর হ'তে কত্তা গিন্নিতে ঝগড়া হ'য়ে তিনি মাঝে মাঝে না খেয়ে আপিস গিয়েছিলেন।" এই বলিয়া ছোটবৌ আবার হাসিল।

বিনোদিনী এবার একটু চটিয়া কহিল—"নে ভাই তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না। যে পুরুষ নিজের মাগকে শাসন ক'রতে না পারে, তার সংসারে থাকা কেন ?"

"তাহ'লে আমিও ঠাকুর জামাইকে ব'লে দেব যে, যখন ঠাকুরঝি দুষ্টুমি ক'রবে, তখন তিনি যেন তোমাকে খুব মতে শাসন করেন।"

বিনোদিনী সাদরে ছোটবৌয়ের গালে একটা ঠোনা মারিয়া সহাস্যে বলিল—"সেটা আর তোকে শিখিয়ে দিতে হবে না। আচ্ছা ছোট দাদা কি কোন কথাই বলেন না ?"

"বলে 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর'। তাহ'লে কি আর রক্ষে আছে। একদিন বুঝি কি ব'লেছিল, তাই বড়গিন্নি চারদিন ঘরের বার হন নি—কেবল কেঁদে কেঁদে কর্ত্তাকে ব'লেছিলেন—'শেষে তোমার ছোট ভায়ের কাছে অপমানিত হলুম। আজই আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে, নইলে আমি আফিং খেয়ে ম'রব'। শেষে ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লেন 'আজই তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাব—সেখানে গিয়ে দিন কতক সুখভোগ কর'। সেইদিন থেকে সব সেরে গেল।"

বিনোদিনী মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—"সুখ ত কত—সেখেনে তিন দিন অন্তর একদিন চুলো জ্বলে। আরও যদি বাপের অবস্থা ভাল হ'ত, তবে বুঝি বা ঠ্যাকারে মাটাতে পা দিত না। দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু দেন ব'লেই তারা খেয়ে বাঁচে। আমার কাছে বাপের বাড়ীর বড়াই ক'রলে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতুম।"

"থাক অত বীরত্বে কাজ কি! তোর দাদা বড় দু'কথা শুনুতে পার্‌লেন তা তুই!" আবার সেই হাসি।

বিনোদিনী উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দাদা যে মেগের গোলাম, তাই সাহসে কুলোয় না। ধিক্ অমন পুরুষ—মেয়েমানুষ হ'তে পারে নি। আমি আজই ছোটদাদাকে সব ব'লব—আরও তাঁর হাতে পায় ধরে ব'লব, তুমি আর এ সংসারে থেক না—আজই চাকুরীর চেষ্টা দেখ। চাকুরী হ'লে ছোটবৌকে নিয়ে আলাদা হও।"

"ভাই তোর পায়ে ধরে ব'ল্‌ছি, তুই তাঁকে কিছু বলিস্‌নি—আমার মাথা খাস্ বলিস্‌নি। শুন্‌লে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। এখন পরীক্ষার সময় তাঁর মন খারাপ হ'লে পড়া শুনোর ক্ষতি হবে। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সব কষ্ট সয়ে আছি।"

বিনোদিনী সাদরে ছোটবৌয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অধরে একটা চুম্বন করিয়া বলিল,—"ভাই যদি কখন পুরুষ হ'য়ে জন্ম হয়, তবে যেন তোর মত স্ত্রী পাই!"

ছোটবৌ মুখ সরাইয়া লইয়া সহাস্যে বলিল—"দূর মড়া—তুই যে না ফলতেই এক কাঁদি চা'স্। র'স্ তোর দাদা এলে ব'ল্‌ছি, ঠাকুরঝি পুরুষ হ'য়ে আমায় বে ক'রতে চায়। তা'হলে আর কি ক'রবে, শাড়ী পরে ঘোমটা দিয়ে তুমিও ঠাকুর জামায়ের কাছে যাও!"

এবার দু'জনে গলা ধরিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময় বিনোদিনী মায়ের কর্কশ স্বর শুনিতে পাইল—"বিনু—অ-বিনু—বলি ছোটগিন্নিকে বল—ছেলে মেয়ের খাবার তোয়ের ক'রে দিন্। বেলা কি আর আছে। ঘাট ক'রেছিলেন, তাই দু'কথা হয়েছিল, তাই বলে কি সংসার ধর্ম্ম ছাড়তে হবে। ছেলে মেয়ে না খেয়ে যে খুন হ'লো—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ত আর তাদের পেট ভোরবে না।" ইত্যাদি।

শুনিয়া উভয়েই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছোট বৌ যে অভুক্তা ছিল, বিনোদিনী তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল।

[৩]

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। বসন্তের বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে এবং জানালার মধ্য দিয়া চাঁদের কিরণ ঘরের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। জোৎস্নার আলো এক একবার মেঘে ঢাকা পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন কোন সুন্দরী এক একবার ঘোমটা সরাইয়া নায়কের পানে তাকাইতেছে।

রাত্রি বারটা বাজিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া আহার করিতেছেন—স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। বালিকার মুখখানি আজ যেন একটু বিষাদ মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে। বাটীস্থ অপরাপর সকলেই নিদ্রিত—এমন কি সমস্ত গ্রামও সুপ্ত—নিস্তব্ধ; কেবল মাঝে মাঝে দূরে দু'একটী গ্রাম্য কুকুরের অস্পষ্ট রব শুনা যাইতেছিল।

নরেন্দ্র একমনেই আহার করিতেছিলেন—হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন বড় বড় মুক্তার মত দু' ফোঁটা জল তাঁহার স্ত্রীর চক্ষুকোণ হইতে গড়াইল। প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়া বালিকার অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইল। নরেন্দ্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—

"সেকি, তুমি কাঁদছ যে। কি হ'য়েছে সরোজ? আজ বুঝি নূতন একটা কিছু হ'য়েছিল।"

সরোজ কথা কহিল না, যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া ত্বরিত অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া স্বামীর দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু হাসিল।

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"এ যে দেখছি মন্দ নয়। শরৎকালের আকাশ, মেঘ দেখতে না দেখতেই জল—আবার তৎক্ষণাৎ মেঘ সরিয়া গেলে চাঁদের কিরণ ফুটিয়া বাহির হয়।"

বালিকার দৃষ্টি আরও কোমল হইল, হাসিটুকু অধিকতর মধুর বলিয়া বোধ হইল। নরেন্দ্র সমস্ত দিনের পরিশ্রম ভুলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র স্নেহভরে বলিলেন—"সরোজ তুমি আমার সহিত সমস্ত রাত মিছে ভোগ কেন? আমি রোজই তোমাকে বলি, সকালে সকালে খেয়ে দেয়ে ঘুমুবে। আমি পড়া শেষ ক'রে যখন ইচ্ছে খেয়ে শোব।"

সরোজ বলিল—"তা আমি পারবো না—তুমি না খেয়ে থাকবে, আর আমি খেয়ে দেয়ে সুখে ঘুমুবো! মা ব'লতেন স্বামীর পাতে খেলে বিধবা হয় না।"

"তোমার ঐ কেমন একটা গোঁ। কেন সবাই ত খেয়ে থাকে। বড় বৌদিদি প্রায়ই দাদার আগে খান!"

"তার যে অসুখ—তাই ডাক্তার বাবু সকাল সকাল খেতে বলেছেন। খেতে দেরি হ'লে তাঁর অসুখ আরও বাড়ে।" এই বলিয়া সরোজ আবার একটু হাসিল।

নরেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন—"অসুখ ত কিছুই দেখি না—বেশ শরীর, আহারে বিলক্ষণ রুচি, কোঁদলে ঝড়ের আগে যান; তবে অসুখটা বুঝি কেবল কাজ ক'রবার বেলায়। প'ড়ত আমার মত লোকের পাল্লায় ত দু'দিনে ঢিট্ হ'ত—অসুখ ফসুখ এদ্দিনে কোথায় পালাত!"

সরোজ দাঁতে অধর টিপিয়া বলিল—"ইস্! তোমরা দু'ভাই বোনেই যে দিদির উপর হাড়ে চটা।"

"হাড়ে চটা! আর তুমি ফুল চন্দন দিয়ে পূজা ক'রে থাক নয়? যা কর সেটা কেবল ভয়ে।"

নরেন্দ্র আহার করিয়া বাহিরে গেলেন। ছোট বৌ ইত্যবসরে তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া স্বামীর জন্য ডিবের করিয়া পান লইয়া শয়ন করিতে গেল! নরেন্দ্র পূর্ব্বেই শয্যা অধিকার করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র বলিলেন—"আজকার ব্যাপারটা বোধ হয় কিছু গুরুতর হ'য়েছিল, কেমন?"

"না।"

"না বই কি। কি হ'য়েছিল শুনতে পাইনা কি? দেখ সরোজ, আজ কাল তুমি কেমন কেমন হ'য়েছ যেন। আগেকার মত আর এখন তুমি আমাকে কোন কথাই খুলে বল না; জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল ক'রে উত্তর দেও না। কারণ কি বল দেখি?"

"কারণ আবার কি। সব কথাই কি তোমার শুনতে হবে; আর বলেই বা লাভ কি। শুনলে তুমি কেবল কষ্ট পাবে বইত না।"

"তবুও যে যাকে ভালবাসে, নিজের দুঃখের কথা তার কাছে ব'ল্লে কষ্টের লাঘব হয়—মন অনেকটা শান্ত হয়। তবে তুমি আমাকে ভালবাস না।"

সরোজ আর স্থির থাকিতে পারিল না—স্বামী প্রণয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, ইহা বালিকার অসহ্য হইল। সে স্বামীর বুকে নিজের ক্ষুদ্র মস্তকটী রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নরেন্দ্র যত সান্ত্বনা করেন, তাহার আবেগ তত বৃদ্ধি হয়। পরে বালিকা কতকটা শান্ত হইয়া সেদিনকার ঘটনাগুলি একে একে সমস্ত বলিল। শুনিয়া নরেন্দ্র

হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন—কেবল স্ত্রীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিকার অশ্রুসিক্ত অধরে চুম্বন করিয়া বলিলেন—

"এই জন্য তুমি এত দুঃখিত হ'য়েছ। এটা ত আজ নূতন না—তবে দুঃখ কিসের সরোজ! আমি ত কত দিন বলেছি, সহ্য করার চেয়ে গুণ আর নাই। সয়ে থাক! যিনি সকলের বিচার করেন, তাঁর কাছে কখন অবিচার হবে না। এমন দিন আস্‌বে যখন ভগবান তোমার দুঃখ বুঝবেন।"

সরোজ মনে মনে বলিল—সে আর আমি ম'লে। নরেন্দ্র স্নেহভরে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"যে যাই বলুক না কেন, আমি ত সবই নিজের চক্ষে দেখেছি। সংসারের সকলে তোমাকে যতই ঘৃণা করে, আমি ততই ভালবাসি, তবে আর দুঃখ কিসের?" উভয়ের ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিশিল।

সরোজ মনে মনে বলিল, তা না হ'লে এত দিন কোন কালে মরিতাম। অন্তর্যামী জানেন, তোমার মুখ দেখ্‌লে আমি মরার কথা ভুলে যাই।

[ ৪ ]

দেবেন্দ্র বাবু সংসারের কোন খবরই বড় একটা রাখেন না। এ দিকে সংসারে কলহ অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকল কলহের মূল ঐ ছোট বৌ। ছোট বৌয়ের দোষ অনেক; সে বড় বৌ ও তাঁহার ছেলে মেয়েদিগকে দু'চক্ষের বিষ দেখে। না করিলে নয় বলিয়া সংসারের কাজ করে, সে ত কেবল বেগার দেওয়া। দুবেলা দু'মুঠো রাঁধে—তাও কি ছাই রাঁধা, না সে ছাই খাওয়া যায়? তবে না খেলে নয় তাই বড় বৌ দুটী খান! 'বাবু' ও তাঁহার ছেলে মেয়ে না খেয়ে মরিবার হাল হইয়াছে। এই ত কাজ, এর জন্য ছোট বৌ কত গুমোর না করে; পাড়ার সকলের কাছে কত বাখান করে—তাঁহার নিন্দা করে। বড় বৌয়ের যদি শরীর ভাল থাকিত তাহা হইলে তিনি ৫ মিনিটে অমন দশটা সংসারের কাজ একাই করিতে পারিতেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইদানীং বড় বৌয়ের সুর ফিরিয়াছে। এখন তিনি কথায় কথায় বলেন—"কেন সংসারে না থাকিলে ত কেউ কাউকে ক'রতে বলে না। এত অসহ্য হয় নিজেদের দেখে শুনে নিলেই ত হয়। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কথাই আছে। এতকষ্টে মানুষ ক'রেছে, লেখা পড়া শিখিয়েছে, বে থা দিয়েছে এখন রোজগার ক'রে মাগ নিয়ে আলাদা হ'লেই ত পারে। এক ঘোলে আর কত জল সয়।" পাড়ার গিন্নিদের কাছে বড় বৌ বলেন—আর দিদি কি বা শুনবে—এমন কলিকালই পড়েছে। ছোট গিন্নির আমাদের ইচ্ছে তিনি আলাদা হ'য়ে সুখ ভোগ করেন। এ সংসারে থাক্‌লে খাটতে হয় আমার ছেলে পুলের মুখ পানে চাইতে হয়, আমি খেতে দি নি, মাখ্‌তে দি নি, কথায় কথায় বকি আরও কত কি বলেন। তোমরা ত দেখ্‌ছ দিদি আমি সংসার ছেড়ে দিয়েছি। নিজে ক'র্‌ছেন, কর্মাচ্ছেন, খাচ্ছেন, মাখ্‌ছেন—তা এত ক'রেও যদি তাঁর মন না পেলুম, তখন 'আলাদা হ'য়ে রাজরাণী হ'লেই ত হয়। সোয়ামীর এখন চোক কাণ ফুটেছে, আর ভেয়ের তাঁবে থাক্‌বেন কেন? তা আমি তাঁর পিত্তেশ করি নি। তোমাদের কাছে দু'মুঠো ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু ওঁদের কাছে যাব না। রাত দিন কর্ত্তা গিন্নিতে মৎলব আঁটছেন। আম এত ক'রে মিন্‌সেকে বলি, তা মিন্‌সে কিছুতেই শুন্‌বে না—বলে তুমি ওসব কথা আমাকে বলো না। এখন ভাইকে এত ক'চ্ছেন, শেষে পস্তাবেন। কাঙ্গালের কথা বাশি হ'লে খাটে।

ফলতঃ দেবেন্দ্র ভাই ও বোনটীকে প্রাণের মত ভাল বাসিতেন। বড় বৌয়ের আচরণে তিনি মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রী অকারণে ছোট বৌকে নির্য্যাতন করিতেন এবং মাতাও সেই সঙ্গে যোগ দিতেন, ইহাতে তাঁহার আরও মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হইত। কিন্তু তিনি ইহা জানিয়াও প্রতিকার করিতে পারিতেন না। পিতৃমাতৃহীনা বলিয়া 'ছোট বৌমাকে' তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে তিনি ভাল মন্দ কোন কথাই বলিতেন না। প্রথম বয়সে তিনি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছেন, এখন যদিও নদীতে ভাঁটা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি ভরা নদীর জোয়ারের বেগে কতকটা জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্র নিজের দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত উৎসাহ হ্রাস হওয়ায় এখন তিনি গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছেন। কলহ

অশান্তি হইলেও তিনি এখন চাহিয়া দেখেন না। যে দিন নিতান্ত অসহ্য হয়, সে দিন তাঁহার বাল্যসুহৃদ ডাক্তার ভোলানাথ বাবুর নিকট গমন করেন।

অদ্য দ্বিপ্রহরের সময় বড় বৌয়ের ঘরে মজ্‌লিস্ বসিয়াছে। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তথায় উপস্থিত আছেন। কেহ পড়িতেছেন, কেহ গল্প করিতেছেন এবং স্বয়ং বড়বৌ তাঁহার সমবয়স্কাদের সহিত তাস খেলিতেছেন। বিনোদিনীও সেখানে ছিল, ছিল না কেবল ছোট বৌ। বিনোদিনীর ভাল লাগিল না, সে নিঃশব্দে উঠিয়া ছোট বৌয়ের ঘরে গেল। ছোট বৌ তখন খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। ছোট বৌ বলিল— "তুমি যে মজ্‌লিস্ থেকে চলে এলে ?"

বি। আমার ভাই ও সব ভাল লাগে না, তাই তোর কাছে এলুম।

ছো। তুই ভাই আর মায়ের কাছে আমার কথা কিছু বলিস নি।

বি। কেন কিছু হয়েছে নাকি ?

ছো। দিদি বলেন, ও কি বিনু বলে ? ছোট বৌ আমার নামে সাতখানা ক'রে তার কাছে নাগায়—ও ছেলে মানুষ যা শোনে তাই বলে, ওর দোষ কি ?

বিনোদিনী মুখভঙ্গি করিয়া কহিল—"ছেলে মানুষ যা শোনে তাই বলে বই কি। কেন আমি কি চোখের মাথা খেয়ে ব'সেছি যে কিছু দেখ্‌তে পাই নি। আমি ছেলে মানুষ কিছু বুঝি নি, আর উনি পাকা গিন্নি সবই বোঝেন।"

ছেলে মানুষ বলিলে বিনোদিনীর বড়ই রাগ হয়। তাহার বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক হইবে না। স্ত্রীকে চটাইবার ইচ্ছা হইলে বিনুর স্বামী তাহাকে ছেলে মানুষ বলিলেই সে রাগিত, তাহা দেখিয়া তিনি হাসিতেন।

বিনোদিনী ক্রোধভরে বলিল—"মাকে বলা না বলা সমান, তিনি যে ঐ একই গুরুর ছাত্র। এবার দাদাকে ব'লব—না হয় রাগ ক'রে আমাকে আর নাই আনবে। আমিও আর আস্‌তে চাই নি।"

ছোট বৌ মৃদু হাসিয়া বলিল—"তিনিও ত ঐ গুরুর ছাত্র।"

বি। ঠিক ব'লেছিস্। তিনি যে গুরুর চোক রাঙানির ভয়ে জুজু ! হাসিও পায় আর কান্নাও আসে—বলে 'এক ভস্ম আর ছার'। ধন্যি মেয়ে যা হোক্ !

এমন সময়ে অষ্টম বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা তথায় আসিয়া বলিল—"এই যে ছোট পিসিমা হেথায় ব'সে র'য়েছেন। আমি তোমাকে কত খুঁজে বেড়ালুম। মা যে তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

বি। কেন আমি ত আর আপিসে বেরুই নি যে তুই খুঁজে পাস্ নি। তুই যা আমি যাচ্ছি।

শীগ্‌গির এসো। ছোট কাকীমা, মা বোল্‌লেন, খোকা ঘুমুলে ও ঘরে গিয়ে পান সেজে দেবে এসো।" এই বলিয়া বালিকা প্রস্থান করিল।

বিনোদিনী বলিল—"মা ডাক্‌ছে বই কি ! আমি কি আর কিছু বুঝি নি—'কুলোয়' শুয়ে তুলোয় ক'রে দুধ খাই কি না ! আমি এসেছি দেখে মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, আমরা কি বলি না বলি তাই শুনবার জন্যে। মাগীর বজ্জাতি হাড়ে হাড়ে।"

ছোটবৌ। দেখ ভাই আমার আরও এক যন্ত্রণা হ'য়েছে ঐ মেয়েটার জন্যে। যে কথাটী হবে, ফুলি তখনই তা সাতখানা ক'রে মায়ের কাছে ব'লবে, আর আমাকে মিছে বকুনি খাওয়াবে।"

বি। যেমন গর্ভে জন্মেছে, তেমনি রীত প্রকৃতি হবে; তার উপর মায়ের দেখে ছায়ে শেখে। দেখ আমি বল্‌ছি ফুলিটে পাহাড়ে কারওয়ান হবে। যার ঘরে যাবে তার হাত তেতো ক'রবে।

ছোট বৌ। দেখ ঠাকুরঝি আজ ক'দিন থেকে আমার মনটা এমন খারাপ হ'য়েছে তা ব'লতে পারি নি।

বি। কেন ছোড়দাদা ব'কেছে বুঝি ?

ছোট বৌ। দূর তা কেন।

বি। তবে কি ?

ছোট বৌ। তা বল্‌তে পারি নি। আমার বোধ হয় শীগ্‌গিরই কোন একটা অমঙ্গল হবে।

বি। তোর যে আর কথা।

ছোট বৌ। কালরাত্রে তাঁকে বলেছিলুম—তিনিও আমাকে কত বুঝুলেন; কিন্তু তাঁরও মনটা তত ভাল না।

বি। তুই অমঙ্গলের কথা বলেছিলি, তাই ত তাঁর মনটা খ'রাপ হয়েছিল। আমি জানি, ছোড়দাদা তোকে

প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। নারীজন্মের সার জিনিষ—স্বামীর ভালবাসা তুই যথেষ্ট পেয়েছিস। তাই তবে তোর আর দুঃখ কিসের?

ছোট বৌ একটু লজ্জিত হইল। কথাটা ঢাকা দিবার জন্য বলিল—"এই যে খোকা ঘুমিয়েছে। যাই ও ঘরে। আবার পান দিতে দেরি হ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।"

"ব'কলেই হ'ল—বকে ত আজ আমার কাছে শুন্‌তে পাবে। পরের শরীর বুঝি আর শরীর নয়—পাথর। সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু জিরুতে এলে ছেলে রাখ, পান দেও, জল দেও, যেন কেনা গোলাম পেয়েছে। নিজের শরীরটে ত খুব বোঝেন।" এই বলিয়া উভয়ে বড় বৌয়ের ঘরের দিকে গেল।

[ ৫ ]

বড় বৌয়ের ঘরে তাস খেলার খুব ধুম উঠিতেছে; 'ছক্কা' 'পঞ্জা'র ছড়াছড়ি। বড় বৌয়ের আজ বড়ই 'বে-পড়তা' হইয়াছে, খেলিতে বসিয়া অবধি হার হইতেছে। বড় বৌ তাঁহার নিজের খেলুড়েকে মাঝে মাঝে বকিতেছেন এবং তাহার খেলার দোষেই যে এত হারিতেছেন, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বারম্বার সকলকে সেই কথা শুনাইতেছেন। ছোট বৌ পান সাজিয়া সকলকে দিল, এমন সময় ফুলি তথায় উপস্থিত হইল। ছোট বৌ তাহাকে আদর করিয়া বলিল—

"ফুলি মা, একটা বার ওঘরে যা; খোকা সেখানে একা রয়েছে; ঘুমন্ত ছেলে যদি বিছানা থেকে পড়ে যায়, তবে খুন হ'য়ে যাবে।"

ফুলীমুখ ঘুরাইয়া বলিল—"আমি পারবো নাকো। আমার কাজ আছে।"

"একটীবার যাও মা; আমি এখনই যাচ্ছি। তখন তুমি যেখেনে ইচ্ছে যেও এখন।"

"তুই যদি আমাকে ঐটে পেড়ে দিস্, তা'হলে আমি এখনিই যাব।" এই বলিয়া বালিকা আলনার উপরস্থিত একটা কাচের খেলানা দেখাইয়া দিল। বড় বৌ একজন ফিরিওয়ালার নিকট হইতে ঐ খেলানাটী কিনিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা ঐটা লইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে; কিন্তু তিনি তাহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহা ঐ উচ্চ স্থানে রাখিয়াছিলেন। বড় বৌ বেলওয়ারী খেলানা পুতুল বড় পছন্দ করিতেন। ছোট বৌ বলিল,

"তা আমি পারবো না বাছা—দেখলে তোমার মা আমায় খেয়ে ফেলবেন।"

বালিকা আরও আগ্রহের সহিত বলিল—"ছোট কাকীমা, তোর পায়ে পড়ি, একটীবার আমার হাতে দে, আমি দেখে আবার তোকে দোব, তুই তখন রেখে দিস্। মা ওদিকে ফিরে তাস খেল্‌ছে, দেখতে পাবে না।"

ইহাতে আপত্তির কোন কারণ না দেখিয়া ছোট বৌ খেলানাটী পাড়িলেন। বালিকা আগ্রহের সহিত তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, কিন্তু অসাবধানতা বশত উহা বালিকার হাত হইতে সানের মেজেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! বালিকা ভোঁ দৌড়!—আর ছোট বৌ একেবারে জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ!

ঝন্‌-ঝন্‌-ঝন্‌-ঝন্‌—বড় বৌ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার বড় যত্নের বেলওয়ারি খেলানা চুরমার! ঠিক তার একটু আগে বড় বৌ আর এক পঞ্জা হারিয়াছেন। ফুটন্ত তৈলে জল পড়িলে যেমন হয়, বড় বৌয়ের অবস্থা তাহাই হইল। আলু থালু বেশে দৌড়িয়া মেয়েকে ধরিতে গেলেন, মেয়ে সময় বুঝিয়া আগেই চম্পট দিয়াছিল। লাভের মধ্যে কাচভাঙ্গায় বড় বৌয়ের পা কাটিয়া রক্ত বাহির হইল! "উহুঃ গেলুম" পা টিপিয়া বড় বৌ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। ব্যস্ত হইয়া ছোট বৌ জলের কুঁজো লইয়া তাঁহার আহত স্থানে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিতে গেল। বড় বৌ কুঁজোয় পদাঘাত করত চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তোর আর গিন্নিপনায় কাজ নেই, তুই আমার সামনে থেকে যা।"

কুঁজোটা ভাঙ্গিয়া মেজেয় জলের ঢেউ খেলিল; ছোট বৌও সেই পদসঞ্চালনে পড়িয়া গেল। পিঠ ও বাঁ হাত কাচে কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ঘরের আর সকলেই অবাক হইয়া দেখিতেছিল। একজন ব্যস্ত হইয়া ছোট বৌয়ের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "ওমা, বড় বৌ কর্‌লি কি! বৌটা যে কেটে খুন হ'ল।"

বড় বৌ সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, "এমন নচ্ছার নোক আমি ভূ-ভারতে দেখিনি। আরও তোমরা যে বল, আমি মিছেমিছি বকি, ঝগড়া

করি, মানুষের চামড়া যার গায়ে সে এসব দেখে কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌বে।"

একজন সমবয়সী বলিল—"তা ভাই মিছে ওর দোষ দিলে চ'লবে কেন; আমি নিজের চোক্ষেই দেখলুম, তোমার মেয়েই ত খেলনাটা ভাঙ্গলে।"

"মেয়ের দোষ কি, সে চেয়েছিল, ও গিন্নিপনা ক'রে তাকে দিতে গেল কেন? আমার কাছে চেয়েছিল, আমি দি নি। আমার চেয়ে ওর দরদ বেশি হ'ল? বলে "মার চেয়ে যে ভালবাসে তাকে বলি ডান্‌'।"

"তা ছেলেমানুষ, এক কাজ ক'রে ফেলেছে—"

"ছেলেমানুষ—থুবড়ী ক'রে বিয়ে দিয়েছে, নইলে এত দিনে সাত ছেলের মা হ'ত! একটু আক্কেল হয় না। ঐ ত আমার মেয়েটাকে খারাপ ক'রলে। যে জিনিষে হাত দেবে, তাই ভেঙ্গে চুরমার ক'রবে। ঐ জন্যেই ত আমি ওকে এ ঘরে আসতে দি নি।"

একজন বর্ষীয়সী বলিলেন—"নে বড় বৌ যা হবার হয়েছে, ওকে আর বকিস্‌ নি। আহা বাছার গা দিয়ে রক্ত পোড়ছে। আর মা, ঘাট করেছিস, বড় 'যা' এক কথা বলেছে, তাতে কাঁদতে আছে? উঠে ঘর দোর পরিস্কার কর, কাচগুলো বেশ ক'রে খুঁটে ফেলে দিস্‌।" এই বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন।

"ঢং দেখে আর বাঁচি নি! একজনকে খুন ক'রে কান্না হচ্ছে। থাক তুই সুখে ঘরকন্না কর। পোড়ারমুখো মিন্‌সে এলে আজ ব'লবো তোমার সোহাগী ভাদ্দর বৌকে নিয়ে সুখে থাক, আমি আর তোমার সংসারের জঞ্জাল হ'য়ে থাক্‌তে চাই নি।"

এমন সময়ে শাশুড়ীর গলার স্বর এবং সেই সঙ্গে খোকার ক্রন্দন শ্রুত হইল। বৃদ্ধা ছেলে কোলে লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে আসিয়া বলিলেন—"বাছা এমন ডাইনীর হাতেও ছেলেটাকে দিয়েছিলে। ঘুমন্ত বাছা আমার বিছানা থেকে প'ড়ে—আহা মাথাটা দুভাগ হ'য়ে গেছে। ভাগ্যি আমি টের পেয়েছিলুম, নইলে আজ আমার যে কপালে কি হ'ত—" বৃদ্ধা চোখে কাপড় দিলেন।

খোকার মাথা কাটিয়া একটু একটু রক্ত পড়িতেছিল। বড় বৌ উন্মাদিনীর ন্যায় বলিলেন, "ওগো তোমরা দেখ, আমার খোকা বুঝি নাই—ও সর্ব্বনাশি, এতদিনে তোর মনস্কামনা সিদ্ধি হ'ল—" আর বলিতে পারিলেন না, ঢিপ্‌ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো তোমরা শীগ্‌গির দেখ, আবার বুঝি আমার কি সর্ব্বনাশ হয়।"

জনৈক প্রতিবেশিনী বলিল, "মা', তোমার কোন ভয় নেই। এখুনি সেরে যাবে। বড় বৌয়ের হিষ্টিরিয়া হ'য়েছে। আর ওর ত মাঝে মাঝে 'ফিট্‌' হয়, তবে আর ভয় কচ্ছ কেন?"

তখন সকলেই বড় বৌয়ের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইল। আর ছোট বৌ? সে মৃতবৎ এক পার্শ্বে বসিয়া আছে, চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভিজিয়া গিয়াছে। বিনোদিনী তাহার হাতখানি ধরিয়া উঠাইবার জন্য নিকটে গেল—ছোট বৌ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

[৬]

মধুমাস ফাল্গুনের রাত্রি। পূর্ণিমার চাঁদ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আকাশের মাঝখানে বসিয়া সমস্ত জগৎকে হাসাইতেছেন। গাছের শিশিরস্নাত পাতাগুলিতে চাঁদের কিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পৃথিবীর উপরে সমস্ত রূপার গিল্টি করা। রাত বারটা বাজিয়াছে; ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। কোকিলের 'কু-উ' এবং পাপিয়ার 'বউ কথা কও' রব ছাড়া জড়জগৎ সুপ্ত, নিস্তব্ধ।

দেবেন্দ্রের শয়নকক্ষের একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত ভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দাদা!"

দেবেন্দ্র বাবু এইমাত্র নিদ্রিত হইয়াছেন। আপিস হইতে সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ। ভাবিলেন, আজ একটা কিছু গুরুতর রকমের হইয়াছে। তখন আপিসের কাপড় ও জামা বারান্দায় রাখিয়া 'বিনু' বলিয়া ডাকিলেন। বিনোদিনী আসিলে দেবেন্দ্র বাবু গোপনে সেদিনকার ঘটনা সমস্ত শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিলেন। অনন্তর তিনি বড় বৌকে দ্বার খুলিতে অনুরোধ না করিয়া বন্ধু ভোলানাথ বাবুর বাড়ীতে গেলেন। পরে অনেক ডাকাডাকির পর বাড়ী আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া শুইতে প্রায় ১১টা

বাজিল। আপিস হইতে আসিয়া স্বামী তাঁহার সাধ্য সাধনা করিল না দেখিয়া বড় বৌয়ের আরও রাগ হইল, আঁচল পাতিয়া ঘরের সিমেণ্টের উপর শুইয়া দেবেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র আহারান্তে ঘরে আসিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিলেন; স্ত্রীর সহিত কোন কথাই কহিলেন না।

নরেন্দ্রনাথ আবার ডাকিল—"দাদা!"

দেবেন্দ্র শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেও নরেন নাকি? এত রাত্রে কেন, কি হয়েছে?"

হাঁ আমিই দাদা। শীগ্‌গির একবার উঠে আসুন।"

"ব্যাপার কি? কি হ'য়েছে নরেন?"

"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দাদা! ছোট বৌ কেমন ক'রছে, বোধ হয় আফিং খেয়েছে!" নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিল।

"আ—ফিং—খেয়েছে" এই কয়টী কথা বলিয়া দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বড় বৌ জাগ্রত ছিলেন। নাকি সুরে বলিলেন -"তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেম্‌নি বুঝলে। আফিং টাফিং সবই মিছে, কেবল একটা সোরগোল ক'রে আমাকে জব্দ ক'রবার চেষ্টা!"

দেবেন্দ্র সে কথায় কাণ না দিয়া নিজের জামার পকেট খুঁজিলেন, হরি! হরি! আফিংয়ের কৌটা ত নাই! আজ যে তিনি এক ভরি আফিং কিনিয়া কৌটা ভরিয়া রাখিয়াছেন। দেবেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে আসিলেন। নরেন্দ্রের চক্ষে জল দেখিয়া বলিলেন। "কেঁদো না ভাই। বিপদের সময় ধৈর্য্য চাই। তুমি শীঘ্র ভোলানাথ বাবুকে ডেকে আন—আচ্ছা থাক তোমার গিয়ে কাজ নাই, তুমি ওঘরের দিকে যাও, আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এখনই আস্‌ছি।"

নরেন্দ্র দেখিলেন সরোজের মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে। সে অতি কষ্টে কহিল—"কোথায় গিয়েছিলে? আর আমার বেশী সময় নাই—এখন একটু আমার কাছে ব'স—আমি তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি।"

নরেন্দ্র কাঁদিয়া কহিল—"সরোজ! কি দোষে তুমি আমাকে ছেড়ে চল্লে—তুমি কেন এমন কাজ করলে।"

"তুমি কেঁদ না—তোমার চথে জল দেখ্‌লে মরণেও আমার সুখ হবে না।" বালিকা স্বামীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল, এক বিন্দু অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া পড়িল।

দেবেন্দ্র ডাক্তার ভোলানাথ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার মাতা ও ভগিনীও আসিল। ছোট বৌ ঘোমটা দিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া বসিল। ভোলানাথ বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন; তাহাতে কোন ফল না পাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে উদরস্থ অহিফেন তুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তখন তিনি ইংরাজিতে বলিলেন—

"রোগীর আর জীবনের আশা নাই। বোধ হয় অনেকটা আফিং খাওয়া হইয়াছিল। উহা এখন পাক যন্ত্র ত্যাগ করিয়া রক্তের সহিত সমস্ত শরীরে মিশিয়াছে।"

দে। ঔষধে কোন উপকার হয় না?

ভো। কেমন করিয়া হবে। যে পরিমাণ আফিং ঔষধে নষ্ট করিতে পারে তাহার চেয়ে খুব অধিক পরিমাণে খাওয়া হ'য়েছে। আশা করা যেত, যদি কতকটা পেট থেকে উঠত।

দে। তবে কি হবে?

ভো। এই শেষ ঔষধটা দিয়ে দেখি, এতে না হ'লে আমার অসাধ্য। আচ্ছা কতটা পরিমাণ আফিং ছিল?

দে। আজ সবে এক ভরি কিনে এনেছিলুম।

"Then quite hopeless. (তবে আর কোন আশাই নাই) চল আমরা একটু বাইরে বসি। নরেন দে'খ যেন রোগী ঘুমোয় না।" এই বলিয়া তিনি দেবেন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া বাহিরে গেলেন।

বিনোদিনী বলিল—"দাদা, ডাক্তার বাবু কি ব'ললেন? নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বিনু আর কোন আশা নাই। বিষ রক্তের সঙ্গে মিশেছে—আর এখানে এখন ভাল ডাক্তারই বা কোথায় পাব?"

মা বলিলেন—"ছিঃ বাবা কাঁদে কি! কালই তোকে আবার বে দিয়ে লক্ষ্মীর মত বৌ ঘরে আনুব।"

বিনোদিনী কাঁদিয়া বলিল—"এর চেয়ে 'লক্ষ্মীর মত বৌ' আর কোথাও পাবে না মা! দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না।"

ছোট বৌ অতি কষ্টে বলিল—"ঠাকুরঝি এ সময়ে

মাকে কিছু ব'লো না। আমার কপাল মন্দ তাই এক দিনের জন্যও মাকে সুখী ক'র্তে পারিনি। মা, এই মরণের সময়ে আমার সব দোষ ভুলে যাও।" এই বলিয়া মায়ের পদধূলি মাথায় দিল। "আর ঠাকুরঝি! তোমার কাছে যদি দোষ ক'রে থাকি, ভুলে যাও—এই অভাগিনীর কথা মনে করো—আর বল্‌তে পারি না--আমার আর বেশী সময় নাই—চোখে আঁধার দেখ্‌ছি।"—

বিনোদিনীউ চৈচ্চঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সে ঘর হইতে বাহির হইল; মাও মুখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন।

সরোজ নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"আমি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—তুমি আরও নিকটে এস। তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেও।"

সরোজ স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় দিল। নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতেছিল। সরোজ বলিল—"তুমি কেঁদ না, তোমার চ'খে জল দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়! বড় দুঃখ রইল যে সাধ মিটিয়ে এক দিনও তোমার সেবা ক'র্‌তে পেলুম না। তুমি আমার জন্যে এক দিনের তরেও সুখী হও নি। আমার মাথা খাও, আমার মৃত্যু কালের অনুরোধ, আবার যে ক'রে সুখী হ'য়ো।"

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে স্ত্রীর নত-মস্তক নিজের উরুদেশে রাখিল। সেই মৃত্যু-ছায়াগ্রস্ত মুখখানি মুক্ত বাতায়নের চন্দ্রিকারশ্মি মাখিয়া বড়ই সুন্দর হইল। নরেন্দ্র সেই ওষ্ঠে নিজ ওষ্ঠ সংস্পর্শ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই মৃত্যুক্লিষ্ট অধরে একটু হাসি ফুটিল। নরেন্দ্র ভাবিল নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা উজ্জ্বলতর হইল।

সরোজ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ—ঐখানে"। নরেন্দ্র দেখিল সরোজ পূর্ণিমার শশধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। নরেন্দ্র স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল--"ঐখানে কি সরোজ?"

"এক দিন—ঠিক এমনি চাঁদনি রেতে তুমি ব'লেছিলে 'সরোজ, আমরা আবার ওইখানে গিয়ে মিলব।' তা আমার মনে আছে। তুমি যত দিন না এস, আমি ওখানে তোমার জন্য বসে থা'কব।"

সরোজ এক দৃষ্টে স্বামীর মুখ পানে তাকাইয়া আছে। অল্প অল্প বাতাসে তাহার চূর্ণ কুন্তলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল রশ্মি সেই মুখের উপর ক্রীড়া করিতেছে এবং অধরে ক্ষীণ হাসির জ্যোতিটুকু তখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র নিমেষশূন্য হইয়া তাহাই দেখিতেছে।

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

# ব্যবস্থায় অবস্থা।

## কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাসী।

আফরিকার কৃষ্ণ নর নারী, কৃষ্ণ বালক বালিকা, যে, কতকাল ইউরোপ এশিয়ার দাস্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে; কবে যে উহাদিগকে প্রথম দাস্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা যায় না।

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা।"

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজ্যের কবে ধ্বংস হইয়াছে! রোমকের জন্য উত্তর আফ্রিকায় যে কার্থেজকে চিরন্তন স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, সে কার্থেজ রাজ্য কবে ভূগোল বিবরণ হইতে অপসৃত হইয়াছে! কার্থেজের স্বতন্ত্র ইতিহাস পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে! এখন চিরশত্রু রোমকের ইতিহাসেই কার্থেজের ইতিহাস স্থান পাইতেছে। কার্থেজের মহাবীর হেমিল্‌কার এবং তাঁহার পুত্র জগতের অদ্বিতীয় বীর হেনিবলকে রোমক বীর সিপিয়োদিগের পার্শ্বচর হইয়া পূর্ব্বস্মৃতির উদ্দীপনা করিতে হইতেছে। বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াও, যে হেনিবল ভবিষ্যৎ দিগ্বিজয়ী নেপোলীয়ানের শিক্ষকরূপে এবং আদর্শভাবে পরিচিত হইয়াছেন, যাঁহার যান অভিযান এবং সমরকৌশল ও সৈন্য চালনার পরিচয় ইতিহাসে পাইয়াই, নেপোলীয়ন স্বীয় যান অভিযান আক্রমণ ও সৈন্যচালনার রীতি প্রকৃতি এবং পন্থা পদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন; যে হেনিবল খৃষ্টজন্মের ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে স্পেন হইতে রোমে আসিবার জন্য সসৈন্যে পিরিনীশ ও আলপ্‌স্‌ পর্ব্বত পার হইয়া, নেপোলীয়ানকে

পথ দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন; দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যিনি নেপোলীয়ানের ভবিষ্যৎ পর্ব্বত-লঙ্ঘন বিদ্যায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, সেই হেনিবলকেও—কার্থেজের সেই অদ্বিতীয় সেনাপতিকেও এখন রোমের ইতিহাসে নাম রাখিতে হইতেছে। আবার সেই প্রাচীন রোমকেও—তৎকালদৃষ্ট সসাগরা ধরার অধিপতি রোমকেও এখন কেবল প্রাচীন ইতিহাসেই পূর্ব্বতন অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে। রোমক বীর মেরীয়সকেই নির্ব্বাসিত হইয়া, সিলার ভয়ে পলাইয়া, কার্থেজের ধ্বংসাবশেষে বসিয়া গাহিতে হইয়াছিল;—

"নাহি সে কার্থেজ নাহি সে গ্রীশ।
থাকিবেনা রোম জানে জগদীশ॥"

জগদীশের সবই জানা ছিল সবই জানা আছে, তাঁহার লীলা খেলা, কীটানুকীট মানুষ বুঝিবে কিরূপে?

যে কার্থেজের সন্তানদিগকে পরে রোমকদিগের দাসত্ব করিতে হইয়াছিল, সেই কার্থেজের সেই সন্তানেরাই উত্তর আফরিকায় বসিয়া, আফরিকার যত কৃষ্ণ কৃষ্ণাকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া, বিরাট দাস-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পুষ্টি করিয়াছিলেন। উত্তর আফরিকার যে সকল প্রদেশ এখন মরক্কো অলজিরীয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত, অল্পদিন পূর্ব্বেই যে প্রদেশপুঞ্জের ভিতর বর্ব্বরি প্রদেশ মুসলমান, আরব ও মুরদিগের দাস-বাণিজ্যের বাণিজ্যশালা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশেই কার্থেজের জন্য দাস-দাসী সংগৃহীত হইত। যে সূদন সে দিনও দাস-মৃগয়ার প্রধান নর-বন বলিয়াই পরিচিত ছিল, যে সূদনের দাস-মৃগয়া রহিত করিবার জন্য বৃটিশবীর বেকার, গর্ডন প্রভৃতিকে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, যে সূদনক্ষেত্র আরবীয় মুসলমান-দিগের দাস সংগ্রহের জন্য একপ্রকার জনশূন্যই হইয়া পড়িয়াছিল, যে বিশাল সূদন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—অষ্টে পৃষ্ঠে বহু দাসদাসী-পূর্ণ দাস গুদামে আছন্ন হইয়াছিল, কার্থেজের জন্য সেই সূদনেও দাস দাসী সংগ্রহ হইত।

কার্থেজের ধনপতিরা দাস বাণিজ্যে ধনবৃদ্ধি করিতেন। কার্থেজের দাস আড়তে দাস দাসী ধরিত না; কার্থেজের হাটে দাস দাসীর ছড়াছড়ি হইত। কার্থেজে কিনিয়া যত লোকে এশিয়া ইউরোপে দাস দাসী রপ্তানী করিত। তখনকার গ্রীস ও রোমেও আফরিকার দাস দাসীরা দরে বিকাইত। যুবতী কৃষ্ণদাসীদিগের চারিদিকেই আদর ছিল। ইউরোপের তৎকালীন শ্বেতপুরুষেরা কৃষ্ণ কামিনীর কালো বরণে মুগ্ধ হইতেন। আফরিকার কৃষ্ণ যুবকেরা যে, ইউরোপের শ্বেতরমণীদিগকে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন, তাহা পাঠক, শেক্সপীয়রের ওথেলো তোমাকে এখনও দেখাইয়া দিতেছেন। সদরে স্বয়ং সেক্সপীয়র যাহা করিয়া আসিতেছেন, এতদিনের পর তাহার অনুবাদক হারাণচন্দ্র রক্ষিত অন্দরেও সেই কাজ করিতে বসিলেন। এক ওথেলোর জন্য একটী দেস্‌দেমোনাকে আত্মহারা হইতে দেখিয়া পাঠক বিস্মিত হও, এমন কত শত ওথেলো কত সহস্র দেস্‌দেমোনাকে হতচৈতন্য করিয়াছিলেন। রোমের অদ্বিতীয় মনস্বী ঋষিকল্প কেটোর কন্যা পোর্শিয়াকে যে যুবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছিল, সেই যুবকও তোমার এক কৃষ্ণবর্ণ আফরিক রাজার কালাচাঁদ পুত্র ছিলেন। যে হাব্‌সীকে কলিকাতার পথে ঘাটে দেখিলে এখনও অবাক্ হও, যে হাব্‌সীর জন্য কলিকাতায় হাব্‌সি-পাড়া এখনও প্রসিদ্ধ, বিলাতের বিখ্যাত লেখক এডিসন্ত নিজের "কেটো" নাটকের নায়ক যুবাকে সেই আবলুশ-বরণ হাব্‌সীর রূপেই রূপিত করিয়াছেন, হাব্‌সীর সাজেই সজ্জিত করিয়াছেন।

কালো ভালো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কালো, দ্রৌপদী কালো, কোকিল কালো, শ্যামা কালো; বুলবুল বোস্তা কালো; কালো জগতের আলো। আফরিকার কৃষ্ণ নর নারীদিগের তাই ত সেকালে সর্ব্বত্র সমাদর ছিল। তাই ত নবাব সুবা সাহ সুলতানদিগের অন্তঃপুরে কৃষ্ণ দাসীর আদর ছিল। তাই ত কালামুখী বাঁদীরাও বেগম হইতেন, তাই ত যুবক কৃষ্ণ দাসেরাও অনেক সময়ে শাজাদী নবাবজাদীগণের মনচোরা হইয়া জল্লাদ হস্তে শির দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাই ত ইউরোপ এশিয়ার মত রাজ্যের ন্যায় আমাদের ভারতেও বৌদ্ধযুগে কার্কর-তনয়াদিগের প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

## কিন্তু নবযুগে।

প্রাচীন যুগের ন্যায় নবযুগেও কৃষ্ণ দাসদাসীদিগের আদর বাড়িয়াছিল, কিন্তু তখনকার আদরে আর এখন-

কার আদরে অনেক প্রভেদ ছিল, উৎপীড়নের তারতম্য নিবন্ধনই প্রভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পাঠক, নবাবিষ্কৃত আমেরিকার জন্যই যে, আফরিকার কৃষ্ণ নর নারীদিগকে গোমেষাদির মত পণ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে হইয়াছিল, আমেরিকার আবাদ ও খনির জন্যই যে আফরিকার নিগ্রোজাতীয় কৃষ্ণ নর নারীকে জননী জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইত, তাহা এখন আর কাহারই অবিদিত নহে। কিন্তু নিষ্ঠুরতার সূত্রপাত হইয়াছিল এক করুণাময় খৃষ্টান পাদরির দয়াশীলতার জন্য, ইহা বোধ হয় সকলের বিদিত নহে! অসীম দয়াশীলতার জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার সূত্রপাত হইয়াছিল, পুণ্যের জন্য পাপের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, ধর্ম্মের জন্য অধর্ম্মের ঝড় উঠিয়াছিল, পরার্থপরতার জন্য পরপীড়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল, লোকরক্ষার জন্য লোকধ্বংসের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এই বিরোধালঙ্কার বোধ হয় সকলে জ্ঞাত নহে। অগ্রে এই বিরোধ পরম্পরার আভাস দিয়া, আমাদিগকে পরে অন্য কথা কহিতে হইবে। প্রথমেই আমাদিগকে সেই করুণাময় পাদরি পুঙ্গবের কথা কহিতে হইবে।

## বিশপ লা কাসা।

আমেরিকা আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত হইবার কিছুদিন পরেই, ইউরোপের পর্ত্তুগাল ও স্পেন সেখানে রীতিমত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; পর্ত্তুগাল ও স্পেনের অনেক লোকই সে দেশে গিয়া খনি খুলিয়া সোনারূপা প্রভৃতি ধাতু বাহির করিতে থাকেন, অনেকে নানারূপ কৃষি কার্য্যেও প্রবৃত্ত হন। পর্ত্তুগাল ও স্পেনের লোকেই আমেরিকাধিকারে অগ্রণী, পরে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজও অগ্রসর হন, সেখানে খনি ও কৃষির কার্য্যেও পর্ত্তুগালের লোকেই প্রথমে পথ দেখান, পরে আর সকলেও সেই পথের পথিক হন।

খনি ও ক্ষেত্রের কার্য্যে পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে আমেরিকারই আদিম অধিবাসীদিগকে নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু সে কঠোর কার্য্যে তাহাদিগের কষ্টের অবধি থাকিত না, অতিশ্রমে কাতর হইয়া অনেককেই প্রাণ দিতে হইত। ধর্ম্মপ্রাণ করুণাময় ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মরক্ষক লা কাসা সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য, আদিম মার্কিণদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য, স্বদেশ স্বজন ছাড়িয়া আমেরিকায় বসবাস করিতেছিলেন, চিয়াপা প্রদেশের বিশপপদে বৃত হইয়া, যীশু খৃষ্টের শিষ্যত্ব করিতেছিলেন, আদিম মার্কিণদিগের প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। তাহাদিগকে অতিশ্রমে কষ্ট পাইতে হইতেছে—প্রাণ দিতেও হইতেছে, দেখিয়া বিশপই প্রথমে আফরিকা হইতে নিগ্রো লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন, পর্ত্তুগালের তৎকালীন রাজা চার্লসকে বলিয়া দাস ব্যবসায়েরই ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিশপ দেখিয়াছিলেন, আফরিকার নিগ্রোজাতি যেমন সবল, তেমনই দৃঢ়কায়; যেমন পরিশ্রমী, তেমনই সহিষ্ণু। তাই তিনি আদিম মার্কিণদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই আফরিকদিগের আশ্রয় লন, আফরিক দাসদাসীদিগকে যে, শেষে যাবজ্জীবন মৃত্যু যন্ত্রণা ভুগিতে ভুগিতে শ্বেতপুরুষদিগের নির্দ্দিষ্ট নরকে বাস করিতে হইবে, মেষ মহিষাদি অপেক্ষাও যে, তাহাদিগকে, নিষ্ঠুর মানবের হস্তে অধিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে হইবে, কসাইখানার গরু বাছুর অপেক্ষাও যে, তাহাদিগকে অধিক ছট্‌ফট্ করিতে হইবে, তাহা করুণাময় বিশপ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তিনি হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়া বসিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য তাঁহার পুণ্যময় ছিল, সাধন কিন্তু পাপপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই করুণাময় ধর্ম্মপ্রাণ পাদরিপ্রবরকেও তাই শেষে আশীর্ব্বাদভাজন না হইয়া ঘোর অভিসম্পাতেরই অধীন হইতে হইয়াছিল, দেবদূতকে শয়তান-শিষ্যের আসনে অভিষিক্ত হইতে হইয়াছিল। সংসার শয়তানের রাজ্য। ইংলণ্ডের কবিবর শেলি নিজের "ইস্‌লাম রিভোল্ট" মহাকাব্যে বলিয়াছেন, "জগতের দুই রাজা। এক রাজা পরমেশ্বর, আর এক শয়তান। কলিযুগে শয়তানই অধিক প্রবল। শয়তান সসৈন্যে পরমেশ্বরকে পরাস্ত করিয়াছে, তাই এখন জগতে শয়তানের লীলা খেলাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তাই সংসারে পাপের স্রোতই সর্ব্বত্র অধিক প্রবল।"

কবির কথা মিথ্যা নহে। সংসারের অনেক সদনুষ্ঠানের ফল বিষময় হইয়া থাকে, পুণ্যের সরিতে পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়, অমৃত বীজে গরল গাছ উৎপন্ন হয়, আমেরিকায় চিয়াপার বিশপ লা কাসা পুণ্যের পুকুর কাটিয়া

ছিলেন, তাহা কিন্তু পূর্ণ হইয়াছিল পাপজলে, পাপজলে পাপের কূর্ম্ম কর্কটাদিই গিজ গিজ করিয়াছিল।

## দাস বাণিজ্য।

আমেরিকার কারীব সাগরীয় দ্বীপমালার মধ্যে হেটি বা সান ডমিঙ্গো দ্বীপই আয়তনে দ্বিতীয়, এই দ্বীপই কলম্বস কর্ত্তৃক হিস্‌পানোলীয়া নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই হেটিদ্বীপেই প্রথমে আফরিকা হইতে কৃষ্ণ দাস ও কৃষ্ণ দাসীদিগের আমদানী হয়——আমদানী প্রচুর পরিমাণেই হইতে থাকে। পর্ত্তুগালের রাজা চার্লস, বিশপ লা কাসার পরামর্শে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে আদেশ করেন, "আফরিকায় আমার গিনিরাজ্যে প্রভৃত নিগ্রো নরনারী দাস্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে, অতঃপর ঐ প্রদেশের যত দাস দাসীই আমার মার্কিণ রাজ্যে প্রেরিত হইবে।" দাস দাসী প্রথমেই হেটিদ্বীপে প্রেরিত হইতে থাকে।

পর্ত্তুগীজ প্রথমে আসর লইলেন, ক্রমে ইউরোপের আর আর অবতারও আসরে নামিতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডের নামজাদা নাবিক সার জন হকিন্‌সই ইংরেজ অবতারদিগের মধ্যে প্রথম। পরে বিলাতের অনেকেই দাস ব্যবসায়ে বদ্ধপরিকর হইয়া অনেক অর্থ ন্যস্ত করেন। আমেরিকায় ইংলণ্ডেরও অনেক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারীব সাগরের জামেকা প্রভৃতি দ্বীপও আদিতেই ইংরেজ হস্তে পড়িয়া ইংরেজ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

## বিলাতের ব্যবসায়।

সার জন হকিন্‌সের দেখা দেখি, অনেক ইংরেজ ও ডচ দাস-বাণিজ্যে রত হইয়া উঠিলেন। যে বাণিজ্যে বিলাতের লোকে হাত দেন, সেই বাণিজ্যেরই হঠাৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দাস বাণিজ্যেরও হু হু করিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। নিগ্রো দাস দাসীদিগকে বিলাতের দাস ব্যবসায়ীরা আপনাদের যত মার্কিণ রাজ্যে পাঠাইতে লাগিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে ইংলণ্ডের দাস ব্যবসায়ীরাই ৩ লক্ষ নিগ্রো দাস দাসী আমেরিকায় চালান দেন। ১৭০০ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এক জামেকা দ্বীপেই, বিলাতী দাস-গুদাম হইতে ৬ লক্ষ ১০ হাজার দাস দাসী প্রেরিত হয়। কিন্তু দাস দাসী প্রেরিত হইয়াছিল। অনেক দ্বীপে অনেক স্থানে। দাস দাসীর সংখ্যা করাও তখনই দুঃসাধ্য হইয়াছিল; এখন ত কথাই নাই।

## দাস বাণিজ্যে যৌথ করিবার।

যৌথ কারবারে বিলাতের লোকে অদ্বিতীয়। সমুদ্রের ঢেউ গণা কার্য্যেও ইহারা যৌথ কোম্পানি করিয়া থাকেন। দাস ব্যবসায়ের জন্যও বিলাতের লোকে যৌথ কোম্পানি বসাইয়া ছিলেন। কোন কোন পুরাতন কোম্পানিতেও দাস দাসীর কাজ চলিতে লাগিল। ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও যে দাস ব্যবসায়ে ঔদাসীন্য করেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কোম্পানির দাস ব্যবসায় দেখাইবার জন্য পূর্ব্বতন ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের দাসী পক্ষপাতেরও পরিচয় দিয়াছি।

## ব্রিষ্টল ও লিবারপুল।

বাণিজ্য ও বাণিজ্যপোতের জন্য ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল এবং লিবারপুল চিরপ্রসিদ্ধ, তখন আরও প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রিষ্টলের দাস-হাট জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। নিগ্রো বাণিজ্যে প্রথমে ব্রিষ্টলই অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন, ব্রিষ্টলের যত বাণিজ্য-পোতই দাস-বাণিজ্যে মত্ত হইয়া উঠে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ, কৃষ্ণ দাসদাসীর বাণিজ্যে অনুমতি পান, অনুমতি ক্রমে ক্রমে অনেককেই দেওয়া হয়। পর্ত্তুগালের ন্যায় স্পেনেও দাস্ ব্যবসায়ের পথ রাজবিধি দ্বারা মুক্ত হয়। স্পেন নিজেও যত ব্যবসায়ীকে দাসদাসী যোগাইবার ভার লন। আফরিকায় যে, স্পেনেরও তখন আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, দাসদাসী যোগাইবার পক্ষেও তাহার সুতরাং সুবিধা ছিল। বিলাতের ব্রিষ্টল প্রথমে আরম্ভ করিয়া বিলাতী দাস-বাণিজ্য বরাবরই এক প্রকার এক চেটিয়া করিয়া রাখেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিষ্টলেরই এক চেটিয়া বজায় থাকে, তাহার পর লিবারপুল আসরে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৩০ অব্দ হইতে লিবারপুলের জাহাজেই দাস-মালের অধিক রপ্তানী হইতে থাকে।

## দাস ব্যবসায়ে নিষ্ঠুরতা।

প্রথম প্রথম নিষ্ঠুরতার এক শেষ হইতে লাগিল। লোকে গোমেষাদিকেও যে কষ্ট দেয় না, দাস ব্যবসায়ীরা —বিলাতের দাস ব্যবসায়ীরাও দাস দাসীকে সে কষ্ট দিতে লাগিলেন, জাহাজ পূরিয়া দাস দাসী পাঠাইতে লাগিলেন, স্থানাভাবে—খাদ্যাভাবে—রোগে—শত শত দাস দাসীকে

জাহাজেই প্রাণ দিতে হইতে লাগিল, অনেকে রুগ্ন ভগ্ন হইয়া আমেরিকায় পৌছিতে লাগিল, সেখানকার শ্বেত-পুরুষেরা নিষ্ঠুরতার অবতার ছিলেন। রুগ্ন ভগ্ন দাস দাসী-দিগকে প্রায়ই অপঘাতে মরিতে হইত, আর সুস্থ সবল-দিগকেও আবাদ ও খনির নিষ্ঠুরতায় এবং অতিশ্রমে অল্পদিনেই জীবন লীলার শেষ করিতে হইত।

## বিলাতে বাধা।

বিলাতের গৌরব, সেখানে মহাশয় লোক চিরদিনই বিরাজমান। ইংলণ্ডের যত মার্কিণ রাজ্যেই দাস রক্ষার আসন বহাল হইল, দাস রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র আদালত প্রতি-ষ্ঠিত হইল, ইংলণ্ডের দেখাদেখি ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের রাজপুরুষেরাও দাস রক্ষায় মন দিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল কুত্রাপি হয় নাই, প্রভুদের হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব না হইলে, কেবল আইন আদালতে, দাস রক্ষা হয় না। আমরাও ত দেখিয়াছি, করুণাময় মহাশয় নীলকর-দিগের হস্তে রায়েত জনের কোন কালে পীড়ন হইত না। এখনও আসাম কাছাড়ের করুণাময় চা-কর সাহেবদিগের হস্তে কুলি পীড়ন হয় না। যেথানে প্রভুর নিষ্ঠুরতা, সেই খানেই দাস দাসীর পীড়ন।

যাহাই হউক, ইংলণ্ডের রাজবিধানে কিঞ্চিৎ ফল ফলিল। পূর্ব্বে দাস দাসী—নর নারী দুই জনকেই, সামান্য অপরাধেও, প্রভু হস্তের নিদারুণ বেত্রাঘাতে জর জর হইতে হইত। ইংলণ্ডের রাজবিধানে দাসীর বেত্রদণ্ড রহিত হইয়া গেল। প্রকাশ্যভাবে তখন আর কোন প্রভুরই বেত্রদণ্ডযোগে দাসী পীড়ন করিবার অধিকার রহিল না। গুপ্ত পীড়ন নানারূপে রহিল বটে, কিন্তু ব্যক্ত পীড়ন সংযত হওয়ায়, পীড়নও মোটের উপর কিঞ্চিৎ কমিল। ইংল-ণ্ডের রাজবিধানে দাসীদিগের অন্যান্য কষ্ট কতক কতক দূর হইল। দাসদিগেরও না হইল এরূপ নহে।

## জজ ম্যান্‌সফীল্‌ড।

ইংলণ্ডের সর্ব্বজন প্রশংসিত বিচারপতি ম্যান্‌সফীল্ড বাহাদুরও ঐ সময়েই একটা বিচারে সিদ্ধান্ত করিয়া-ছিলেন ;—

"বিলাত স্বাধীনতার চিরন্তন লীলাক্ষেত্র। এখানে ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ সকলেই—স্বদেশী বিদেশী যত লোকেই—স্বাধীন, যে দাস দাসী কোনরূপে বিলাতে আসিয়া পদার্পণ করিবে, সেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিবে।"

জজ ম্যান্‌সফীল্ডের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য জজেরও শিরোধার্য্য হইল। নিজ বিলাতের কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ দাসীরা স্বাধীন হইল, দাস দাসীও ত বিলাতে কম ছিল না! ১৭৬৪ অব্দে নিজ লণ্ডনেই ত কত হাজার দাস দাসী অবস্থিতি করিতেছিল, লণ্ডনেও দাস দাসীর রীতিমত ব্যবসায় চলিত। সংবাদপত্রে "কৃষ্ণ পুরুষ, কৃষ্ণ নারী, কৃষ্ণ বালক, কৃষ্ণ বালিকার জন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইত।" পলায়িত দাস দাসীদিগের অনুসন্ধান ও পুনরাবন্ধনের জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষিত হইত। ১৭৭১ অব্দে বর্ম্মিংহাম গেজেট পত্রেই ত দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। জজ ম্যান্‌স্‌ফীল্ডের সিদ্ধান্ত বাহির হয় ১৭৭২ অব্দে, সেই অবধি দাস দাসীরা বিলাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, কিন্তু বিলাতী জজের নজীর বিলাতেই গ্রাহ্য হইয়াছিল, বিলাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে করিতে যাই কোন দাস বা দাসী বিলাত ছাড়িয়া অন্য দেশে আসিয়া-ছিল, অমনই আবার দারুণ দাস্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, অন্য রাজ্যে ত আর বিলাতের নজীর খাটিত না। বিলা-তেরই অন্য দেশীয় রাজ্যে বিলাতী নজীর গ্রাহ্য হইত না।

## দাস ব্যবসায়ে বাদ প্রতিবাদ।

বিলাতের পাদরি সম্প্রদায়কে প্রশংসা করিতে হয়। ধনশালা ও বাণিজ্য মন্দিরে দাস ব্যবসায়ের অনুরাগ থাকিলেও, বিলাতের ধর্ম্মশালা ও ভজনা মন্দিরে দাস ব্যব-সায়ের বরাবরই বিরাগই দেখা গিয়াছিল, পাদরি মিশনরি মহাশয়েরা দাস ব্যবসায়ের বরাবরই প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। ১৭৮৭ অব্দে লণ্ডনে যে, দাস ব্যবসায়নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতেও পাদরি মিশনরি-দিগেরই প্রাধান্য ছিল।

দাস ব্যবসায় রহিত হওয়ায় যাঁহারা জগতের প্রশংসা ভাজন হইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে টমাস ক্লার্কসন্ এবং সার্প সর্ব্ব প্রথমেই ঐ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। এই সভা-সূত্রেই উইলিয়ম উইলবার ফোর্স এবং জ্যাকেরিয়া মেক্‌লে

দাস ব্যবসায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্যই বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখান ; পার্লেমেণ্টে যে, উইলবারফোর্স ই দাস ব্যবসায়ের প্রধান প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, তাহা সকল পাঠকেরই বিদিত আছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কোয়েকর সম্প্রদায় স্বতপরত অর্থে সামর্থ্যে দাস ব্যবসায়ে যেরূপ প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন, অন্য কোন সম্প্রদায়ই সেরূপ প্রতিকূলতা করিতে পারেন নাই, কিন্তু কিছু কিছু প্রতিকূলতা অনেকেই করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত লোকেও আবার দাস ব্যবসায়ের ঘোরতর অনুকূলতাও করিয়াছিলেন। গুরু জন্সন্‌কে প্রতিকূল দেখিয়া অনুগত ভক্ত শিষ্য শ্রীমান বসোয়েল লিখিয়াছিলেন :—

"দাস দাসী জগতে আছে চিরদিন, ভগবান নিজে এই দলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা পরমেশ্বরের অনুমোদিত, যাহা চিরকাল মানব সমাজের অনুমোদিত, তাহা রহিত করিয়া, যত দাস-প্রভুকে বঞ্চিত করা নিতান্তই দস্যু তস্করের কার্য্য। দাস প্রথা বর্ত্তমান থাকায় আফরিকার কত উপকারই না হইতেছে। যে সকল নিগ্রো নর নারী দাস দাসী হইয়া সুখের রাজ্য আমেরিকায় গিয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদিগকে যে অসভ্য বর্ব্বর প্রতিবেশীদিগের হস্তে প্রাণ দিতে হইতেছে না, ইহা কি অল্প সৌভাগ্য! আফরিকায় নিগ্রোদিগকে এই সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিলে—অর্থাৎ দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিলে —কিরূপ অধর্ম্ম হইবে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।"

এরূপ বসোয়েলও বিলাতে অনেক ছিলেন! চা-বাগিচার কুলি ব্যবসায় উপলক্ষে, যাঁহারা সেই বসোয়েলের শিষ্যত্ব করেন, এরূপ অবতার ভারতে এখনও আছেন!

## প্রতিকারের সূত্রপাত।

দাস ব্যবসায়ের প্রতিকূলতা প্রবল হইতেছে দেখিয়া ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ ১৭৮৮ অব্দে এক কমিটির প্রতিষ্ঠা করেন, দাস ব্যবসায়ের অবস্থাদি বিষয়ে আলোচনা অনুসন্ধান করিবার ভার ঐ কমিটির হস্তে ন্যস্ত হয়, আর ঐ সময়েই দাসবাহী জাহাজের উপর দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যবসায়ীরা জাহাজ পুরিয়া দাস দাসী লইয়া যাইতেন, জাহাজে দাস দাসীদিগকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। নূতন আইনে দাস দাসীর বোঝা নির্দ্দিষ্ট হয়। "এত টনের জাহাজ এত দাস দাসীর অধিক লইয়া যাইতে পারিবে না।" এইরূপই ব্যবস্থা হয়।

১৭৯১ অব্দে উইলবারফোর্স পার্লেমেণ্টে দাস ব্যবসায় রহিত করিবার আইন পেশ করেন। পাণ্ডুলিপিতে ব্যবস্থা হয় :—"আমেরিকায় কোন ব্রিটিশরাজ্যে আর-কেহই দাস দাসী লইয়া যাইতে পারিবে না।" এ পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য হয়,পর বৎসর ১৭৯২ অব্দে উইলবারফোর্স, মন্ত্রী প্রবর পিটের মত লইয়া, আর এক পাণ্ডুলিপি দাখিল করেন। তাহাতে "ক্রমে ক্রমে" দাস ব্যবসায় রহিত করিবার ব বস্থা থাকে, এ পাণ্ডুলিপি পাস হইয়া আইনে পরিণত হয়। দাস ব্যবসায় রহিত করিবার ব্যবস্থার বিলাতে এইরূপেই সূত্রপাত হয়।

## ফরাসীর প্রতিবিধান।

ইংলণ্ডের পাদরি মিশনরিদিগের চেষ্টায় যে ফল বিলম্বে ঘটে, অখৃষ্টান রুশোর শিষ্যদিগের অখৃষ্টান সভায় সেই ফল শীঘ্র সহজেই ফলিয়া উঠে। ১৭৯৪ অব্দের অখৃষ্টান ফরাসি সভার এক অধিবেশনে ব্যবস্থা হয়, "ফরাসিরাজ্যে —ফরাসির কোন উপনিবেশেও দাসত্ব থাকিবে না, যে কোন ফরাসিরাজ্যের দাস দাসীই (১৭৯৪ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হইতে) স্বাধীন ফরাসীর মত স্বাধীনতা ভোগ করিবে।"

## দাস ব্যবসায়ে নিষেধ।

বিলাতের রাজা ও রাজমন্ত্রীরা আইনে দাস ব্যবসায় সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সময়েই ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি ইংরেজের হস্তগত হওয়ায়, সেখানকার দাস সরবরাহের জন্য, বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীদিগের দাস ব্যবসায় বাড়িয়া উঠিল, সুতরাং ১৮০৫ অব্দে বিলাতের পার্লেমেণ্টে ব্যবস্থা হইল।

"বিজিত নবাধিকৃত উপনিবেশ রাজ্যেও দাস ব্যবসায় অবাধে চলিবে না।"

পর বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে, "বিলাতের কোন ব্যক্তিই নূতন পুরাতন স্বদেশী বিদেশী

কোন রাজ্যেই দাস দাসীর সরবরাহ করিতে পাইবে না।” তৎপর বৎসর নিষেধের বেড়া আরও একটু বিস্তৃত হইল। ১৮০৮ অব্দে বিলাতী পার্লেমেন্টের এক আইনে যত বৃটিশ রাজ্যের দাস ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। কিন্তু বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীদিগের ধনলোভ ত রহিত হইল না। সুতরাং এইবার শঠতার ধুম লাগিল।

## দাস ব্যবসায়ে শঠতা।

ফরাসী আইনে ফরাসী রাজ্যসমূহের দাস ব্যবসায় রহিত হইল। বৃটিশ আইনে বৃটিশ রাজ্যসমূহের দাস ব্যবসায় রহিত হইল, কিন্তু স্পেন পর্ত্তুগালের দাস ব্যবসায় ত বজায় থাকিল। বিলাতের ব্যবসায়ীরাও স্পেন ও পর্ত্তুগালের জাহাজে করিয়া, অথবা আপনাদের জাহাজে স্পেন পর্ত্তুগালের পতাকা উড়াইয়া দাস ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। বিলাতের লোকেই আমেরিকার স্পেনীয় ও পর্ত্তুগাল অধিকারে দাস দাসী যোগাইতে লাগিলেন। সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে জাহাজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীরাও ধরা পড়িবার ভয়ে নিষ্ঠুরতার এক শেষ করিতে লাগিলেন!

## ধনলোভে রাক্ষস।

ইতিহাসে—বিলাতের ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে—প্রকাশ “যখনই কোন বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীর জাহাজ ধরা পড়িবার উপক্রম করিত, তখনই বৃটিশ দাসপতিরা যত দাস দাসীকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নিষ্কৃতি-লাভের উপায় করিতেন। শত শত কেন হাজার হাজার কৃষ্ণ নর নারীকে এইরূপে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে!”

শুনিলেও হৃৎকম্পে অবসন্ন হইতে হয়; বৃটিশ দাস-পতিদিগের পৈশাচিক প্রকৃতির কথা মনে করিয়া হতচৈতন্য হইতে হয়। যে দেশের উইলবারফোর্শ ক্লার্কসন মেকলে শার্প প্রভৃতি দাস দাসীর কষ্ট দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন, সেই দেশের ধনপতিরাই শত শত দাস দাসীকে বিনা অপরাধে ডুবাইয়া মারিতেন; লোকে ইঁদুর ছুঁচাকেও যেরূপে মারিতে পারে না, নিরীহ নর নারীকে সেইরূপে মারিতেন! মনে হয়, এক দেশেই স্বর্গ নরক, যেখানে দেব সেখানেই দানব।

## দাসমুক্তির চেষ্টা।

বিলাতের পার্লেমেন্টে দাসত্ব নিষেধের আইন ক্রমেই কঠোর হইতে লাগিল। অর্থদণ্ড কারাদণ্ডে পরিণত হইল, কারাদণ্ড নির্ব্বাসন দণ্ডে পরিণত হইল। একবার প্রাণদণ্ডেরও প্রস্তাব হইল, কিন্তু নির্ব্বাসন দণ্ডই বাহাল থাকিল। “বিলাতের যে ব্যক্তি নিষেধ না মানিয়া দাস ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, সেই নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে” এইরূপ বিধানে সুফল ফলিতে লাগিল, ওদিকে বিলাতের দাসত্বনিবারণী সভা অর্থে সামর্থ্যেও দাসমুক্তির নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। দাসত্ব নিষেধের পুস্তক পত্রিকায় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। দাসত্বনিষেধের বক্তৃতায় জগৎ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিলাতের দাসত্বনিবারণী সভা, উত্তর পশ্চিম আফরিকায় সীরালীয়োঁ প্রদেশে মুক্ত দাস দাসীদিগর জন্য একটা উপনিবেশ স্থাপিত করিলেন। শত শত মুক্ত দাস দাসী সেইখানে বসবাস করিতে পাইল। মার্কিন লাইবিরীয়ার পথ সীরালিয়োঁর জন্য প্রশস্ত হইল। দুই প্রদেশেই এখন মুক্ত দাসবংশজে পূর্ণ। ইংরেজের সীরালিয়োঁ ইংরেজের অধীন; মার্কিনের লাইবিরীয়া এখন সম্পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন। কিন্তু সে কথা শেষে কহিব বলিয়াই এত কথা কহিতেছি, লাইবেরিয়ার কথা কহিয়াই আমরা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিব।

## সর্ব্বত্র।

বিলাতের ন্যায় ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যও দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিবার আইন বাহাল করিলেন। ইংলণ্ডে প্রথম আইন বাহাল হইবার পরই মার্কিন গবর্ণ-মেণ্টও ১৮০৮ অব্দে আইনের জোরে দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিলেন। ক্রমে আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যেও দাস ব্যবসায় রহিত হইল। ইউরোপের সুইডেন, হলন্দ, ডেন্মার্ক প্রভৃতিও ব্যবসায় নিষেধ করিলেন। স্পেন ও পর্ত্তুগাল সর্ব্বশেষে মহত্ব দেখাইলেন। ক্রমে ১৮৪৫ অব্দের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার সকলেই দাস ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দাস ব্যবসায় গোপনে চলিতে লাগিল দেখিয়া, সকলেই মহাসাগরে পুলীশ-পোত রাখিয়া দিলেন। দাসপোতের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দাসপোতে ও পুলীশপোতে যুদ্ধেরও অভিনয়

চলিতে লাগিল। ফলতঃ কিন্তু ১৮৪৫ অব্দের পর প্রকাশ্য দাস ব্যবসায় রহিতই হইয়া গেল। কিন্তু দাসত্ব রহিত হইল না। আমেরিকার পুরাতন দাস দাসী ও দাসবংশজদিগকে ১৮৪৫ অব্দের পরও দাস্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হইল। দাস ব্যবসায় রহিত হওয়ায় দাস সরবরাহ রহিত হইয়া গেল। উপস্থিত দাস দাসীদিগের দর ও আদর বাড়িল। কিন্তু পূর্ণমুক্তির এখনও আবশ্যকতা রহিল। এইবার কহিব মুক্তির কথা।

## এইবার মুক্তি।

দাস ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টা প্রথমে ইংলণ্ডে হইয়াছিল, ইংলণ্ডের পথেই আর সকলে পথিক হইয়াছিলেন। দাস মুক্তির চেষ্টাও প্রথমে ইংলণ্ডে হয়, অনন্তর আর সকলে অনুসরণ করেন। ইংলণ্ডের গৌরব চিরবিরাজমান থাকিবে! যে সময়ে দাস-ব্যবসায় দমনের চূড়ান্ত অনুষ্ঠান হইতেছিল, ইংলণ্ডে সেই সময়েই দাস মুক্তিরও চেষ্টা চলিতেছিল। দাস-ব্যবসায়বারণী সমিতি সভার সভ্যেরাই দাস মুক্তিরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ অব্দে বিলাতের উপনিবেশমন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বি উপনিবেসের দাস দাসীদিগকে মুক্তি দিয়া স্বাধীন করিবার জন্য এক আইনের প্রণয়ন করেন। পাণ্ডুলিপি পাস হইয়া ঐ আইন ২৮শে আগষ্ট বাহাল হয়। এই আইনই যত বৃটিশ উপনিবেশের যত দাস দাসী ও দাসবংশজকেই মুক্তি দেয়। কিন্তু বিলাতের দাসাধিকারী শ্বেতপুরুষদিগকেও তুষ্ট করিতে হয়। তাঁহারা দাস সম্পত্তির জন্য প্রভূত খেসারত পান। এদতর্থে বিলাতের গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয় কম নহে—৩০ কোটি টাকা! দুই এক মহাত্মা ছাড়া আর যত বৃটিশ দাস প্রভুও খেসারত লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৪ অব্দের ১লা আগষ্ট যত বৃটিশ উপনিবেশেই দাসত্বমুক্তি হইল বটে, কিন্তু আপনাদের কাজ কর্ম্মের জন্য শ্বেত প্রভুরা কিছুদিন মুক্ত দাস দাসীদিগকেও ভৃত্যত্ব ব্যপদেশে আপনাদের অধিকারে রাখিয়া দিবার অধিকার পাইলেন। এই ভৃত্যত্বেও মুক্তি পক্ষপাতী মহাশয়েরা ঘোর আপত্তি করিতে বাধ্য হইলেন; সুতরাং ঐ ভৃত্যত্বও ঘুচিল ১৮৩৮ অব্দে। ফরাসী উপনিবেশের দাসমুক্তি হইল ১৮৪৮ অব্দে; দক্ষিণ আমেরিকার দাসমুক্তি প্রায় ঐ সময়েই হইল। ওলন্দাজদিগের দাসমুক্তি হইল ১৮৬৩ অব্দে, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজীলের দাসদিগকে অনেকদিন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়াছে ১৮৮৮ অব্দে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের দাসমুক্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহা পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নহে। দাসমুক্তির জন্য যে দাক্ষিণাত্যে আর উত্তরাত্যে ঘোর যুদ্ধ হয়; সেই গৃহযুদ্ধে যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ছয় লক্ষ লোকের অপমৃত্যু হয় এবং তিন হাজার কোটি টাকা (৩০০০,০০০০০০০ টাকা) খরচ হইয়া যায়, তাহাও পাঠকের অবিদিত নহে। উত্তরাত্য বা মার্কিন আর্য্যাবর্ত্তের দাসমুক্তি পূর্ব্বেই হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যেরও যুদ্ধে হইল। যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে ১৮৬০ অব্দে দাক্ষিণাত্যের দাসবংশে ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ লোক! এখন সকলেই মুক্ত।

## দাসত্বের ফল।

আফরিকার দাস ব্যবসায়ে প্রথমে ইউরোপের প্রায় সকলেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান আরবেরাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত ছিল। আফরিকার আরবেরাই চারিদিকে দাস দাসীর সংগ্রহ করিত। ইহাদের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া রাক্ষস পিশাচেরাও লজ্জা পাইয়াছে। আফরিকার নরমাংসভুক্ রাক্ষসেরাও ত ইহাদিগের হস্তে পরিত্রাণ পায় নাই। আরবের খোক্কসেরা আফরিকার রাক্ষস রাক্ষসীদিগকেও দাস্য বন্ধনে আবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, নরাধমদিগের অসাধ্য কার্য্য ছিল না। সূদন, নীলনদের উপত্যকা, পূর্ব্ব আফরিকা এবং সোমালি প্রদেশ দাস সংগ্রহের জন্য জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এশিয়ার দাস পোষণ এবং দাস ব্যবসায়ও সংযত হইয়াছে। কিন্তু এশিয়ায় দাসপোষণ একেবারে এখনও রহিত হয় নাই। গুপ্ত দাস ব্যবসায় এখনও চলিতেছে। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতির রণপোত চারিদিকে ঘুরিতেছে। স্থলেও পুলীস পল্টন দাস সংগ্রহে ও দাসত্ব ব্যবসায়ে বাধা দিতেছে, দাস ব্যবসায়ীদিগকে, ধরা পড়িলে যথেষ্ট কষ্টভোগ করিতে হয়। তথাপি ব্যবসায় এখনও একেবারে রহিত হয় নাই। পূর্ব্বতন নিষ্ঠুরতা পৈশাচিকতার তিরোভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন প্রথা এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই।

## ব্যবস্থায় অবস্থা।

আমেরিকায় মুক্ত দাস-বংশের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু ব্যবস্থার মত অবস্থা এখনও হয় নাই। এখনও অনেক প্রদেশে দাসবংশজ ও দাসবংশজাদিগের প্রতি শ্বেত পুরুষ ও শ্বেত মহিলাদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও তাহা অনেক প্রদেশের দাসবংশজের রাজনীতি ও সামাজিক সকল অধিকারেই ব্যক্ত আছে। এখনও অনেক স্থানে অনেক সময়েই দাস-বংশের নরনারীদিগকে শ্বেত হস্তে ভয়ঙ্কর নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, এখনও কোন কোন স্থানে আইন আদালতেও দাসবংশজেরা সুবিচারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। উত্তর প্রদেশের দাসবন্ধুরা বহুকাল যাবৎ দাসবংশের প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রভু ও প্রভুবংশের মহাশয়েরা এখনও দাসবংশের নরনারী-দিগকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এ ভাবের ব্যতিক্রম হইতে অনেক দিন লাগিবে। আইনে মানুষের মন সংযত হয় না, কার্য্য সংযত হইতে পারে।

উদীচ্য প্রদেশের দাসবন্ধুরা অনেক দিন পূর্ব্বেই দাস-বংশজদিগকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। আপনাদের সকল অধিকারেই ইঁহারা দাসবংশজদিগকে অধিকার দিতেছেন। ইঁহাদেরই চেষ্টায় উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায়, ইংরেজাধিকৃত সীরালিয়োঁ প্রদেশের পার্শ্বে, মুক্তদাসদিগের স্বতন্ত্র স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাইবিরীয়া রাজ্যের কথা কহিবার জন্যই আমাদিগকে দাস-কথার অলোচনা করিতে হইল। অবস্থায় ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থায় অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমাদিগকে প্রবন্ধ একটু দীর্ঘ করিতে হইল। কিন্তু লাইবিরিয়ার কথা এইবার কহিব।

## আমেরিকায় দাসরাজ্য।

অনেক সাধু অনুষ্ঠানের ন্যায় দাসমুক্তির সাধু অনুষ্ঠানেও যে, ইংলণ্ডই সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; ইংলণ্ডের মহাপুরুষেরাই যে, সর্ব্বাগ্রে এই সাধু অনুষ্ঠানের সিদ্ধিপক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক পুর্ব্বেই বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডের "এন্টিস্লেভারি" বা দাসত্ববিরোধিনী সভাই যে, ১৭৮৭ অব্দে, পশ্চিমোত্তর আফরিকার সীরা-লিয়োঁ প্রদেশে মুক্ত দাস-দাসীদিগকে উপনিবিষ্ট করিয়া সুখ স্বাধীনতার ভোগে সমর্থ করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মন্ত্রীরা উপ-নিবেশের দাস-ব্যবসায়ে বাধা দিবার জন্য আইন করেন, ইংরেজের স্বজাতি স্ববংশ মার্কিণও ১৮০৮ অব্দেই ইউনাই-টেড ষ্টেট্স্ রাজ্যে ঐরূপ আইন বাহাল করেন। কিন্তু দাস-ব্যবসায় রহিত হইলেও যে, দাস-মুক্তি হয় নাই; দাস-মুক্তি হয় নাই বলিয়াই যে, গুপ্ত ব্যক্ত দাস-বাণিজ্য ১৮৮৮ পর্য্যন্ত বেশ চলিয়াছিল; তাহাও পাঠক না দেখিয়াছেন, এরূপ নহে। দাসবন্ধুদিগকে সুতরাং নানা উপায়ে দাস-মুক্তির চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, অর্থে সামর্থ্যে দাস রক্ষার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। দাস দাসীর মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সকল পণ্য দ্রব্যের ন্যায় এই দাস-পণ্যেরও দর চড়িত পড়িত। দর যখন পড়িত, তখন দাস বন্ধুরা মূল্য দিয়া অনেক দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া দিতেন। কোন কোন দাস দাসী স্বীয় মূল্য আপনারা দিয়াও মুক্তিলাভ করিত। অন্যান্য উপায়েও অনেক দাস দাসী মুক্তিলাভ করিত। কিন্তু যে দেশে দাস পোষণ রহিত হয় নাই, সে দেশে গিয়া পড়িলে, আবার অনেককেই পুনর্দাসভূত হইতে হইত। এক জনের দাসকে আশ্রয় দিলে, অন্য জনকে বিপন্ন হইতে হইত। মার্কিণ রাজ্যে এরূপ দুর্ব্যবসা অনেক দিন ছিল। তথাপি কিন্তু মহাশয় দাসবন্ধুরা দাসমুক্তিপক্ষে কুণ্ঠিত হইতেন না। মুক্ত দাস দাসীদিগকে আফরিকায় আশ্রয় দিবার জন্যই অনেক দাস-বন্ধু ব্যস্ত হইয়াছিলেন; ১৭৮৭ অব্দে ইংলণ্ডের দাসত্ব-নিবারণী সভা সীরালিয়োঁ প্রদেশে দাসোপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, মার্কিণও সেইরূপ আয়োজনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিণের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দেই পশ্চিমোত্তর আফরিকা মহাদেশের সামোপকূলে সীরালিয়োঁরই সন্নিহিত স্থানে মার্কিণের চেষ্টায় মুক্ত দাসের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই রাজ্যই এখন "লাইবি-রীয়া" রূপে নিজের সার্থক নামের সর্ব্বত্র ঘোষণা করি-তেছে। সুন্দর সুশাসিত রাজ্যের একটু পরিচয় দিয়া দেখাইব, ব্যবস্থার গুণে অবস্থা ভাল হয়। দেখাইব, পরাজিত বা অধিকৃত রাজ্যের সভ্য মানবের ত কথাই নাই; ব্যবস্থার গুণে, অসভ্য বর্ব্বর কাফরি ক্রীত-দাসেরাও

সভ্য হইয়া, আপনাদের রাজ্য আপনারা চালাইতে পারে, সুশাসনে সভ্য ইউরোপীয় এবং মার্কিণের সহিতও সমকক্ষতা করিতে পারে।

## লাইবিরীয়া।

পশ্চিমোত্তর আফরিকার সমুদ্রকূলবর্ত্তী সাম্যোপকূলের লাইবিরীয়া রাজ্য আয়তনে বিশাল নহে, তাহার পরিমাণ এখন ১৪ হাজার ৫০০বর্গ মাইল মাত্র। ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যে লোক ছিল—তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৫ লক্ষ, এখন ১৬ লক্ষের কম নহে। ১৮৯৯ অব্দে দেখা গিয়াছিল, সভ্য মুক্ত দাসবংশজ কৃষ্ণ নিগ্রো ১৮ হাজার মাত্র, অবশিষ্ট আফরিকারই অধিবাসী। কিন্তু এখন সকলেই স্বাধীন। রাজ্যের রাজধানী মনরোভিয়া, মার্কিণের কল্যাণেই এই সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মার্কিণরাজ্যের পঞ্চম প্রেসিডেণ্ট জেমস্ মনরো ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণ সাধারণ তন্ত্রে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার উৎসাহ এবং সাহায্যে মার্কিণ দাসবন্ধুরা এই লাইবিরীয়া বা মুক্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন লাইবিরীয়ার রাজধানীর নাম হইয়াছিল, "মনরোভিয়া" বা "মনরোনগরী"। সেই সার্থক নাম এখনও বিরাজমান। এখন তাহার সর্ব্বত্র মান।

মুক্তদাসরাজ্য লাইবিরীয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২২ অব্দে। ২৫ বৎসর মার্কিণের তত্ত্বাবধানে ও কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া ১৮৪৭ অব্দে রীতিমত স্বাধীনতা লাভ করিয়া, স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৪৮ অব্দেই দাসবন্ধু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই মুক্তদাস রাজ্যকে প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া, এই রাজ্যের সহিত বন্ধুভাবেই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আর আর স্বাধীন রাজ্যের যেরূপ মান-সম্ভ্রম, ইংলণ্ডে এই দাস-রাজ্যেরও সেইরূপ মান-সম্ভ্রমই হইতে থাকে। ইংরেজের মাহাত্ম্য মার্কিণের অপেক্ষাও অধিক। পরার্থপর দয়াল মার্কিণদিগের চেষ্টায় এই মুক্ত-দাস-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় সত্য, কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহার স্বাধীনতা গ্রাহ্য করিতে সাহসী হন না, ১৮২২ অব্দে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৮ অব্দে ইহাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মানিয়া লন; মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ১৮৬২ অব্দের পূর্ব্বে লাইবিরীয়াকে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তাই বলিতেছি, ইংরাজেরই মাহাত্ম্য অধিক।

মুক্ত মার্কিণ দাসের রাজ্যে—মার্কিণ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মার্কিণ শাসন-প্রণালীর মতই শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে। এটীও আফরিকায় একটী ক্ষুদ্র ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্। ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের সমস্তই ক্ষুদ্র আকারের। মার্কিণের ইউনাইটেড্ ষ্টেট স্ কংগ্রেস বা মহাসভা আছে, আফরিকায় লাইবিরীয়ারও কংগ্রেস আছে; কিন্তু মার্কিণ রাজ্যে ৮ কোটি লোকের বসবাস বলিয়া, সেখানকার মহাসভার আছেন ৪৪৭ জন সভ্য, আর ক্ষুদ্র লাইবিরীয়ায় ১৬ লক্ষ লোকেরও বসবাস নাই, তাহারও ৮ হাজার মাত্র সভ্য ভব্য, তাই এখানকার কংগ্রেসে ২১টী মাত্র সভ্য; ৮ কোটিতে ৪৪৭ হইলে, ১৬ লক্ষে ২১ কম হইল না।

মার্কিণ মহাসভা দুই ভাগে বিভক্ত, সেনেট বা উচ্চ-সভায় ৯০ জন সভ্য, হাউস অব রেপ্রেসেণ্টেটিভ বা প্রতিনিধি সভায় ৩৫৭ জন সভ্য। লাইবিরীয়ার সেনেটে ৮ জন সভ্য, প্রতিনিধিসভায় ১৩ জন। মার্কিণ রাজ্যের ন্যায় এ রাজ্যেও প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তা। দুই রাজ্যেরই প্রেসিডেণ্টকে নির্ব্বাচিত হইতে হয়, কিন্তু মার্কিণ রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ৪ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন, লাইবিরীয়ার প্রেসিডেণ্ট ২ বৎসর অন্তর। মার্কিণরাজ্যে ১৭৮৭ অব্দের প্রথাই বাহাল আছে, লাইবিরীয়ায় ১৮৪৭ অব্দে ব্যবস্থা হইয়াছে। মার্কিণ রাজ্যের অনেকেই এখন স্বরাজ্যেও দুই বৎসর অন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে চাহেন, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সেনেটে সভ্য নির্ব্বাচন হয় ৬ বৎসর অন্তর, লাইবিরীয়ায় ৪ বৎসর অন্তর। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্ব্বাচন হয় ২ বৎসর অন্তর। লাইবিরীয়ায়ও দুই বৎসর অন্তর।

লাইবিরীয়ায় বিদ্যা বিস্তার হইতেছে, আইনের প্রণয়ন ও প্রচলন হইতেছে, আদালতে ভাল ভাল বিচারপতিরাই সুবিচার করিতেছেন, পুলিশ শান্তি রক্ষা করিতেছেন, কল স্থাপন এবং রাজস্বসংগ্রহ রীতিমতই হইতেছে। ফলতঃ সভ্য রাজ্যে যাহা হয়, এখানে তাহাই হইতেছে। পার্শ্বেই ইংরেজ ফরাসীর রাজত্ব, ইংরেজ ফরাসীর সহিত সন্ধি চুক্তি আছে, মধ্যে মধ্যে সন্ধিসর্ত্তের পোষণ পরিবর্ত্তন হইতেছে।

ইউরোপ আমেরিকার যত মহাসভায় যেরূপ বক্তৃতা

এবং তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে, লাইবিরীয়ার মহাসভায়ও সেইরূপ হইতেছে। অন্যত্র উকিল কৌঁসুলিরা যেরূপ আদালতে আইনের তর্ক করেন, এখানকার উকিল কৌঁসুলিরাও সেইরূপ করিতেছেন। সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞানাদির অন্যত্র যেরূপ চর্চ্চা হয়। এখানেও সেইরূপ হইতেছে।

ক্ষুদ্র নূতন রাজ্যের রাজস্ব অল্প; ১৮৯৮ অব্দে রাজ্যের আয় হইয়াছিল ৬ লক্ষ টাকা মাত্র, ব্যয়ও হইয়াছিল ৬ লক্ষ টাকা। ইংলণ্ডের কাছে লাইবিরীয়ায় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৪ অব্দে ১৫ লক্ষ টাকা দেনা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত এক পয়সা সুদও দিতে পারে নাই, সুদে আসলে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছে। রবারের বাণিজ্যে আয়-বৃদ্ধি হইতেছে, এইবার সুবিধা হইবে। রাজ্যের আমদানী-বাণিজ্য ৪০ লক্ষ টাকার অধিক নহে, রপ্তানী ৩৪।৩৫ লক্ষ টাকার; নূতন ক্ষুদ্র দাস-রাজ্যের পক্ষে ইহা নিতান্ত মন্দ নহে।

রাজ্যের আয় অল্প বলিয়া প্রেসিডেণ্টও বেতন লন অল্প। তাহার এক জন সেক্রেটারি অব ষ্টেট বা রাজ্য সম্বন্ধীয় মন্ত্রী আছেন, স্বরাজ্যের এক জন স্বতন্ত্র মন্ত্রী আছেন, এক জন রাজস্ব-মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ আছেন, পলটন ও রণপোতের একজন মন্ত্রী আছেন, একজন এটর্ণি জেনারল বা আইন-মন্ত্রী আছেন, ডাক-বিভাগের একজন পোষ্টমাষ্টার জেনেরল আছেন। মার্কিণ রাজ্যের ন্যায় লাইবিরীয়া রাজ্যেও প্রেসিডেণ্টের একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আছেন। রাজ্যে সমর-সচিব আছেন, কিন্তু শান্ত শিষ্ট রাজ্যে তাঁহার কাজ কর্ম্ম নাই। রাজ্যের যত সমর্থ পুরুষই যুদ্ধের সময়ে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য। দুই খানি রণপোত আছে; বৈদেশিক বাণিজ্যে যাহাতে কেহ মাশুল ফাকি দিতে না পারেন, তাহার দিকেই রণপোতযুগণের প্রধান দৃষ্টি।

লাইবিরীয়া রাজ্যে ইংলণ্ডের একজন কন্‌সল্ বা বাণিজ্য-দূত ও একজন সহকারী কন্‌সল্ আছে। লাইবিরীয়ার বাণিজ্য-দূতও বিলাতের লণ্ডন, বকিংহাম, কার্ডিফ, গ্লাস্‌গো, হল, লিভারপুল, মেঞ্চেষ্টার, নিউকাসেল, প্লিমথ, পোর্টস্‌মথ, সাউথাম্‌টন এবং সোয়ান্‌সী নগরে বিরাজ করিতেছেন। একজন প্রধান কন্‌সলই সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।

ফলতঃ সভ্য বা স্বাধীন রাজ্যে যাহা চলিতেছে, লাইবিরীয়া রাজ্যেও তাহাই চলিতেছে। দাসবংশজ মহাপুরুষেরাই রাজ্যের সকল বিভাগে—সকল কার্য্যে—কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, প্রেসিডেণ্ট হইতে পুলিস-কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলেই কৃষ্ণদাসবংশজ!



লাইবিরিয়ার দাস-কর্ত্তা।

পাঠক এই চিত্রখানি দেখ, অনরেবল এল্‌ফ্রেড কিং প্রেসিডেণ্ট, রবার্টস্ হইতেছেন চীফ জষ্টিস্—বড় আদালতের বড় জজ; আর অনরেবল আর্থর বার্কলে ষ্টেট-সেক্রেটারি বা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। প্রেসিডেণ্ট কিন্তু জন্মিয়াছিলেন—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এক দাসীর গর্ভে, বাল্যেই লাইবিরীয়ায় আনীত হইয়াছিলেন, লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছেন। লাইবিরীয়ায় কলেজ আছে; কিন্তু শিক্ষাবিভাগের কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সেনেটে বসিয়াছিলেন, তিনি তিন বার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

চীফ জষ্টিস রবার্টস্ ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের জর্জ্জিয়া প্রদেশ হইতে, ১৫বৎসর বয়সে, ১৮৪৯ অব্দে, লাইবিরীয়ায় আসিয়াছেন, ইনিও লাইবিরীয়ার প্রতিনিধি সভায় যথেষ্ট

প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আদিম আফরিকদিগকেও স্বাধীনতার সুখে সুখী করিয়া, শেষে বড় আদালতের বড় জজ হইয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি বার্কলেও পণ্ডিত লোক।

বিদ্যা ও পদের একটা উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক চিত্রে দেখ! তিন দাসপুত্রই, নিগ্রোসুলভ বল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়াও, শ্বেত কৃষ্ণ কোঁকড়া চুলে কেমন শোভা পাইতেছেন! দেখিলে ভক্তি হয়। মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়।

১৯০১ অব্দে এই তিন মহাপুরুষই ইংলণ্ডে গিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। সীরালিয়োঁ এবং লাইবিরীয়ার সীমান্তস্থ একটা নদের বাণিজ্যাদি ঘটিত অধিকার লইয়া দুই রাজ্যে একটু গোলযোগ হইয়াছিল, বিবাদেরও সম্ভাবনা হইয়াছিল। লাইবিরীয়ার তিন প্রধান রাজপুরুষ সেই গোলযোগ মিটাইবার জন্যই বিলাতে গিয়াছিলেন, দাসীপুত্র হইয়াও তাঁহারা বৃটিশ রাজমন্ত্রীদিগের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতা রাজনীতিজ্ঞান অর্থনীতিবিদ্যা প্রভৃতি দেখিয়া, বিলাতের বড় বড় লোককেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। ব্যবস্থায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; দাসী-পুত্রও রাজ-পুত্রকে লজ্জা দিতে পারেন। স্বাধীনতা লাভ হইলে, ক্রীতদাসীর পুত্রও রাজ্য চালাইতে পারেন, অন্যে না পারিবেন কেন? কিন্তু স্বার্থপরতা এবং আত্মগরিমা মানুষকে সহজে ন্যায়পরায়ণ হইতে দেয় না। বিলাতের অনেক মহাপুরুষ আফরিকার যত কৃষ্ণমানবকেই চিরপদানত করিয়া রাখিতে চাহেন। "ফোরম" প্রভৃতি পত্রেও ইঁহারা এই অসম নীতির ঘোষণা করেন। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ মনুষ্য স্বভাবতই শ্বেত মনুষ্য অপেক্ষা হীন; শ্বেত প্রভু, কৃষ্ণ তাহার ভৃত্য। লাইবিরীয়ার ইতিহাসে কিন্তু পাঠক শিখিবেন অনেক। আমাদের দাসবৃত্তেও অনেক দেখিতে শুনিতে পাইবেন। এই প্রবন্ধ আমাদের অপাঠ্য নহে। প্রবন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রলাপ নহে; প্রবন্ধ বৃদ্ধের চাপল্য নহে। অতএব এইখানেই উপসংহার।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

# মাধুরী।

## তৃতীয় অঙ্ক।

### ১ম দৃশ্য।

( কুটীর।)

কুমার ও মাধুরী।

কু। এই সেই শান্তির কুটীর যার কথা
বলেছিনু—নিরাপদে থাক এ নিশায়।
প্রভাতে না হয় যেও যেথা ইচ্ছা তব।

মা। কাহার বসতি হেথা কেবা সে রমণী?

কু। দয়াবতী তিনি; হল না সাক্ষাৎ তাঁর
সনে—কি করি সময় নাই—দস্যুদল
না ফিরিতে ফিরে যাব তথা। রাখিব না
সন্দেহের পথ। বিদায়—হবে না দেখা
আর তব সনে—তবু মনে কোরো মোরে।

মা। ভুলিব না এ জীবনে—

কু। বিদায়, বিদায়।

[ প্রস্থান।

মা। গর্ব্বোন্নত দুর্গ হ'তে পিতার আমার,
বৃক্ষলতাশূন্য এই নির্জ্জন প্রান্তর
হেরিয়াছি কত দিন। শুনেছিনু বটে,
থাকে হেথা অভাগিনী নারী একজন,
ফলমূল তরুলতা পত্রাদির গুণ
জানে সে বিশেষরূপে। আর নানা মন্ত্র-
তন্ত্রে বড় সুনিপুণ। গ্রামবাসী জনে,
তাহারে ডাইনী ভাবি পলায় সুদূরে।
এ কুটীর নিশ্চয় তাহার। জীর্ণশীর্ণ
অরক্ষিত জনশূন্য গেহ, আর কার
আশ্রয়ের স্থল?

( দ্বারে আঘাত )

২ অ। (বাহির হইতে) দরজা খোল।

মা। (স্বগত) চুপ, কে এল হেথায়?

২ অ। (বাহির হইতে) শীঘ্র খোল।

মা। পরিচিত কণ্ঠস্বর। এযে মম পিতৃ-
অনুচর। পারে যদি চিনিতে আমায়?

২ অ। (বাহির হইতে) এখনও ইতস্ততঃ করচ ?

মা। স্বতন্ত্র প্রকৃতি আর ভিন্ন কণ্ঠস্বরে
রাখিয়া গোপন মোরে করিব প্রকাশ।
কি ভীষণ সর্ব্বনাশ ঘটিবে আজিকে !
(দ্বারোদ্ঘাটন ও তিন জন অনুচরের প্রবেশ।)

২ অ। তুমি যে দরজা খুলে দিলে, তাতে ভালই হ'ল। নহিলে তোমার কাণের কাছে এ ঘরখানা ভেঙ্গে চুরমার করতুম।

মা। প্রবলের পদানত দুর্ব্বলের যম,
দেখিতেছি তোমরা সকলে। এ পীড়ন
কোন প্রয়োজনে ? প্রাসাদ তোরণ হ'তে
পবিত্র সহস্র গুণে পর্ণের দুয়ার।
প্রজার রক্ষক যেবা—সে রক্ষক হ'য়ে,
যদি অত্যাচারে রত, দীনহীন জনে
রক্ষা করিবে কে আর ?

২ অ। আমাদের প্রভুর আদেশ, এ কুটীরে যাকে পাব, তাকেই আমাদের দুর্গে নিয়ে যাব।

মা। তোমাদের
প্রভুর আদেশ করিও না কলুষিত
দয়া বিসর্জ্জিয়া। চল, যাইতেছি আমি।

[ সকলের প্রস্থান।

## ২য় দৃশ্য।

দুর্গের বাহ্যদৃশ্য।

কুমারের প্রবেশ।

কু। পুনরায় ভাবিবার লভেছি সময়,
নরপিশাচের দলে যাব কি ফিরিয়া ?
সেই বটে নিরাপদ মোর। কিন্তু আজ
সাধিব কি কায ? উহু কি ভীষণ! সাধ
করে নির্দোষ এ দুর্গবাসী জনে হবে
করিতে বিনাশ—অজ্ঞাতে তাদের। না, না,
আমি হব অন্তরায়। শত ধন্যবাদ
মা তোমায়—শিক্ষা দিয়েছিলে বলি'—সেই
ঘোর অভিসন্ধি যত লিখেছি সংক্ষেপে
(শর-মুখে পত্রবদ্ধ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে শরক্ষেপ)
যাক্—শর গেল দ্রুতবেগে—হলেম কি
বিশ্বাসঘাতক ? নাহিক উপায় আর !
অকৃতজ্ঞ বটে আমি সঙ্গীদের কাছে
মনুষ্যত্ব সর্ব্বোপরি শ্রেয়ঃ শতগুণে।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তরের গৃহ।

দুর্গাধিপতি ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

দু। অর্পিলে তাহারে শেষে দস্যু-করতলে ?
কাপুরুষ নিতান্ত তোমরা।

অ। প্রভু, তাদের সংখ্যা বড় বেশী ছিল, আমাদের একটা তা'দের পাঁচ পাঁচটা; তার উপর আবার হাতিয়ার।

দু। যেতে দাও
ঘটিয়াছে যাহা। যুবক বীরেন্দ্র কোথা ?
লয়ে এস তারে।

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মহৎ উদ্দেশ্য তব
হইল নিষ্ফল। বংশের মর্য্যাদা মোর
হ'ল না বর্দ্ধিত হায় তোমার কল্যাণে।

বী। এ ঘোর বিপদে প্রভু হৃদয় তোমার
হ'ল না ব্যথিত ? এ কি কথা তব মুখে ?

দু। হারাইতে হ'ত দুহিতায়—দীনহীন
অধীন প্রজার চেয়ে নিকৃষ্টের করে
পড়েনি দুহিতা মোর—

বী। তোমার অধীন
প্রজা আমি—কিণাঙ্কিত এ দেহ আমার
বীরত্বের দিতেছে প্রমাণ। কিন্তু প্রভু
পড়ে কি স্মরণে তব, সে কাল সমরে
যে চিহ্ন ধরেছি বুকে—পড়েছিলে যবে,
অশ্বচ্যুত হ'য়ে তুমি ভূমি শয্যা'পরে
অর্দ্ধ-নীমিলিত নেত্র নিষ্পন্দ শরীর—
তখন কি এই প্রজা তব দাঁড়াইয়া
মৃত্যুমুখে, বক্ষ দিয়া অসীম সাহসে
শকুনির ভক্ষ্য হতে রক্ষেনি তোমায় ?

দু। সে যে কর্ত্তব্য তোমার।
বী। কিন্তু সে সময়
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রাণদাতা বলি,
করেছিলে সম্ভাষণ মোরে। তব মুখে
অসীম প্রশংসা শুনি সাহসের মম,
দীন রাজপুত আমি ভুলি একেবারে
উচ্চ আশাবীজ হৃদে রোপিণু যতনে—
সলিল-সেচনে তুমি বাঁচালে তাহারে।
হইলাম সুখে তাই ফুটন্ত মাধুরী-
সম মাধুরীর তব প্রিয় সহচর।
সেইদিন হতে যত পণের ক্রীড়ায়
হইয়া বিজয়ী লভিতাম পুরস্কার
পদতলে আনি তার রাখিতাম সুখে।
বিস্ময়-স্ফুরিত নেত্রে শুনিত মাধুরী
মৃত্যুমুখ হতে আমি ফিরিনু কেমনে!
ফেলিত সে দীর্ঘশ্বাস অপার আনন্দে!
ধরিত না স্তুতি মোর রসনায় তব।
একসাথে মোরা দোঁহে হয়েছি বৰ্দ্ধিত
সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, কিবা বিদ্যাভ্যাসে
এক-আত্মা ছিলাম দু'জনে—সে প্রণয়
সুমধুর প্রেমে শেষে হ'ল পরিণত।
তুমিও উৎসাহ দিলে অকপট চিতে।
দু। নিষেধও করেছিনু।
বী। কি কারণ!
দু। নীচ
বংশোদ্ভব তুমি।
বী। ছিলনা উপায় কোন
সে সময়ে আর। পিতৃপুরুষের কথা
কি ফল তুলিয়া তবে? হীন বংশে জন্ম
বলি' করিব কি বিষপান? শব্দময়ী
ধরা'পরে কেন যে এসেছি অবিদিত
আমি। যতক্ষণ আছি হেথা কর্ম্ম মোর
দিবে পরিচয়। কর্ম্মগুণে রাজপূজা
লভে নর। কর্ম্মদোষে যায় অধঃপাতে—
আভিজাত্য রক্ষিতে পারে না তারে। জাতি,
কুল, শীল, মান, সর্ব্বোপরি আধিপত্য
করিতে বিস্তার কর্ম্মফল। কি সমাধি
কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রতিমূর্ত্তি কিবা সবকার হতে
কর্ম্মফল করে স্থায়ী খ্যাতি বা অখ্যাতি।
দু। গুরুতর করি ইহা বলিতেছ তুমি।
বী। নহে প্রভু নহে। এত অবহেলা ভরে
হেরিতেছ ইহা—সহজে শীতল রক্ত
হয় উত্তেজিত। আরো গুরুতর কিছু
শুন এইবার—দস্যুকরে কন্যা তব।
দাও বলি অনুচর বিংশতি আমার
সনে। সম্মত কি নহ? ভাল, দশ জন
দাও তবে। একান্ত না হয়, পাঁচ জন!
ইহাও যদ্যপি বহুমূল্য গণ্য কর
উদ্ধারের তুলনায় তব দুহিতার,
দাও প্রভু শীঘ্র মোরে অব্যাহতি তবে;
ত্যজিয়া আহার-নিদ্রা উদ্ধারিব আগে
মাধুরীরে—হারাইব অথবা আমায়।
দু। তোমার সাহসে আমি করি না নির্ভর।
(১ম অনুচরের প্রবেশ।)
১ম অ। মুক্তিমঠ হ'তে একজন সন্ন্যাসী দেখা করতে এসেছেন।
দু। তাঁর সনে সদালাপ করিতে বাসনা।
হেথা হ'তে লয়ে যাও এ উন্মত্তটাকে।
রেখ রুদ্ধ করি যেন পলাতে না পারে।
বী। বিপদবারণ প্রভু রক্ষ মাধুরীরে।
(উভয়ের প্রস্থান।)
দু। স্থির হও অন্তর আমার। তাঁর কাছে
খুলিব প্রাণের ব্যথা। বিকম্পিত স্নায়ু
যত দৃঢ় হও এবে। সাধু পুরুষের
করুণা প্রভাবে শান্তি লভিবে এখনি।
(দয়ানন্দ বেশে রাঘব ও প্রহরীর প্রবেশ।)
দু। (প্রহরীর প্রতি)
দেখ যেন কেহ হেথা করে না প্রবেশ।
(প্রহরীর প্রস্থান।)
এস প্রভু, দয়ানন্দ নাম কি তোমার?
রা। ওই নামে পরিচিত আমি।

হু। হর্ষ ভরে
করিছে ঘোষণা তব অসীম করুণা
দয়ানন্দ নাম। উচ্ছ্বসিত যশপ্রভা
বিদিত করেছে মোরে—স্বর্গীয় প্রভাব
তব, বিশৃঙ্খল মস্তিষ্ক হইতে লুপ্ত
করি দেয় পাপস্মৃতি। দুষ্কৃতির চিন্তা
আসি যে বিকট মূরতি দেখায়—সেও
হয় বিদূরিত তব সাধনার গুণে।

রা। সামান্য ক্ষমতা মম, কেন তার এত
গুণগান? অনিপুণ নহি বটে আমি
এ মঙ্গল কার্য্য সম্পাদনে।

হু। প্রার্থনীয়
তাই মম; উপদেশ তব করিতেছি
প্রতীক্ষা এখন।

রা। মুক্তকণ্ঠে বল তবে
অন্তরের গুপ্ত কথা—অশান্তির হেতু।
দেহব্যাধি যথা গরব বা লজ্জাবশে
করে না প্রকাশ যারা বৈদ্য-সন্নিধানে,
রোগমুক্ত তারা কভু হয় না জীবনে।
উপহাসাস্পদ করে বৈদ্যেরে কেবল।
মনোব্যাধি জেন সেইরূপ।

হু। অকপটে
বলিব সকল কথা না রাখি সঙ্কোচ
অন্তর্যামী-সন্নিধানে বলিতেছি যেন।

রা। বল তবে।

হু। লভেছিনু সর্ব্বগুণবতী
রমণী-রতনে আমি শুভ পরিণয়ে।

রা। সুখী ছিলে তবে—

হু। মনে করেছিনু বটে
হ'ব চিরসুখী। মানব-মনের গতি
বিদিত তোমার—করিয়াছ অধ্যয়ন
আজীবন যাহা। প্রকৃতির বশে কেহ
উচ্চতম আনন্দ সম্ভোগে থাকি, আনে
তবু অসুস্থতা মনে;—পিশাচের নৃত্যে
শেষে স্বর্গকে নরক করি তুলে।

রা। সত্য
বটে।

হু। আমিও তেমতি ছিনু। বিশ্বাস কি
হয় তব? গুণবতী রমণীরে লয়ে
ছিনু সুখে প্রণয়ের সর্ব্বোচ্চ সোপানে।
তাঁহার অসীম গুণ ধরিতে অক্ষম
হইল হৃদয় মোর। সন্দিগ্ধতা আসি
সে প্রেম-স্বরগ হ'তে বিচ্যুত করিয়া
মোরে ফেলিল আঁধারে—পাইলাম লিপি
এক—লেখা ছিল তাহে সতর্ক নয়নে
রেখ সহধর্ম্মিণীরে।

রা। কোন দুরাচার—

হু। অবধান কর আগে। যাহা হয় নিষ্পত্তি
পরে করিও সাধন। আবার পাইনু
লিপি একখানি—লজ্জিত হইনু বড়
সে লিপি পঠনে। বুঝিনু হেরিব মম
শয়ন-মন্দিরে—অপর প্রণয়ীসহ
রভস আলাপে রত প্রেয়সী আমার
রহিবে নিশায়। নির্দ্ধারিত ছিল তাহে
সে অশুভক্ষণ। ভীষণ যাতনা ভরে
সে সময় করিনু প্রতীক্ষা—অকস্মাৎ
হেরিনু প্রেয়সী মম রহিয়াছে গুপ্ত
ভাবে পর পুরুষের সনে

রা। তোমারই
গৃহে?

হু। প্রেয়সীরে করিনু ছুরিকাঘাত।
সঙ্গী তার গেল পলাইয়া। মোর হস্ত
হতে পাইল সে পরিত্রাণ, আঁধারের
কোলে কোথা গেল মিলাইয়া। সন্ধান না
পাইনু তাহার। হেরিলাম ফিরে এসে
প্রেয়সীও মোর—গভীর আঘাতে যারে
করে নাই বিপন্ন তেমন—আমাদের
একমাত্র শিশুপুত্রলয়ে, আশঙ্কায়,
করিয়াছে পলায়ন জলপথে; কিন্তু
সে তরণীখানি সমস্ত আরোহী সহ

ডুবিল অকূলে—প্রবল ঝটিকা-বশে
কেহ বাঁচিল না আর।

রা। বড় শোচনীয়
বটে পরিণাম তার। কিন্তু অপরাধ
কিবা তব? সে কি নহে দোষী?

হু। কখনই
নহে। সেই দুরাচার—দুরাচার বলি
যারে জানিলাম পরে—লিখেছিল শেষ-
লিপি দৃঢ়তার সহ—যে কথা বলিতে
কাঁপে হৃদয় আমার—অন্তরেতে চির
মুদ্রাঙ্কিত যাহা—নিষ্কলঙ্ক পত্নী তব
জানিও নিশ্চয়। সাধিয়াছি প্রতিহিংসা
অর্দ্ধেক কেবল।

রা। (স্বগত) এখনো অর্দ্ধেক বাকী
(প্রকাশ্যে) তুমি কি সেধেছ কোন অনিষ্ট
কাহারো?

হু। হ'তে পারে। কিন্তু অদ্যাবধি পারি নাই
জানিতে কিছুই হিংসাবশে কে আমার
সাধিল এমন সর্ব্বনাশ?

রা। অপূর্ব্ব এ
কথা বটে। পারিলে না করিতে ইহার
কিছু স্থির?

হু। কই, কিছুই পড়ে না মনে।

রা। অতীব বিস্ময়! কেহ নয়? অপমান
করেছিলে কা'রো, উত্তেজিত হইল যে
এ কার্য্যের তরে?

হু। কখনই নহে।

রা। (স্বগত) আজি
ভাঙ্গিব বিস্মৃতি তব।

হু। শুধু একজনে
দিয়েছিনু মনোকষ্ট। কিন্তু করেছিনু
তারে পুরস্কৃত পরে। বৈরীভাব তার
বিদূরিত করি তারে শান্ত করেছিনু।

রা। (স্বগত) সত্য বটে।

হু। লভিয়াছে মৃত্যু সে এখন।

রা। (স্বগত) নিশ্চিন্ত তাহলে তুমি।

হু। যদি বা সে বেঁচে
থাকে, তার ভাবনায়, এ অমূল্য কাল-
ক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন? শুন মোর কথা—
আমিই নায়ক সেই শোণিতপাতের।
ভূতের তাণ্ডবনৃত্যপূর্ণ জনশূন্য
গৃহে প্রবেশিতে যথা পারে না মানব,
মর্ম্মে মর্ম্মে নৃত্য করি তেমতি এ স্মৃতি
দেয় না পশিতে আর শান্তি ক্ষণতরে।

রা। বিষম যাতনা অহো ভুঞ্জিছ যে তুমি

হু। আছে তব
মোহিনী শকতি—সে পবিত্র
ত্রিদিব শক্তির বশে মনের ভাবনা
যত করি দাও দূর। শান্তির জীবন
ফিরে আসুক আবার। অভয় অন্তরে
যেন আগেকার মত ডাকিতে সক্ষম
হই নিত্য পরমেশে। সেই স্বাস্থ্য এনে
দাও মনে, যার বলে মানুষের মত
পারি হাসিতে কাঁদিতে। সেই নিদ্রা চাই
পুনঃ, শান্তিনাশ করি যেবা নিত্য আনে
নবস্ফূর্ত্তি প্রাণে, দেহ করিয়া সবল—
শ্রান্ত কলি পুষ্ট করে শিশির যেমতি।
সংক্ষেপে—

(তীর লইয়া অনুচরের প্রবেশ।)

পশিলে হেথা কি সাহসে তুমি?

অ। প্রভু ক্ষমা করুন। এই তীর উত্তর তোরণের পাশে এখন এসে পড়ল্, এর মুখে এই চিঠিখানা বাঁধা ছিল। ইহা অত্যন্ত দরকারী ভেবেই আপনাকে দিতে এসেছি।

(জানু পাতিয়া তীর প্রদান।)

হু। কি আছে ইহাতে? দেখিতেছি লেখা কিছু।
বুঝিতে নারিনু। আপনি দেখুন প্রভু
কি অর্থ ইহার? (পত্র প্রদান।)

অ। প্রভু, আমার কোন দোষ লইবেন না।

হু। যাও, এসো না এখানে
আর না ডাকিলে তোমাদের।

রা। (স্বগত) বিশৃঙ্খল
এ যে!
দু। সাধু পুরুষের একি ভাবান্তর।
প্রভুকেও ভাবাইয়া তুলিল এ লিপি।
রা। ধাঁধায় পড়েছি বটে—দেখি পুনরায়।
এতক্ষণে পেরেছি বুঝিতে—তুচ্ছ এক
প্রেম-গীত যাহা গায়ক ভিখারী যায়
পথে পথে গেয়ে—উচ্চারণ-যোগ্য নহে
সাধু পুরুষের—শ্রবণেরো যোগ্য নহে
অভিজাত যাঁরা। ইচ্ছা যদি হয় তব
শুনাইব পরে। গভীর চিন্তার কালে
নহে উপযুক্ত। এক মনে শুনিলাম
অপরাধ তব—বড় গুরুতর ইহা।
দু। ঠিক বলিয়াছ প্রভু—
রা। কিন্তু ঈশ্বরের
অনুগ্রহ অপার অনন্ত। অনুতপ্ত
হয় যারা তাদের উপর, করুণার
লীলা তাঁর বড়ই অদ্ভুত। ক্ষণকাল
দাও মোরে নিভৃতে থাকিতে। সমাহিত
হ'য়ে, বিভুপদে সমর্পিয়া প্রাণমন
তোমার শান্তির পথ জানিব এখনি।
দু। বাহিরে রহিব তবে ওই স্তম্ভপার্শ্বে।
রা। সেই ভাল, ধর এ আশ্বাস-বাণী—ক্ষণ
পরে পারিবে জানিতে কেমনে লভিবে
চিরশান্তি তুমি।
দু। শান্তি পাব চিরতরে?
উদিবে না শোণিতাক্ত সে ভীষণ ছবি
কভু আর স্মৃতিপথে?
রা। স্বপনেও
নহে। (স্বগত) কারণ লভিবে মৃত্যু।
দু। এ মঙ্গল
সাধনে তোমার, হউন সহায় বিভু।
(প্রস্থান)
রা। (পত্র পাঠ)
"আপনার দুর্গ অদ্য রাত্রিতে অতর্কিতভাবে
আক্রমণ করা হচ্চে। আর দুর্গের সকলকেই
নিশীথ সময়ে হত্যা করা হবে। উত্তর তোরণের
দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।"
সুন্দর এ প্রেম-গীত। দয়ানন্দ বুঝি
লিখেছে এ লিপি। না, না, তা'হ'লে লিখিত
সে যে আমার এ ছদ্মবেশ-কথা। তবে
কার পত্র? কুমারের 'পরে হইতেছে
সন্দেহ আমার। আমাদের মাঝে সেই
সদয় প্রকৃতি; অভ্যাস আজিও তারে
রক্তপাত শিখাইতে হয়নি সক্ষম।
কৌশলী সে বটে। কিন্তু উদ্দেশ্য বিফল
হল তার। ঘুচিল সকল ধাঁধা এবে।
দুর্গাধিপে ফিরাইব কটাক্ষে আমার,
করতলগত সে এখন। আরো উচ্চে
উঠিব এবার শ্যেনপক্ষী উঠে যথা
তাহার শিকার লাভ করিবার আগে।
নর চক্ষু অন্তরালে লইয়া তাহারে
সাধিব পরমসুখে শিকার আপন।

### ৪র্থ দৃশ্য।

দস্যুদেবের আবাস।

কুমারের প্রবেশ।

কু। (স্বগত।) সব দিকেই হল ভাল। আমিই এই রক্ত-প্রিয় কুকুরদের আগে এসে পৌঁছিচি। তারাও এখনি এল বলে। আমি ত আগেই একটা হিংস্র নেকড়েকে মেরেছি। তার রক্ত আমার গল্পটাকে রঙ্গিন করে তুলবে। (বাঁশীর শব্দ) শোন ঐ তারা খুব কাছে এসেছে। আসুক, আমিও প্রস্তুত আছি।
(অনন্ত ভৈরব ও অন্যান্য দস্যুগণের প্রবেশ।)
অ। সব শেষ হ'য়েছে ত?
(কুমারের হস্ত প্রদর্শন।)
ভৈ। বেশ হয়েছে।
অ। দেহটা কোথায়?
ভৈ। আগা-গোড়াই বল না।
কু। আমি তার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঐ পাহা-

ড়ের উপর নিয়ে গিয়েছিলাম। পাহাড়টাই ত সমুদ্রের উপর ঝুঁকবে—

ভৈ। আমি যেখানে নেড়া বৈরাগীটাকে—যে 'গোবিন্দ হে' বলে চেঁচাচ্ছিল—ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিলুম যে, এইবার ইষ্ট স্মরণ কর্।

কু। হাঁ, ঠিক তাই; সে যেমন সাগরের দিকে চেয়ে দেখ্ছিল, আমিও তার পিঠে এক ছোরা বসিয়ে দিলাম। আর তার পরেই তাকে সমুদ্রের তরঙ্গে পড়্তে শুন্লাম, তার পর সব নিশ্চিন্ত।

ভৈ। হারিৎ কোথায়?

অ। আমরা যখন চলে যাই, তখন কেহ কি তাকে দেখে ছিলে?

১ম দ। আমি ত দেখিনি।

২য় দ। আমি ও না।

৩য় দ। আমি ও না।

অ। আমার বোধ হয় সে ঝোপে ঝাপে কোথাও গিয়ে বেড়াচ্চে। সে সদাই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে, পাছে দয়া তাকে একটুও ছোঁয়। হিংস্র জন্তুর মতন সে নিজেই চেঁচিয়ে মরে। দলে থাক্‌তে বড় চায় না। সে যে রকম নেকড়ে, এক দিন একটা শিকারীর হাতে পড়ে বসে দেখ না।

ভৈ। ভূভারতে এমন দস্যু শিকারী নাই যে, তাকে শিকার করবে। তবে আছে কেবল ফাঁসি কাঠ।

অ। তাই বটে। ফাঁসি-কাঠই তার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত। ফাঁসি-কাঠের মান তার দ্বারা যেমন বাড়্বে, এমন আর কারোর দ্বারা নয়।

ভৈ। আমি তার জন্ম থেকে সব জানি। ছেলে বেলা যখন সে দোলায় দুল্‌ত, তখন মাছি মারাই তার প্রধান খেলা ছিল। তার মাও তাতে খুব উৎসাহ দিত। ক্রমে যখন বড় হল, একদিন কল্লে কি জান;—তার একটা পাখী খুব গলা ছেড়ে গান গাচ্ছিল, সেই গান শুন্‌তে শুন্‌তে সে উঠে গিয়ে পাখীটার ঘাড় মচকে দিলে। তার মা বেটীও তেমনি হারিতের দাড়ী ধরে চুমো খেয়ে বল্লে 'বেশ করেছ বাবা গান তুমি বোঝ বেশ!' তার পর থেকেই রাস্তায় রাস্তায় কুকুর বেড়াল ঠেঙ্গাবার কায আরম্ভ করে দিলে। যখন পাঠশালায় পড়ত। গুরুমশায় যে পিঠের চামড়া তুলবে—সে ভয় না করে, কা'র ফাঁসি হবে তাই পালিয়ে পালিয়ে দেখ্‌তে যেত। ক্রমে যত বড় হল, ততই সে রক্তলোলুপ হয়ে উঠ্‌ল। আর সেই গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্তু জানোয়ার ছেড়ে এখন মানুষ ধরেছে। যাক, আমরা এখন আমাদের অস্ত্রশালায় যাই।

অ। আজ সকলেই ভাল করে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হও। আজ রাত্রের কায বড়ই গুরুতর।

ভৈ। যদি ধরা পড়ি, তাহলে ত ইঁদুর-বেড়ালের মত আমাদের মার্‌বে। যাক্‌, ভায়ারা এখন তোমাদের কর্ত্তব্য কর। যা' অদৃষ্টে আছে, তাত ঘটবেই; হয় ত বা ফাঁসি-কাঠ থেকে পালাতেই পারব না। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ কি! ফাঁসি যাবার উপযুক্ত আমরা অনেক দিনই হয়েছি। এখনও যে যাইনি, এইটাই আমাদের শাস্তি। চল, অস্ত্রশালায় চল।

[ প্রস্থান

# চতুর্থ অঙ্ক।

## ১ম দৃশ্য।

দুর্গের একটী গৃহ।

রাঘব ও তৎপশ্চাৎ দুর্গাধিপের প্রবেশ।

রা। এই কি নিভৃত স্থান?

দু। নীশিথ যেমন।

রা। পশে না কি কোলাহল হেথা? বাহিরের দৃশ্য কোন পড়ে না লোচনে?

দু। নহে প্রভু, বড়ই নির্জ্জন গেহ। ভেবেছিনু মনে

ভাবী বংশাবলী তরে সাধনার স্থান
ইহা করিব নির্দ্দেশ।

রা। দেখিতেছি
এই তব উপযুক্ত বটে।

হু। আমার অদৃষ্টে
হায় আসিবে কি সে শান্তির শুভদিন!
রাজ্যভার সমর্পিয়া বংশধর' পরে
একমনে ঈশ্বরের করিব সাধনা—
নিশ্চিন্ত হইয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে?

রা। (স্বগত) মোর হস্তে শীঘ্র তুমি হইবে নিশ্চিন্ত।

হু। নিরুপম কারুকার্য্যে সুগঠিত করি
স্থাপিয়াছি স্মৃতি-স্তম্ভ সহধর্ম্মিণীর
মম—যে দিব্য প্রতিমাখানি ডুবিয়াছে
—আমারই কর্ম্মদোষে—ঘোর অন্ধ আমি—
অতল সলিলতলে হায় রে অকালে
তাহারি হিরণ-মূর্ত্তি করিব স্থাপন
রতন-খচিত দীপ্ত স্মৃতিস্তম্ভ পরি।
দোঁহার জীবন-গাথা সুবর্ণ অক্ষরে
জ্বলিবে সতত ওই ঘোর অন্ধকারে।

রা। প্রহর-দামামা তবে বাজিবার পর
পশিব আমরা দোঁহে ওই গুপ্তস্থানে
ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি যেথানে কেবল
রহিবে জাগিয়া। সাধনার কার্য্য শেষে
পুনর্জন্ম লাভ তব হইবে অমনি।

হু। সেই ভাল— প্রভু তব পরিতুষ্টি তরে
যত অর্থ প্রয়োজন বল অকাতরে
করিব প্রদান আমি।

রা। ছি, ছি, সরমের
কথা এ যে, সিদ্ধ হয় ধর্ম্মের সাধনা
যবে, সন্তোষ আপনি জাগে চিতে-যাহা
বহির্ভূত সাধারণ মানব-শক্তির।

হু। আসিতেছে কিসের এ ধ্বনি—

রা। গায়কের
দল বুঝি।

(অনুচরের প্রবেশ।)

অ। আসিয়াছে বহুদূর ভ্রমি
তিনটি চারণ কবি; ক্লান্ত, উপবাসী
তারা, বিরামের তরে আজি নিশাকালে
চায় থাকিতে এথানে। কি আদেশ প্রভু তব?

হু। ব্যস্ত বড় আমি—তাহাদের পাদ্য-অর্ঘ
দিয়ে আহারান্তে পাঠাইয়া দিও অন্যস্থানে।

রা। না, না, সে নহে কর্ত্তব্য কভু তব
যদিও নিবিষ্ট তুমি গভীর বিষয়ে
অতিথির মনোবাঞ্ছা ভুলিওনা তবু
করিতে পূরণ।

হু। ভাল তবে তাই হোক
আন তাহাদের।

(অনুচরের প্রস্থান)

রা। বিশেষ চারণ কবি,
যতনে রচিয়া যারা পুরাবৃত্ত-কথা
প্রাতঃস্মরণীয় যত রাজ-যশোগানে
মহৎ প্রকৃতিলাভ শিক্ষা দেয় সুখে
রাজবংশধরগণে। তাদেরি যতনে
রক্ষিত হইবে ভাবী রাজকীর্ত্তি যত।
সুখদুঃখবিজড়িত তাহাদের গানে
তন্ময় করিয়া তোলে অধীর পরাণ।

(তিন জন দস্যুর চারণ-কবির বেশে প্রবেশ।)

রা। কোথা হতে আসিছ তোমরা প্রিয়বর?

১ম দস্যু। আসিতেছি প্রভু মোরা উত্তর হইতে।

রা। কোন দিকে যাবে পুনঃ?

১ম দ। অদৃষ্ট লইয়া
যাবে যেদিকে আবার? দিবা অবসান
হেরি এসেছি হেথায় আশ্রয়ের আশে
রহিব এ নিশাকালে করেছি মানস।
শুনাইয়া আমাদের গীত তুষ্ট করি,
জানাব আশীস্।

হু। ভাল শুনাও তাহলে।

গীত।

প্রহর-দামামা ওই বুঝি বাজে,
তিমির বসনে ধরণী যে সাজে।
কি ভীষণ রাতি;
হৃদে জাগে ভীতি,
গভীর মুরতি প্রকৃতি বিরাজে।

ঘুমে অচেতন
ধরাবাসী জন,
বিরত এখন নিজ নিজ কাজে।
এ নিশায় স্থান,
অতিথিরে দান,
করে পুণ্যবান্ মানবের মাঝে।

হু। সুমধুর ভাবময় এ সঙ্গীত বটে,
নহে সাধারণ গীত সম।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

আবার কি?

প্র। আদেশ প্রতীক্ষা তব করিছে সে নারী
প্রহরীরা গিয়েছিল যারে আনিবারে।

হু। লয়ে এস তারে। (চারণ কবিদের প্রতি)
যাও ক্ষণতরে এ কার্য্য সমাধা হলে
আহ্বানিব পুনঃ।

(গায়কগণ ও প্রতিহারীর প্রস্থান)

সেই শুনিন্ রমণী
শুনেছ যাহার কথা নিঃসন্দেহ প্রভু।

রা। আমাদের মাঠে বড় পায় না পশিতে
জনরব। এ নারীর আশ্চর্য্য-কাহিনী
তবু করেছি শ্রবণ।

(কৌশল্যার প্রবেশ)

হু। এই সেই নারী।
দেখুন ইহারে। রমণী দাঁড়াও তুমি
গুরুতর অভিযোগ করিয়াছে মম
প্রজাগণ বিপক্ষে তোমার। দিন দিন
সর্ব্বনাশ সাধিছ সবার।

কৌ। একি কথা?

রা। শুন আগে, পরে বল বক্তব্য তোমার।

হু। অনাবৃষ্টি, মহমারী, গবাদি বিনাশ,
যাহা কিছু ঘটিতেছে দৈব দুর্ব্বিপাকে,
সে বিপাক পৈশাচিক শক্তি বলে তব
ঘটাও নিয়ত। তুমি জান বিষপ্রদ
তরু লতা ফল মূল যত, যার গুণে
জরা জীর্ণ করে ফেলে প্রফুল্ল যুবারে
ব্যাধি আনে সুস্থ দেহে, শস্য ভরা ক্ষেত্র
যায় ছারে খারে ব্যর্থ করি কৃষকের
পরিশ্রম যত। অপোগণ্ড শিশুরাও
তীব্রদৃষ্টি প্রভাবে তোমার মাতৃবক্ষে
থাকি যায় শুখাইয়া। নিশীথেও নিদ্রা
নাই তব, সে সময় বিচর নিয়ত
তুমি ভীষণ শ্মশানে, পিশাচগণের
সনে। প্রখর তিথিতে তাণ্ডব নর্ত্তনে
ব্যক্ত কর ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা যত।
সদুত্তর আছে তব বিপক্ষে ইহার?

কৌ। মিথ্যা এ সকল।

রা। নির্ভীক উত্তর এবে
রমণী তোমার।

কৌ। শুন প্রভু মোর কথা
দিবসের কোলাহল হতে ভালবাসি
রজনীর নির্জ্জনতা। প্রখর তপন
তাপ পরিহরি তাই একাকিনী করি
বিচরণ মনোরম চাঁদের কিরণে।
নক্ষত্র-খচিত চারু চন্দ্রাতপ সম
দিগন্ত ব্যাপিয়া নীল অনন্ত আকাশ
উর্দ্ধে করে অবস্থান। সম্মুখে সুনীল
সিন্ধু অনন্ত উদার, উদ্গারিয়া ফেণপুঞ্জ
ধাবিত হরষে। পদতলে বিরাজিতা
শ্যামাঙ্গিনী ধরা—তরুলতা কিশলয়
ফলপুষ্পভারে সুশোভিত তনুখানি।
আহা কি সুন্দর হেরি যবে শিখরীর
কোলে শাদ্বলশোভিত শান্ত সানু দেশে
পশি, কি এক উদারভাবে মগ্ন হয়
হৃদয় আমার দরদর আনন্দাশ্রু
বহে অলক্ষেতে। বিভুর আশীস্ সম
দিব্য শান্তি আনে চিতে উদার সুষমা।

হু। শান্তি নাই শুধু বুঝি মোর।

কৌ। কিন্তু হায়,
উষার বিমল বায়ু সেবন মানসে
প্রভাতে বাহির হ'লে, ঘৃণাভরে চলি
যায় যে হেরে আমায়। এখনো ফুটেনি
বাণী যে শিশুর মুখে—অঙ্গুলি নির্দ্দেশে

সবে দেখায় তাহারে—আমি যেন পাপ
ধরণীর। পল্লীবালদলে করতালি
দিয়ে ফিরে পিছনে আমার, থাকি তাই
বিজন কুটীরে আমি দিনের বেলায়।

দু। নাহি সত্য তবে কি এ অভিযোগ-মূলে?

কৌ। বৃথা অভিযুক্ত আমি—সে মোহিনী শক্তি
কোথা মোর! যার বলে ঘটে মহামারী
ব্যাধিগ্রস্ত হয় নর—পিশাচের সনে
করে আলাপন? নহে কি এ অসম্বদ্ধ
প্রলাপ কেবল? নির্ব্বোধের স্বপ্নভীতি?
তাহলে পারে কি মোরে দুর্দ্দান্ত প্রহরী
আনিতে সম্মুখে তব বিচারের তরে?
অলৌকিক সে শক্তি থাকিলে কেন হব
তবে আমি মানবের বিচার অধীন?

রা। যুক্তিপূর্ণ বাণী বটে। সামান্যা এ নারী
নহে কভু।

(অনুচরগণের সহিত বালকবেশী মাধুরীর প্রবেশ)।

দু। কে তোমরা?

অ। এ বালক ছিল
সেই কুটীর মাঝারে।

রা। (স্বগত) যত গোলযোগ।

দু। বলহে বালক কেন পশেছিলে তুমি
ওই নারীর কুটীরে?

মা। শুনেছিনু ইনি
বলিতে নিপুণ অতি ভবিষ্য ঘটনা।
পরীক্ষিতে গিয়েছিনু তাই প্রভু আমি।
আমিও ভবিষ্যবক্তা—আজ্ঞা কর তুমি
যে যেমন আছে হেথা থাকে যেন স্থির'
না হয় বক্তব্য মোর শেষ যতক্ষণ।

রা। (স্বগত) কি অর্থ ইহার? (প্রকাশ্যে)
শুনিও না কথা এর।

মা। স্থির হও মুহূর্ত্তের তরে। ফিরে যাবে
শোণিত হৃদয়ে পুনঃ শুনিলে আমার
কথা। বিস্ময়ে নিমগ্ন হবে মন। তনু
হবে রোমাঞ্চিত। আজি নিশাকালে, আজি
নিশাকালে—

দু। কি ঘটিবে আজি নিশাকালে?

মা। ভীষণ চক্রান্ত এক এ মুহূর্ত্ত পরে
প্রসবিবে এমন ঘটনা যার কার্য্যে
হারাইবে আচম্বিতে দুর্গবাসী জন
নিজ নিজ প্রাণ। দুর্গের প্রাচীর চূর্ণ
হইবে নিমেষে—হত্যা আর অত্যাচার
মূর্ত্তিমান হয়ে সারা বিভাবরী হেথা
করিবে গর্জ্জন। এই সে সময়—দস্যুগণ
আক্রমিবে, প্রহর-দামামা বেজে
উঠিবে যেমতি উত্তর তোরণ-পথে
প্রবেশিবে তারা। নিশ্চেষ্ট থেকনা আর।

রা। ক্ষান্ত দাও নাবালক ভবিষ্য-কথক।
পবিত্র কার্য্যের তুমি ঘোর অন্তরায়।
এ শুভ মুহূর্ত্ত বৃথা করিব না ক্ষয়
আর তব কথা শুনি। ধর্ম্মের বিরুদ্ধ
এ যে ঘোর অপমান। বাচাল বালক
বাতুলের বাণীসম গণি তব কথা
কি ফল শুনিয়া তবে?

মা। কেন প্রভু, কেন?
আমি ত বলিনি সাধুবেশ-আবরিত
দস্যুমূর্ত্তি তব? কত ভণ্ড আছে হেন
সাধুবেশে থাকে লুক্কায়িত। হের ওই
চারণ কবিরা—নহে চারণ কখন,
এ দুর্গের সর্ব্বনাশ সাধিতে এসেছে
এরা চারণের বেশে।

দু। সত্বর পরীক্ষা
তবে কর উহাদের।

রা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এক
দৃষ্টে দেখিতেছে গুণীন্ মাগীটা মোরে।
মরণ কি নাই ওর?

কৌ। (স্বগত) নিশ্চয় হইবে
কোন দস্যু এ সন্ন্যাসী।

মা। কি বল এখন
প্রভু!

রা। অবাক্ হয়েছি।

কে। (স্বগত) দোষী বলে তুমি।

দু। কে তোরা দুর্ভাগাগণ, বল শীঘ্র করি,
নহিলে যন্ত্রণা দিয়ে করিব বাহির
সকল রহস্য।

১ম দ। ভবিষ্যৎ-বক্তা তব
বলুক সকল! আপন বিপক্ষে দেয়
নির্ব্বোধে প্রমাণ। দস্যুদের নহে রীতি
আত্মপ্রকাশের।

২য় দ। আসি নাই সদুদ্দেশ্যে
এখানে আমরা। বর্ত্তমান মূর্ত্তি তার
বিশিষ্ট প্রমাণ। আর কিছু নাহি বলিবার।

৩য় দ। আমারো কিছুই আর নাহি বলিবার।

দু। লয়ে যাও ইহাদের—রাখ অবরোধে।
(চারণ-বেশী দস্যুদের লইয়া অনুচরের প্রস্থান)
আর কিছু বলিবে কি ভবিষ্য-কথক?

মা। কিছু নহে প্রভু।

দু। সে কি?

মা। যথেষ্ট বলেছি
তব নিরাপদ তরে! পীড়াপীড়ি আর
করোনা আমায়। যা' বলেছি, জেন তাহা
ঘটিবে আজিকে। হইয়াছি ক্লান্ত বড়,
চাই আমি বিরাম এখন।

দু। লয়ে যাও
ইহারে তোমরা; করিবে পূরণ যাহা
বাসনা ইহার।

মা। কেবল একটী কথা
ভুলেছি বলিতে। আক্রমিবে দুর্গ যারা,
তাহাদের মাঝে সুন্দর যুবক এক
হেরিবে, কুঞ্চিত কেশ উন্নত শরীর
তিলাঙ্কিত বামেতর কপোল তাহার
যাহা হেরি স্পষ্ট তা'রে পারিবে বুঝিতে।

কৌ। (স্বগত) সে যে আমারি কুমার।

মা। ভুলে কেশ-স্পর্শ
তার করিও না যেন। অন্যথা ঘটিলে,
ঘোর অনুশোচনায় দগ্ধ হবে পরে।
দয়া করি' নিরাপদে রাখিও তাহারে।
জানিতে পারিবে পরে বৃত্তান্ত সকল।
(প্রস্থান)

দু। নহে কি আশ্চর্য্য ইহা?

রা। বড়ই আশ্চর্য্য।
(স্বগত) এ বিপদে অতিক্রম করিব কৌশলে।

দু। দেখিতেছি আছে কিছু রহস্য আজিকে।
এ রমণী নিরপরাধিনী—মুক্তিদান দিনু
তব।

কৌ। (স্বগত) কে যে এ সন্ন্যাসী একবার হবে
আজ জানিতে আমায়।
(প্রস্থান)

দু। বিপদের এ যে
বিষম সূচনা।

রা। আমারো হতেছে শঙ্কা।

দু। ছদ্মবেশী দস্যুগণে কঠোর যন্ত্রণা
দিয়ে বাহিরিবে সকল রহস্য এবে—
সত্য কথা যত।

রা। হও নিরস্ত তাহাতে—
কঠোর বিচার-যোগ্য নিশ্চয় তাহারা।
দস্যুদেহ লৌহসম বিষম কঠিন।
হাসিয়া উপেক্ষা করে সকল যন্ত্রণা।
দেহের যাতনা পেয়ে সত্য যে বলিবে
তারা, কে করে প্রত্যয়? অন্তরের ধন
সত্য—অন্তরের পরীক্ষক জানে তার
পরীক্ষা-কৌশল। আছে দুষ্ট শত শত
পশুর মতন অম্লান বদনে সহে
দেহের যাতনা—ছাড়ে প্রাণ-আশা, তবু
করে না প্রকাশ কোন কথা। কিন্তু তারা
মন হ'তে পারে না ত্যজিতে হিতাহিত
জ্ঞান কভু। তাদেরো মানস-পথে পশে
অনুতাপ। অনুতপ্ত হ'লে করে সব
সহজে প্রকাশ।

দু। দেখিতেছি উহারাও সেই প্রকৃতির।

রা। আমার বিচারে তবে রাখ
উহাদের। শীঘ্রই জানিয়া উহাদের
অভিসন্ধি বলিব তোমারে। না পারিলে
জেন মোর সাধনের ফল—দৈব শক্তি—
যার বশে মানবের চিরপূজ্য আমি,

কোন ভিত্তি নাই তার—নিষ্ফল সকলি।

দু। তবে প্রভু কর তুমি তাদের বিচার।

রা। একেবারে তাহাদের হিতাহিত জ্ঞানে
করিব আঘাত আমি। দিব্য বস্তু আছে
কিছু এ দেহের মাঝে—জানিতেছি যার
বলে ভাবী মঙ্গল-সূচনা।

দু। সেই ভাল
করিগে আদেশ তবে অনুচরগণে,
হেথা আসি তব আজ্ঞা করিবে পালন।

রা। আমারো দর্শন তুমি লভিবে সত্বরে!

[ দুর্গাধিপের প্রস্থান ]

এইরূপে ধীর মানবেরা বিপদের
মধ্য হ'তে লভে নিরাপদে।

( কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ )

এ মাগীটা
এখানো এখানে! ( প্রকাশ্যে ) কিবা প্রয়োজন
হেথা? বড় ব্যস্ত আমি।

কৌ। সাধু তুমি নহ কভু।

রা। না হই যদ্যপি তাহে তোমার কি কায?

কৌ। করিয়াছ নির্ব্বাচন যে নিভৃত স্থান
গূঢ় অভিসন্ধি কিছু রয়েছে তোমার।

রা। উদ্দেশ্যের যোগ্য মোর এ নিভৃত স্থান।

কৌ। এ নিশাও যোগ্য বটে দুষ্কার্য্যের তব।
কি শুভ উদ্দেশ্য হেন করিবে সাধন
দিবসের চক্ষু যেথা রবে নিমীলিত?

রা। এ উদ্দেশ্য সাধনের নিশাই প্রশস্ত।

কৌ। দস্যুদের ছদ্মবেশ-বিমোচন কালে
দেখিয়াছি দৃষ্টি তব কি কালিমাময়!
বিস্ময়ে কেবল তুমি হওনি কম্পিত
উদ্বেগে কাঁপিয়াছিলে ঘোর পাপী সম
নিস্পন্দ রহিলে তাই বিরস বদনে।

রা। দস্যুদলপতি আমি, চিন না আমায়?
কিন্তু এ ভিত্তির পরে করিও না আশা।
পুত্র তব করতলে—

কৌ। কি হয়েছে তায়?

রা। সহজ শিকার সে যে এখন আমার।
হয়েছে সে আমাদের বিশ্বাসঘাতক
পেয়েছি প্রমাণ তার—আজিকার কার্য্যে।
যদি না হইল ফল—অথচ বিপদ
যদি না ঘটে আমার—নিশ্চয় জানিও
তারে করিব নিধন।

কৌ। রক্ষিবেন তারে
ভগবান্।

রা। আর ভগবান্! সাবধান
হও তুমি। অতীত এ মোহিনী শক্তির
তব। নির্ব্বোধ এ দুর্গেশের পরিণাম
আজ মোর করতলে। অব্যাহতি-আশা
তার রেখ না অন্তরে। বিষম বিপদে
কেন হবে জড়ীভূত? কুটীরে তোমার
ফিরে যাও। বাজে ব'লে প্রহর-দামামা।
থেক না হেথায় আর। এ বিপদ কর
পরিহার। তাহলে রাখিব প্রাণ
পুত্রের তোমার—যতক্ষণ রব আমি
অক্ষত শরীরে—যাও যাও এই বেলা।

[ প্রস্থান।

## পঞ্চম অঙ্ক।

### ১ম দৃশ্য।

( বনের অন্ধকার অংশ। দূরে প্রহর-দামামার বাদ্যধ্বনি। )
অনন্ত, ভৈরব ও এক জন দস্যু।

অ। কি গাঢ় অন্ধকার।

দ। আর তেমনি নিশাড়া—যেন মড়ার মত। গাছের পাতা পড়্‌বার শব্দ অবধি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। সে লোক্‌টা এখনো গাছে ঝুল্‌ছে, আর এমন একটা শোঁ শোঁ শব্দ তুল্‌ছে—যেন এখনি আমাদের উপর সে প্রতিশোধ নেবে বল্‌চে।

অ। দূর পাগলা, ও কথা ভাবিস্ নে। চৌকিদারেরা মনে করে, আমাদের ধরিয়ে দিয়ে রাজার কাছে

মস্ত নাম কিন্‌বে। বেটারা জানে না যে, তাদের প্রাণ আমাদের হাতে।

ভৈ। আমি দেখ্‌তে পাই ওদের মধ্যে রাধুটা বোঝে বেশ—সেদিন আমরা মাঝের গাঁ লুট্‌ কর্‌চি দেখে, রাধু সরে গেল। বল্‌লে তোমরা যদি কিছু পাও, আমার তাতে বাধা দিবার দরকার কি? আমরাও কোন্ না তাকে বক্‌সিস কর্‌লুম। আর সব বেটারা, কুকুর-মারাদের মতন মনে করে, আমাদের এক একটার মুণ্ড নিয়ে গিয়ে রাজার বক্‌সিস্ নেবে। পোড়া কপাল আর কি?

অ। শোন, কারা আসছে?

২য় দ। (বাহির হইতে) আমরা।

অ। কে—অশ্বিনী?

(দুর্গ হইতে তিনজন দস্যুর প্রবেশ)

১ম দ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল—হ'ল ভাল।

অ। কেন--তোমাদের কি জান্‌তে পেরেছিল?

১ম দ। জান্‌তে পেরেছিল বটে, কিন্তু সর্দ্দার ঠিক আছেন—আর তিনিই আমাদের রাস্তা পরিস্কার করে দিলেন। প্রহর-দামামা ত বেজেছে। সমস্ত গ্রাম ত ঘুমে আচ্ছন্ন। আজ্‌কে আমাদের জিতের খেলা। আর দেরী কোরনা; আমাদের সঙ্গে এস। পরে সব জান্‌তে পারবে।

অ। তবে এস, সকলে যাই।

(প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

নির্জ্জন গৃহ-মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ।

দুর্গাধিপ ও রাঘবের প্রবেশ।

দু। এই সেই স্থান।

রা। কেহ বাধা দিবে না হেথায়?

দু। থাকিতে জীবন-আশা করিবে না কেহ
প্রবেশ এখানে।

রা। বেশ! গভীর এ স্থান
শান্ত নিরজন—উপযুক্ত আমাদের
ধর্ম্মানুষ্ঠানের।

দু। হের, মেঘাচ্ছন্ন শশী
হ'য়েছে নিষ্প্রভ—এখনি সে মেঘজাল
ভেদি' লভিয়া সম্পদ পুনঃ বিতরিবে
শান্ত জ্যোতিঃ এ পবিত্র কর্ম্মে।

রা। সে প্রতীক্ষা
রাখিব না আর।

দু। বলুন তা'হলে প্রভু
এ বিরলে অন্ধকারে আমরা দু'জনে
কি গুপ্ত কার্য্যের তরে আসিয়াছি এবে?

রা। সন্দেহ কি কর? হত্যা অপরাধী তুমি।
শোণিতের প্রায়শ্চিত্ত শোণিত-তর্পণ।

দু। অর্থ কি ইহায়?

রা। যে পাপ করেছ তুমি
প্রায়শ্চিত্ত তার নহে সামান্য কখন।
অনুতাপ, স্বার্থত্যাগ, যজ্ঞ, অনশন,
জীবনে সর্ব্বস্ব দান, তীর্থ পর্য্যটন,
মন্দির, অতিথিশালা, বিগ্রহ স্থাপন,
এ সকল পাপ মুক্তি হবে না তোমার।

দু। তবে প্রভু, এ পাপের কিসে হ'বে ক্ষয়?

রা। মৃত্যু—(বস্ত্রত্যাগে আত্মপ্রকাশ)

দু। অহো! কে তুমি! কে তুমি! দস্যু! দস্যু!

রা। নড়িও না এক পদ কোরনা চীৎকার,
তা হ'লে এখনি শেষ করিব তোমার।
কালের করাল করে এত কি আমার
ঘটিয়াছে রূপান্তর—তুমিও ভুলেছ
মোরে?

দু। কে তুমি? কে তুমি?

রা। (বাহূপরি চিহ্ন দেখাইয়া) চিনেছ এখন?

দু। রাঘব? জীবিত তুমি?

রা। নহিক প্রেতাত্মা
হের পুনরায়—এখনো যদ্যপি থাকে
চক্ষের সন্দেহ তব—হৃদয়ের মাঝে
শীঘ্র বুঝিবে আমারে।

দু। বৈরী ভাবে কেন?
রা। কেন? মনে নাই, ছিলে যবে সেনাপতি
সাহসী সৈনিক দলে—উদ্দাম বাসনা
বশে উন্মত্তের মত দিয়েছিনু যোগ
যাহে—শত কষ্ট সামান্য সৈনিক সম
সহি অকাতরে। করেছিলে একদিন
তীব্র তিরস্কার—আমিও উত্তর তার
দিয়েছিনু তীব্রতর করি। সেই দোষে
গুরুতর দণ্ড তুমি প্রদানিলে মোরে
অপরাধী সৈনিকের নিতান্ত অযোগ্য—
শুধু তাহা নহে—প্রতিহিংসা যত কেন
হোক্ না প্রখর—মানুষ পারে না দিতে
মানুষের প্রতি সে জঘন্য দণ্ড কভু।
মধ্যাহ্ন তপনালোকে হাটের মাঝারে
সাধ করে আহ্বানিয়া যত নীচ জনে
—যাদের শ্লেষোক্তি বিষে জরজর তনু—
ঘোর অপমান করি তাদের সম্মুখে
এ চিহ্ন মুদ্রিত করি দিলে এ বাহুতে
জন্মশোধ।
দু। হয়েছিল গুরুতর দোষ
বটে মোর—কিন্তু তুমি করেছিলে ক্ষমা।
রা। মুখে ক্ষমা করেছিনু—অন্তরেতে নহে।
তুমিও বিশ্বাস করি বেঁধেছিলে মোরে
বক্ষে তব। তখনো বলিনি কিছু। দোঁহে
মিলি একসাথে আহারে বিহারে রত
হইতাম সুখে। তবু বিষদান করি
নাই খাদ্যে তব। দোঁহে মিলি ঘোর রাত্রে
ভ্রমিয়াছি ভীষণ প্রান্তর কত। কত
দিন সিন্ধুকূলে বিজন ভূধরে দোঁহে
করেছিনু আরোহণ। তথাপি নিরস্ত
ছিনু। আরো কত তোমার ধ্বংসের তরে
আশ্চর্য্য উপায়—উপেক্ষায় পদভরে
করেছি দলিত। নহে দয়াবশে তাহা।
সৈনিক যুবার সেই বলিষ্ঠ বাহুতে
যে কলঙ্ক করেছ মুদ্রিত—মৃত্যু এসে
পারিবে না ঢাকিতে তাহারে—ভস্মীভূত
না হ'লে এ দেহ। তুমি ভেবেছিলে আমি
লভেছি মরণ। মৃত বটে আমি আজ
সকলের কাছে—প্রতিহিংসা রাখিয়াছে
জীবিত কেবল। শয়ন-মন্দিরে তব
দয়িতার পাশে হেরেছিলে আমারেই—
আমি দিয়েছিনু সেই লিপি। যন্ত্রণায়
অভিভূত হয়ে, অনুতাপে মগ্ন হ'লে
তুমি, এ কলঙ্ক অশনির সম বেগে
পড়ে না হৃদয়ে তব?
দু। সন্তুষ্ট নহ কি
তবে এখনও তুমি?
রা। এক তিল নহে—
প্রজ্বলিত প্রতিশোধ পিপাসা মিটাতে
নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে সংহারি তোমায়
উত্তপ্ত শোণিত যদি পান করি সুখে
কম্পিত ও দেহ যদি ছিন্ন ভিন্ন করি
ফুৎকারিয়া দিই উড়াইয়া—ধূলি যথা
ঘূর্ণিবায়ু-মুখে—তবু জেন জয়োন্মত্ত
হৃদিমাঝে মোর—তোমার যন্ত্রণা যত
ক্ষণস্থায়ী ভাবি'—প্রতিহিংসা অরুন্তুদ
তুলিবে ক্রন্দন। মনে করিও না তুমি
তোমার জীবন—এখনি ফুরাবে যাহা—
আমার এ ক্ষতি পূর্ণ করিতে সক্ষম।
দু। তা হ'লে জীবন মম রক্ষা কর তুমি।
রা। কোন্ যুক্তি বলে তুমি করুণাভাজন?
কিছুতেই নহে—জান না আমার পক্ষ
হইতে যখন আবেদন পত্র শত
পেয়েছিলে করে—হাসিয়া ঘৃণার হাসি
বলেছিলে তুমি—ন্যায় দণ্ডে দণ্ড দিব
তার—করিব না দয়া কভু। ন্যায় দণ্ড
পড়ুক এখন তবে তোমার উপর।
দু। কে আছ? কে আছ? খুন! খুন! দস্যু! দস্যু!
(দুর্গাধিপের পশ্চাতে রাঘবের অনুসরণ—স্মৃতিস্তম্ভ
পার্শ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৌশল্যার
উভয়ের মধ্যে অবস্থিতি।)
রা। কে তুমি? কে তুমি? কথা কও—একি, একি,

জীবন্ত নারীর একি সত্য আবির্ভাব ?
কথা কও, কথা কও, তবে কি এমনি,
মানসিক বিকারের কল্পিত মূরতি ?
অথবা এ ঘোর নিশা—ভীষণ ঘটনা
অটল প্রতিজ্ঞা হ'তে করিতে আমায়
বিচলিত—আহ্বানিয়া এনেছ ইহারে।
বাক্‌শক্তিহীন এবে অচল মূরতি !
এ কি তবে দৈব বিপর্য্যয় ?

( ভূমিতলে কৌশল্যার সজোরে পদক্ষেপ ও কতকগুলি প্রহরীর প্রবেশ। )

সব নষ্ট
হ'ল শেষ এক নারী হ'তে !

কৌ। হেথা হতে
লয়ে যাও দস্যুটাকে ধরি।

রা। দেখা যাবে,
নিশাশেষ হয়নি এখনো।

( রাঘবকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।)

কৌ। বিমোহিত
এখনো যে তুমি।

হু। শিথিল এ দেহ বটে
গাঢ় নহে এখনো শোণিত। ধমনীর
মাঝে বহিতেছে ধীরে! জানি না কে তুমি—
শরীরী অথবা তুমি সুখী অশরীরী ?
কণ্ঠস্বরে শরীরীর দিতেছে প্রমাণ—
অদ্ভুত প্রকাশ তব হেরি অকস্মাৎ
অশরীরী হতেছে প্রতীতি। যার স্মৃতি-
স্তম্ভ ওই রয়েছে গঠিত—অদৃষ্টের
ঘোর এই দুর্য্যোগ-সময়ে—তার বেশে
আবির্ভূত হ'য়ে অনিবার্য্য হত্যা আজি
ব্যর্থ করে দিলে। মৃত্যুপথে পাঠাইলে
আসন্ন মৃত্যুরে।

কৌ। নহি প্রেতমূর্ত্তি আমি
তাহারি শরীরী—যে রমণী সনে তুমি
হবে না মিলিত আর ভাবিয়াছ মনে
প্রাণভরে ভাল যারে বাসিতে সতত
রয়েছ গভীর শোকে যাহার বিরহে
যাহারে লভিতে তব আকাঙ্ক্ষা প্রবল—
অথচ যে আশার অতীত—হের সেই
অভাগিনী সম্মুখে তোমার—

হু। সম্ভব কি ?

কৌ। নিমজ্জিত তরি হ'তে একের উদ্ধার !

হু। জাগিতেছে ধীরে ধীরে স্মৃতি—বটে, বটে,
তুমিই প্রেয়সী মম। উন্মত্ত লহরী
কৃপা করেছিল—

কৌ। আমারে বলিতে দাও।
আনন্দ—প্রবাহ বহি' নয়ন হইতে
ভাসিতেছে স্থির বক্ষে। এ বাহু লতিকা
ধাবিতা তোমারে হৃদে বাঁধিতে সোহাগে
ততোধিক সুখে—যে সুখে বাঁধিয়াছিল
গরজিত সিন্ধুমাঝে কুমার আমার।

( আলিঙ্গন )

হু। নবীন জীবন পুনঃ লভিনু আমরা।
কুমার জীবিত তবে ?

কৌ। জীবিত সে কিন্তু—

হু। বল, বল,—

( প্রহরীর প্রবেশ। )

কি সংবাদ ?

প্র। প্রভু,
আক্রান্ত হয়েছে দুর্গ।

কৌ। ভয় নাই, সৈন্য-
গণে তব রেখেছি প্রস্তুত—বিপক্ষের
অভ্যর্থনা তরে।

হু। আমিও রহিব তবে
সৈন্যগণ সনে। স্মৃতিস্তম্ভ অন্তরালে
থাক নিরাপদে তুমি এবে—যতক্ষণ
এ দুর্য্যোগ নাহি হয় শেষ !

কৌ। আমি যাব
তোমার সহিত—এখনো আমার কাজ
আছে সেইখানে।

হু। এস তবে যাই দোঁহে।

( সকলের প্রস্থান )

৩য় দৃশ্য।

দুর্গের কক্ষ।

(দস্যু ও সৈনিকদিগের যুদ্ধ—দস্যুদিগের পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে সৈনিকদিগের প্রস্থান।)

(কুমারের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ দুর্গাধিপের প্রবেশ।)

দু। আত্মসমর্পণ কর পামর এখন।

(উভয়ের যুদ্ধ—পরাজিত কুমারের পতন ও দুর্গাধিপের তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর—কৌশল্যার প্রবেশ।)

কৌ। ক্ষান্ত হও, এযে তনয় তোমার।

কু। পিতা!

দু। কি আশ্চর্য্য—দৈবের ঘটনা।

কৌ। করিও না
পরিহার কুমারে তোমার, সঙ্গ-দোষে
দুষ্ট বটে—কিন্তু প্রকৃতি এখনো এর
দস্যুভাবে হয়নি গঠিত।

দু। এস বৎস।
(আলিঙ্গন)

কু। বিধাতার অদ্ভুত বিধান! না হতেম
লিপ্ত যদি এ ঘোর কলঙ্কে—মৃত্যু আসি
গ্রাসিত অবাধে যত দুর্গবাসী জনে।
উত্তর তোরণ ভেদি' যে তীর বিক্ষেপ
করি আমি—

দু। ভাল কি হয়েছে তায়?

কু। লেখা
ছিল তাহে—মন্তব্য এ পাপ উদ্যমের।

দু। বাস্তবিক?

কু। যথার্থই যেন।

দু। (স্বগত) বুঝিয়াছি
সন্ন্যাসীর ধাঁধার কারণ! চতুর, চাতুরী-
বলে লিপির উদ্দেশ্য করিল বিফল
ওই আসিতেছে হেথা বন্দী আমাদের।

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ প্রহরী সহ বন্দী দস্যুগণের প্রবেশ।)

দু। (রাঘবের প্রতি)
হতভাগ্য জীব তুমি—দিয়েছ তোমার
পরিচয়—প্রতিহিংসা। কি বলিতে চাও
এবে ধর্ম্মের সমক্ষে?

রা। কিছু নয়; ব্যর্থ
হল উদ্দেশ্য আমার—অনুতপ্ত তাই
আমি।

দু। তবে কি জীবিত রবে বন্ধু হয়ে
মম?

রা। কখনই নহে—শত্রু আমি তব
চিরশত্রু করেছ যখন মোরে—শত্রু-
রূপে মরিব তোমার—এ বাসনা মম।
পদচ্যুত করিয়াছে মোরে, কলঙ্ক-মুদ্রিত
দেহে মানব-সমাজ হ'তে চিরতরে
নির্ব্বাসিত আমি—একাকী গহন বনে
প্রতিহিংসা শুধু মোরে দিয়েছে সান্ত্বনা।
দিবায়, নিশায়, কিবা আলোকে, আঁধারে,
প্রতিহিংসা সাথী মোর—সেই নিদ্রাসুখ,
সেই খেলা, সেই অধ্যয়ন, সেই মোর
হৃদয় স্পন্দন। না পার সাধিতে যদি
দেহ হ'তে প্রাণের বিচ্ছেদ—অথবা, এ
দেহে স্থাপিতে বিভিন্ন আত্মা—জেন স্থির
ঘটিবে না কভু পরিবর্ত্তন আমার।
সম্ভব হইতে পারে কক্ষচ্যুত ধরা
কিম্বা গ্রহগতি রোধ তবু এ হৃদয়
করিবে না স্পর্শ যেন প্রণয় তোমার।

দু। সখা বলি' গণ্য তুমি হইলে আমার
হবে না কি তাহে তব মানের গৌরব?

রা। তৃণতুল্য তুচ্ছ ভাবি তোমার ক্ষমতা।
মূল্যহীন বলে গণি' এ জীবন মম—
তুমি করিয়াছ যশ বিক্ষত আমার;
মহতেরা প্রাণাধিক ভাবে যে কীর্ত্তিরে
সে কীর্ত্তি বিনষ্ট মোর তব আচরণে।
যশঃ - সে যে নব উচ্চ অভিলাষ বিভা—

জীবনের মহিমা—কেতন। যশ ;—সে যে
অমর গৌরব নিধি মর জগতের।
সখ্য ?—সে যে সারল্যের শুভ্র হাসিমাখা
বিকচ আত্মার দিব্য পুলক মিলন।
এ সৌজন্য চাহি না তোমার। লয়ে যাও
বিজন কারার স্তব্ধ আঁধারে আমায়
সেথা বসি প্রাণ খুলে দিব অভিশাপ।

(রাঘবের প্রস্থান।)

কৌ। অটল অচ্যুত হয়ে করিছে বিরাজ
শক্রতা হৃদয় মাঝে—

হু। এখনো হৃদয়
তার নম্র হ'তে পারে। বন্দীদের লয়ে
যাও, শুনিব আবার কাল উহাদের
কথা।

(বন্দীদের লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান)

দাও কর বীরেন্দ্র তোমার—ধর
মোর ধন্যবাদ দুর্গরক্ষা তরে। তব
যোগ্য পুরস্কারে হবে না বঞ্চিত।

(মাধুরীর প্রবেশ)

এস
উদ্ধারিণী মা আমার—

মা। আমি কি এখন
সেই বাচাল গণক ? নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে
স্থান বসতির তরে যার ক্লেদময়
জলাভূমি পারে ?

হু। এ বিস্তৃত রাজ্যে মম
উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখ ভাল করি
মাধুরী আমার। বহুমূল্য রত্ন বলি
যাহা হবে জ্ঞান—নির্দ্দেশ করিয়া দাও
এখনি তোমার করে অর্পিব উল্লাসে।

মা। পিতঃ, করিও না আশান্বিত মোরে—
ঘোর অর্থলোলুপের স্বপ্নাশা হতেও
উন্মত্ত বাসনা মোহে মোহিত যে আমি।
এ রাজ্যসম্পদ—

হু। যাহা ইচ্ছা চাও তুমি।
দয়াময় জানেন অন্তর—সম্প্রদান
করিব এখনি তোমার বাঞ্ছিত ধন।

মা। বাঞ্ছিত আমার, এই বীর প্রজা তব।
বসিলাম জানু পাতি দাও পিত:—আর
এই মাত্র সকরুণ অদ্ভুত কাহিনী
শুনি' চিনিয়াছি—জননী আমার
কর আশীর্ব্বাদ—

হু। মা আমার

মা। এই মনোবাঞ্ছা মোর—আর কিছু নয়।

হু। মা আমার উঠ উঠ দুহিতার তব
উদ্ধারিণী মম, এস স্নেহ আলিঙ্গনে।

মা। পুত্র তব পরিত্রাতা মোর। সমর্পিতা
হয়েছিনু নিধনের তরে ভ্রাতৃকরে
আমি। কিন্তু অবগাহি করুণা-সলিলে
সরল প্রকৃতি তার করে ধরি মোর
বিভীষণ দস্যুবাস হ'তে, অতিক্রমি'
বিপদসঙ্কুল বন—রেখেছিলা
নিরাপদ নিকেতনে—ভবিষ্য-কথক
হ'য়ে এসেছিনু যথা হ'তে।

হু। মুক্ত হল'
আর এক বিস্ময়ের দ্বার। কি আশ্চর্য্য
সহোদরা সহোদর করে পরিত্রাণ
লভিল অজ্ঞাতে। পতিও পাইল প্রাণ
সতী রমণীর তরে। আছে কি জানিতে
আর কিছু ? অথবা আমরা হইয়াছি
উপনীত—বিস্ময়-সীমান্তে। বিচিত্র এ
গভীর নিশায় চল—ভিতরে এখন
আমাদের জীবনের অদ্ভুত কাহিনী
মহাসুখে পরস্পরে করিগে শ্রবণ।

যবনিকা পতন।

# সুখ দুঃখ।

## হেতুবাদ।

"গহনাঃ কর্ম্মণোগতিঃ"

"A just interpretation of nature is sound and orthodox philosophy, whatever we add of our own is apocryphal and of no authority."

জীব মাত্রেই সুখী হইবার জন্য নিয়ত লালায়িত। অথচ স্বল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। আবার কেহ বা স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে বিস্তর সুখ লাভের অধিকারী, কেহ বা বিস্তর আয়াসেও সামান্য সুখ লাভে অসমর্থ, কিন্তু কেহই নিত্যদুঃখী বা নিত্যসুখী নহে। এই সুখ দুঃখের তারতম্য কেন হয়? ইহার কারণ নির্ণয় ব্যতীত প্রতীকার অসম্ভব। এই কারণ এতই জটিল ও দুর্জ্ঞেয় যে, তাহার নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন।

এক শ্রেণীর লোক বলেন, নিজ কর্ম্মফলই সুখ-দুঃখের হেতু। এই কর্ম্মফল ভোগ যেমন ব্যক্তিগত হয়, তদ্রূপ দেশগত বা জাতিগতও হয়। অর্থাৎ একদেশ বা একজাতি কর্ম্মবশে অল্পাধিক সুখ-দুঃখের অধিকারী। তৎপ্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন যে, যদি কর্ম্মবশেই সুখ-দুঃখ-ভোগ হয়, তবে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয় কেন? কেহ বা জন্মান্ধ, কেহ বা আজন্ম দুঃখী, কেহ বা চিরসুখী হয় কেন? তদুত্তরে কর্ম্মফলবাদীরা পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতি-ফল বলেন। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, কর্ম্মফলবাদীর গতি নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যাঁহারা ভগবান্ মানেন, যাঁহারা তাঁহাকে দয়াময় অপক্ষপাতী জ্ঞানময় বলেন, তাঁহাদিগের জন্মান্তর স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ একের দোষে অপরের কষ্ট, অজ্ঞানাবস্থায় কৃতাপরাধে কঠোর শাস্তিভোগ হওয়াকে দয়াময়ের বিধান বলিতে পারা যায় না। তবে যাঁহারা ভগবান্ মানেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই। এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট যে, যাঁহার সৃষ্টির বিষয় সমগ্র অবগত হওয়া মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত, তিনি আমাদের গোচর নহেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিতে যাওয়া নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট বস্তুর অতি সামান্য অংশমাত্রও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি, ইহাতে কত কোটী কোটী মনুষ্য কত প্রকারের কত জীব জন্তু বৃক্ষ লতা জড় পদার্থ আছে, তাহার কয়টি জানি বা কয় জনকে চিনি? ইহার মধ্যে আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব কোথায় বালুকা-কণাবৎ পড়িয়া আছি, আর কত স্বল্প সময়ের জন্যই বা আছি! কত কাল এই পৃথিবী রহিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর কতই বা ঘটিবে, কত জন্মিয়াছে, আর কতই বা জন্মিবে, তাহার মীমাংসা করাই এক প্রকার মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। তাহার পর সৌরজগতের তুলনায় এই পৃথিবীই কত ক্ষুদ্র। কোথায় কোন্ গ্রহে কি আছে বা কি হইতেছে, কে জানে? আর এই সূর্য্য যাহা পৃথিবী অপেক্ষা কত কোটী গুণে বৃহৎ, তাহাই ত একটী চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। আকাশে যে অপরিসীম নক্ষত্ররাজি ঢালা রহিয়াছে দেখা যায়, আকৃতির তারতম্যানুসারে তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহারা এক একটি সম্ভবতঃ এক একটী সৌর জগৎ লইয়া আছে। সূর্য্য তাহাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে তুমি আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব! তাহা যে কল্পনাতেও আসে না। আবার স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মের দিকে দেখ, কত কীটাণু আমাদের দেহেই আছে, তাহাদিগকে যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না, সুতরাং তাহারাই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদেরও দেহে শিরা-ধমনী প্রভৃতি আছে, হয় ত তাহাদের দেহেও অনুরূপ সূক্ষ্মতম জীবপুঞ্জ বাস করে। সে সকলের নিকট আমাদের দেহই এক এক প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। তাহাদের জীবনের সীমার সহিত তুলনায় এক এক দিনই অনন্ত কাল স্বরূপ। এই চক্ষু-বিষয়াতীত স্থূল-সূক্ষ্মের কর্ত্তাকে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি না বলিয়া তিনি নাই বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

পক্ষান্তরে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কাছে তিনি প্রত্যক্ষস্বরূপ। কেবল স্রষ্টা বলিয়া

তাঁহারা তাঁহাকে জানেন না। পরন্তু, দয়াময়, বিপদভঞ্জন, শান্তিদাতা, রক্ষক বলিয়াই জানেন। কেবল দেখিতে জানিলেই দেখা যায়, জানিবার চেষ্টা করিলেই জানা যায়। ভক্ত পদে পদেই তাঁহার দয়া দেখিতে পান। যাহা আমার নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অনেক সময় তাহা দুর্লভ হইলেও অযাচিত অতর্কিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই ভক্ত দেখেন যে, তাহা দয়াময়ের দয়া মাত্র। কত বার কত বিপদে পড়িয়া কাতর স্বরে দয়াময় বলিয়া ডাকিয়া সহজে সে বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া গিয়াছে। হয় ত বিস্তর চেষ্টাতেও তাহা হইত না। তখন তাহা দয়াময়ের কার্য্য বলিয়াই জানা যায়। যদি বল, সকল সময়ে ত তাহা হয় না! আমি বলি, সেখানে গুরুতর কর্ম্মদোষ আছে, তাহা আমরা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তীব্রতর আবেগের সহিত নিতান্ত কাতর ভাবে ডাকিলে যে বিপদের লাঘব হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন চিত্ত কিছুতেই শান্ত হয় না, নিতান্ত বিমর্ষ ও অবসন্ন হয়, তখন একমাত্র তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শান্তিদাতা ভিন্ন কেহই সে শান্তি দিতে পারে না। যদি বল যে, উহা সংস্কার-বশে হয়, সকলের হয় না; তাহা হইলে আমি বলি যে,যাহার সে সংস্কার নাই, সে নিতান্ত হতভাগা। আমি সকল সংস্কার ছাড়িতে পারি, কিন্তু এমন সংস্কার ছাড়িতে চাহি না। অনেক সময়ে অনেকে ভক্ত সাধুর অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারে না, তাহার উদাহরণ বিস্তর আছে। কে তাঁহা-দিগকে রক্ষা করে? অনেক সময় নিজে কত অন্যায় কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছা এবং বিশেষ চেষ্টাও করিয়া তাহা করিতে পারি নাই, কোথা হইতে অভাবনীয় প্রতিবন্ধক আসিয়া বাধা দিয়াছে। তখন তাহা কাহার কার্য্য বলিব? আমি বলি, সেই হরি আমায় রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ পদে পদে যখন তাঁহার কার্য্য ও দয়া দেখিতে পাই, তখন সহস্র পণ্ডিত আসিয়া অন্যরূপ বলিলেও আমি তাঁহাদের কথায় অণুমাত্র আস্থা করি না।

এ বিষয়ে এ স্থানে অধিক বলিবার স্থান নয়। যাহা বলিতেছিলাম, তাহা এই যে, কোনও ভাগবত ব্যক্তি তাঁহাকে দয়াময় জনিয়া আজন্ম দুঃখের হেতু কি নির্ণয় করেন? এক জনের দোষে অপরকে কষ্টভোগ করিতে হয় বলা সঙ্গত মনে করেন কি? তাহা মনে করাও যত দূর সঙ্গত, আর অজ্ঞান মানব কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্যক্ না জানিয়া একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলার জন্য অনন্ত নরকভোগ করিবে বলাও ততদূর সঙ্গত। ভগবান্ এমনই অবিচারক যে একজন সাধুপুরুষ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা না মানিয়া অপর সহস্র মহাপুরুষের আদেশ বহন করিয়া সৎপথে থাকিলেও অনন্ত নরক! কি ভয়ঙ্কর কথা! মানবের মুখে এ কথা শোভা পায় না।

আর এক কথা। যে শিশু হাসিতে শিখে নাই, জাগ্রদবস্থায় হাসে না, সে স্বপ্নে হাসে, কাঁদে, জ্ঞানী লোকের মত দেখে কোথা হইতে? শিশুর দেয়লা দেখিলে তাহা অকারণ মুখভঙ্গি বিশেষ বলিয়া অনুভব করা যায় কি? তাহা অপেক্ষা ইহাকে জন্মান্তরীণ সংস্কার বলিলে পরিষ্কার কথা হয় না কি? যে শিশু পড়িয়া গেলে কি হয় তাহার কিছুই জানে না, তাহাকে হঠাৎ উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়া দিবার মত করিলে সে চমকিয়া নিকটস্থ বস্তু ধরিতে চাহে। দুই সহোদরের বুদ্ধির এবং শিক্ষা-গ্রহণ-শক্তির বিস্তর তারতম্যও সময়ে সময়ে দেখা যায়। তাহারা এক পিতামাতার একই অবস্থার সন্তান হইলেও, একই প্রণালীতে একত্র শিক্ষিত হইলে, এরূপ প্রকৃতি-ভেদ কেন হয়? এক জন্মান্তরীণ সংস্কার বলিলে এ সকল কথায় যত সহজ মীমাংসা হয়, অন্য কোনও কষ্টকল্পিত কারণ প্রদর্শনে কখনই তত সহজ মীমাংসা হয় না। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করিতে না চাহেন, তাঁহারা স্বাধীন চিন্তাশীল বলিয়া বোধ হয় না, বরং কুসংস্কারাবদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ সুখদুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে জন্মান্তর ও জন্মান্তর-কৃত সুকৃতি দুষ্কৃতিকে ইহজন্মেও ফলপ্রসবিনী স্বীকার করাই সহজ উপায়। জন্মান্তর স্বীকার করিলে ডারুইন প্রভৃতি আধুনিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের জ্ঞানগর্ভ মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচারের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

এক্ষণে আমরা সদসৎ কর্ম্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। অপরের প্রতি কোনরূপ ব্যবহার করিবার সময় আপনাকে ঠিক তদবস্থ মনে করিয়া লইলে যদি সেই ব্যবহার কষ্টকর বোধ হয়, তবে তাহা কায়মনোবাক্যে করাই পাপ, দুষ্কৃতি বা অন্যায় কার্য্য। এবং তাহা সুখকর বোধ হইলে তাহা

পুণ্য, সুকৃতি বা ন্যায্য। নিজের সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। স্থূল কথা, নিজের বা অপরের প্রতি কোনও অন্যায় কার্য্য করাই দুষ্কৃতি, ও সুকৃতি তদ্বিপরীত। এই কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝান আবশ্যক।

ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বপ্রেমই ভগবানে প্রেম। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ তাঁহাতেই বিদ্বেষ করা মাত্র। কাহারও ইষ্টসাধনে তাহার প্রীতি ভগবৎ প্রীতিস্বরূপ, এবং সেই প্রীতির প্রতিঘাত ইষ্টকর্ত্তাতে আসিয়া তাহারও যেমন আনন্দ জন্মায়, কাহারও অনিষ্ট-সাধনে তাহার ক্লেশেও তদ্রূপ প্রতিঘাত আসিয়া অনিষ্টকারীর ক্লেশের কারণ হয়। এই ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়ম (action and its reaction) নিত্য, এবং উক্ত সুখ-দুঃখ-তত্ত্বও অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রত্যক্ষ পরিদর্শন দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

ইহার মধ্যে আর এক তত্ত্ব আছে; কায়মনোবাক্য দ্বারা যে কোনও শুভাশুভ কার্য্য আচরিত হয়, তাহার ফল কায়মনোবাক্য দ্বারাই ভোগ হয়। অর্থাৎ আমি কাহারও দেহে ক্লেশ দিলে আমাকে দেহেই ক্লেশ পাইতে হইবে, মনে মনে কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা করিলে মনেই ক্লেশ পাইব, এবং কাহাকেও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া ক্লেশ দিলে তৎপরিবর্ত্তে বাক্যযন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য মন যে সমস্ত দুঃখেরই ভোক্তা তাহার কোনও সন্দেহ নাই বটে, তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, কাহারও দেহ পীড়িত করিয়া মনঃকষ্ট এবং দেহকষ্ট প্রদান করিলে সেই পথেই তাহার প্রতিশোধ হইবে; কিন্তু কেবল মনে মনে মন্দ চিন্তা করিলে মনে মনে কষ্ট পাইব মাত্র, দেহে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি কথা বলি, যদি কাহারও মৃত্যুকামনা করি, কিন্তু মারি না, তাহা হইলে আমার প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত ক্লেশ মনে মনে পাইতে পারি, কিন্তু নিজ দেহে ক্লেশ পাইব না, বা দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে না। যদি বলেন যে, আমার দুশ্চিন্তার জন্য প্রিয়জনের মৃত্যু হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে তাহার কর্ম্মফলে জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিবে, তাহার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব না থাকিলেও উহাতে আমার যে কষ্ট হইবে, তাহাই আমার কর্ম্মফল ভোগ। ইহাই সংসারের নিগূঢ় তত্ত্ব। ইহা না জানাতেই লোকে ভ্রান্ত হয়, এবং ক্লেশাদি ভোগ করে। আমি ট্রেণে যাইতে যাইতে পার্শ্ববর্ত্তী অপর ট্রেণ হইতে কোনও দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে আহত হইলাম। লোকে দেখিল, আমি অকারণ কষ্ট পাইলাম, হয় ত আমিও মনে মনে তাহাই ভাবিলাম; কিন্তু প্রায়ই অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে,আমিও একদিন ঐরূপ অতর্কিত ভাবে কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি। হইতে পারে বালস্বভাব-সুলভ চপলতাবশতঃ আমি ঐ কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু করিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। কেহ বলিবেন যে, রাজা কত লোকের প্রাণদণ্ড করিতেছেন, কত ধনী লোক কত লোককে দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন, কৈ তাহার প্রতিশোধ কোথায়? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন সকল সুখদুঃখের ভোক্তা। রাজা স্বহস্তে কাহারও দেহপীড়া দেন না, কিন্তু তাঁহার কার্য্য দ্বারা অন্যের যে কষ্ট হইল তাহার ফলে তাঁহার মনঃকষ্ট হইবেই হইবে। তবে রাজ্যরক্ষার জন্য অর্থাৎ অপর বিস্তর লোকের রক্ষার্থ সদভিপ্রায়ে যে দণ্ড প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য মানসিক কষ্ট কখনই অন্যায়কৃত প্রাণদণ্ডের সমান হইতে পারে না। কর্ত্তব্যানুরোধে নির্লিপ্তভাবে কৃতকার্য্য ভগবানের কার্য্য করা মাত্র। আর ধনী লোকে কাহাকেও অযথা বাক্যযন্ত্রণা দিলে যে, শ্রুতিকটু কথার দ্বারা তাহায় মনঃকষ্ট হইতে পারে না, তাহা কখনই নহে। মনঃকষ্টের পরিমাণ অবশ্যই সমান হইবে। তবে কাহার কোন্ কথায় কত দূর মনঃকষ্ট হয়, তাহাই বিবেচ্য। আমি এক জনকে দারুণ দুর্ব্বাক্য বলিলে তাহার যে পরিমাণে মনঃকষ্ট না হয়,হয় ত আমাকে একটি সামান্য কথা বলিলে তাহার সহস্র গুণ যন্ত্রণা হয়। কথার পরিমাণে মনঃকষ্টের পরিমাণ স্থির করা যায় না। মনে প্রাপ্ত আঘাতের পরিমাণ সমান হইলেই হইল। এই সামঞ্জস্য এইভাবে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

তবে এইখানে পূর্ব্বজন্মের কথা পাড়িতে হইল। অধিকাংশ স্থলে ইহজন্মকৃত দুষ্কৃতির ভোগ হইলেও কোনও স্থলে ইহজন্মপ্রাপ্ত সুখদুঃখের কারণ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। যথা, জন্মায়ু প্রভৃতি আজন্ম ক্লেশাদি। পাতঞ্জল বলেন—"ক্লেশঃ কর্ম্মবিপাকঃ দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ।" অর্থাৎ ইহজন্ম অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে ক্লেশাদি

হয়। যাঁহারা বলেন যে, যখন ইহজন্মে কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না, তখনই পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়া জন্মান্তর স্বীকার করি কেন? তাঁহাদের কথার উত্তর এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা অপেক্ষা সঙ্গত কারণান্তর নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। আমরা বলি, আমাদের শাস্ত্রও বলে, অদৃষ্ট জন্মে যাঁহারা ঘোরতর দুষ্কৃতি করেন, তাঁহাদের অশুভ ফল তজ্জন্মে ভোগ হওয়া অসম্ভব হইলে কোথায় ভোগ হইবে! প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, একজন ভয়ানক অত্যাচারী উৎপীড়ক অনেককে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া হয়ত নিষ্ঠুররূপে বিস্তর লোকের প্রাণ, ধন, ধর্ম্মাদি হরণ করিয়া অাত্মহত্যা দ্বারা অথবা অন্য কর্ত্তৃক হত হইয়া হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিল; হয় ত কোন দুর্ব্বৃত্ত, আজন্ম লোক-পীড়া দিয়া অর্থাদি বলে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, এবং তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ বলিল যে "লোকটা যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ভোগ হইল কৈ?" তাহার উত্তরে 'জন্মান্তরে দারুণ কষ্টভোগ করিবে বলা ভিন্ন সদুত্তর কই? যেমন কতকগুলি দুষ্কৃতির ফল দেখান যায় না, তেমনই কতকগুলি ভোগেরও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাই জন্মান্তর স্বীকারের পক্ষে একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। নচেৎ দয়াময়ের রাজ্যে অবিচারের সংশয় হয়। তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদি কায়মনোবাক্যের কৃত শুভাশুভ কার্য্য সুখদুঃখ রূপ ফল প্রসব করে, তবে দুঃখ পরিহারের উপায় সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ না করিলে কখনই দুঃখ পাইতে হইবে না, পরন্তু শুভক্রিয়া-চিন্তাদি সুখময় ফলপ্রসবিনীই হইবে। অবশ্য জন্মান্তর কৃত কার্য্যের ফল-ভোগ পরিহার করা যাইবে না। তবে অধিকাংশ স্থলেই সে ফল অল্পই ভোগ করিতে বাকী থাকে। ইহা সকলেই, অন্ততঃ যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

এক্ষণে গুরুতর কথা এই যে, এই কায়মনোবাক্য সংযম শুনিতে যত সহজ, কার্য্যকালে তত সহজ হওয়া দূরে থাকুক বিষম কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কারাদি বশে মানব-স্বভাব এতই বিকৃত হইয়াছে যে, আপনাকে পবিত্র করা বড়ই কষ্টকর হইল বোধ হয়, বিশেষতঃ মনকে ভাল করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এইজন্যই অর্জ্জুনের মন শাসন দুরূহ সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া বোধ হয়।

অতঃপর আমরা চিত্তশুদ্ধির উপায়াদি সম্বন্ধে সময়ান্তরে বলেব। এই বিজ্ঞানই আমাদের দেশের গৌরব। ইহা অন্য অপর সকল দেশেই অবিদিত। পাশ্চাত্য বিদ্যার পক্ষপাতিগন তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক না বুঝিতে পারায় অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এই বিজ্ঞান উপেক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই এমত শ্রেষ্ঠতম দেশীয় বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই বিলুপ্তপ্রায় পরম তত্ত্বের পুনরুদ্ধার বা সংস্কার-কল্পের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষা এবং ঘৃণা করিয়াই আসিয়াছেন। অবশিষ্ট লোকের অধিকাংশই অপণ্ডিত, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারাও কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিক্ষিত লোকেরও একটু একটু চটকা ভাঙ্গিতেছে। আশা করি, কালে এদেশের কুসংস্কার অপধর্ম্মাদি দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোকে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

## জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ।

নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে যে সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার পথ অপ্রশস্ত ছিল—যখন দিগ্বিজয়ী বৃটিশ বীরকেশরীর বিশিষ্ট বিক্রম পরিদর্শন করিয়াও এদেশে প্রজা-সাধারণের চিত্ত ইংরাজি ভাষার দিকে সম্যকরূপে আকৃষ্ট হয় নাই—বঙ্গভূমির সেই দূরবর্ত্তী অন্ধকার সময়ে এমন এক একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, এমন এক একজন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী পুরুষ-

সব দেখাইতেছে। স্নেহময়ী সরলা দিদিও ভগিনীর ঈদৃশ আগ্রহ ও যতনে পরম প্রীতিলাভ করিতেছে, স্বামীর নিকটও জানাইতে ভুলিতেছে না। এইরূপ বেজগাঁয়ে দিন, মাস, বৎসর কাটিতে লাগিল।

( ২ )

সরলার বিবাহের পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরলা এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া নবযৌবনভারদর্পিতা যুবতী স্বামীপ্রেমে সদা প্রফুল্লাননা। সুভাসিনীরও বয়স এগারতে পড়িয়াছে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; সব বিষয়েই সে সেই ৭ বৎসরের সুভাসিনীই আছে। বোস্ মহাশয়ের উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সুভাসিনী আর সকলের নিকট কিছু উদ্ধত-প্রকৃতি, খাতির নাদারৎ' রকমের কিন্তু সরলা দিদি আর বোস মহাশয়ের কাছে সে সর্ব্বদা নতশির, কেহ যে কাজ তাহার দ্বারা করাইয়া লইতে পরিতেছে না বোস মহাশয় দুই এক কথাতেই তাহা করাইতে পারেন; বোস মহাশয়ের মাথা ধরিলে সে আর পাঁচটি বালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া বোস্ মশায়ের সুশ্রূষা করে, যতক্ষণ না তিনি সুস্থ হন ততক্ষণ এক পা নড়ে না আহার নিদ্রাতেও তার ইচ্ছা থাকে না। সকলে বলিত 'বোস মহাশয় তোকে যাদু করেছে।' সে অমনি দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করিত "যাদু কাকে বলে দিদি!"

নিকুঞ্জ সুভাসিনীর ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দেখিলেন সুভাস তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতে জল, তামাক, পান, ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; বসিবামাত্র সুভাস পাখা হাতে করিয়া বোস মশায়কে বাতাস দিতে আরম্ভ করিল; নিকুঞ্জ ডাকিলেন "সুভা, ভাল আছিস্ তো?" নীরবপুত্তলিকার ন্যায় সুভাস বাতাস দিতে লাগিল। নিকুঞ্জ জানেন প্রথম প্রথম সুভাসের মুখ খোলা শক্ত, তিনিও কেমন করিয়া মুখ খোলাইতে হয় তাহা জানেন, বলিতে লাগিলেন "একেবারেই ভুলে গাছিস্, তাও যাক্, আবার মানুসের কাছে আমার নিন্দে করতে আরম্ভ কোরেছিস্? এ জানলে কখন আস্তাম না, আমরা না হয় খারাপই আছি তা মানুষের কাছে অমন নিন্দে করে কাজ কি? একটা গুণবান্ দেখে বোনকে আবার বে দাও না কেন?" নিকুঞ্জ মুখখানি গভীর দুঃখাবনত করিয়া মাটীর দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন; চোক দুটি ছল ছল করিতে লাগিল, আর কি সুভাস থাকিতে পারে এত বড় একটা মিথ্যা কথার প্রতিবাদ না করিলে বোস মহাশয়তো সব বিশ্বাস করিবেন, সুতরাং কথা ফুটিল -একটু জোরেই ফুটিল—"কার কাছে আমি নিন্দে করেছি! আমি আপনার নিন্দে করবো! আপনার পায়ে পড়ি বলুন কে বলেছে এ কথা!"

নিকুঞ্জ পূর্ব্ববৎ ভারি গলায় বলিলেন "হ্যাঁ তাই বলি আর তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া কর আর কি।" "তা সে এমন মিছে কথা বলে কেন? বলুন আপনি কে বলেছে।" ঔৎসুক্যের সহিত সুভাসিনী বলিল। "তোমার দিদিই বলেছে" নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিলেন। সুভাস তখন বুঝিতে পারিল নিকুঞ্জ রহস্য করিতেছেন, হাসিয়া বলিল "এত রঙ্গও জানেন আপনি।"

এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে নিকুঞ্জবিহারী বাবু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন সুভাসিনী অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ভালবাসে। যতক্ষণ তাঁহার কাছে সে থাকে ততক্ষণ তিনি অন্য দিকে তাকাইলেই এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, সে সরল প্রশান্ত দৃষ্টি কেবল স্নেহমাখা কেবল প্রীতিপূর্ণ তাহাতে বিলাসের চিহ্ন নাই, বিভ্রমের উত্তাপ নাই চপলার চাঞ্চল্য নাই কেবল বালিকার তুষার ধবল সারল্য জ্যোৎস্নায় তাহা সদা উদ্ভাসিত। নিকুঞ্জ নিদ্রার ভাণ করিয়া দেখিয়াছেন সুভাস এক দৃষ্টিতে তাঁহার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া আছে, সময় সময় দেখিতে দেখিতে সে এত আত্মবিস্মৃত হয় যে কাহারও ডাক শুনিতে পায় না, কি জানি সে কি দেখে, কি ভাবে! তাহার কাছে থেকে সে ভাব উদ্ধার করা নিকুঞ্জের ক্ষমতার অতীত।

নিকুঞ্জ এইবার এই সব ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ যেন কি ভাবিলেন—ভাবিতে ভাবিতে কিছু গম্ভীর হইয়া গেলেন, সুভাসিনীর শত চেষ্টা পরাস্ত হইল, তিনি প্রফুল্ল হইলেন না। মুখখানি ভার করিয়া অগত্যা সুভাস দিদির কাছে গিয়া নালিশ করিল "বোস মহাশয় মিছামিছি আমার উপর রাগ কোরেছেন।" বালিকার স্বরে সরলা বুঝিল সে আন্তরিক আঘাত পাইয়াছে। "না, না, তোর ওপর কি তিনি রাগ কর্ত্তে পারেন, আর যেন কি মনে

হয়ে অমন ভাব্‌ছেন, তুই কিছু মনে করিস্‌ না” বলিয়া ভগিনীকে প্রবোধ দিল।

( ৩ )

“তুমি নাকি স্থভাসের উপর রাগ কোরেছ” রজনীতে স্বামীগৃহে আগমন করিয়া প্রণাম পুরঃসর সরলা স্বামীর প্রতি প্রশ্ন করিল।

নিকুঞ্জ হাসিয়া উত্তর দিলেন “এরি মধ্যে নালিশ হয়েছে। তা আসামী হাজির যে শাস্তি হুজুরের খুসী হয়, বিধান কর্ত্তে আজ্ঞা হয়।”

সরলা উপবেশন করিয়া বলিল “কথার ছিরি দেখ। বলি সত্যি নাকি তাই বল! ছেলে মানুষ, সে তো কেঁদেই খুন।”

ঠাট্টার স্থরে নিকুঞ্জ বলিলেন “বটে, এতদূর বল কি?”

সরলা হাসিয়া কহিল “ঠাট্টা নয়, সে তোমাকে যে ভালবাসে।”

“সেই জন্যেই ত আমি রাগ করেছি। সে আমাকে ভালবাসবে কেন? তা পারবে না। তার একটা ভাল বাসার লোক যোগাড় করে দাও না কেন? তোমার উপর ভাগ বসাতে দিচ্ছ কেন!”

সরলা। বাঃ! ভালবাসা বল্লেই বুঝি তাই বুঝ্‌তে হবে। অমনি অমনি বুঝি ভালবাসা যায় না। ভাই বোনে বুঝি ভালবাসা থাকে না, কেমন?

নিকুঞ্জ। থাকবে না কেন? তবে রকম ফেরও ত হতে পারে। যাক্‌ ঠাট্টায় কাজ নাই, বলি স্থভার বিয়ের চেষ্টা কিছু হচ্ছে কি?

সরলা। হ্যাঁ, হচ্ছে একরকম ঠিকও হয়েছে, সে সব বাবা তোমাকে বলবেন।

নিকুঞ্জ ঔৎস্থক্যের সহিত বলিলেন “বটে! বেশ, বেশ কোথায় হচ্ছে? ছেলেটি কি করে?”

সরলা। এই শোভারামপুরের মজুমদারদের ঘরে। বেশ জোতজমা আছে, বাড়ীতে চকমিলান দোতালা কোঠা, ছেলেটিও বি, এ, পড়ছে, দেখতেও বেশ! সে মেয়ে দেখে খুব পছন্দ কোরে গেছে, বাবা গরীব কিছু দিতে পারবেন না কিন্তু তারা খুব ভদ্রলোক, বাবাকে কিছুই চাপ দেয় নি! এখন ভগবানের ইচ্ছেয় হয়ে গেলেই হয়।

নিকুঞ্জ। বেশ হয় কিন্তু একটু খট্‌কা লাগ্‌ছে যে!

সরলা। কি?

নিকুঞ্জ। এমন অবস্থা, এমন ঘর, এমন ছেলে, আর এমন বাজার, এতে যে একেবারে খালি হাতে তারা রাজি হোল ছেলেটার স্বভাব টভাব ভাল তো?

সরলা। হ্যাঁ, সে সব বেশ ভাল! আমরা দেখেছি তাকে, বাবাও খোঁজ নিয়েছেন, কোন বদনাম কিছু শুন্‌তে পাননি। খালি হাতে তোমরা রাজি হয়েছিলে না?

নিকুঞ্জ। তা না হলেই ভাল! স্থভার বে'টা শীগ্‌গীর দিয়ে ফেলাই ভাল।

সরলা। কেন? কেন বল দেখি!

নিকুঞ্জ বলিলেন বোকার ডিম, বুঝ্‌তে পারলে না? শেষে তোমার বাড়া ভাতে চাই পড়তে পারে।

সরলা। ওসব ঠাট্টা রাখ আমার ভাতের এমন তেজ যে ছাইএর বাবার সাধ্যিও নেই যে কাছে ঘেঁসে।

নিকুঞ্জ হাসিয়া কহিলেন “বেশ, বেশ, কিন্তু আমি ঠাট্টা কচ্ছি না আমি বেশ বুঝেছি স্থভা আমাকে খুব ভালবাসে; কি জানি বেশীদিন এমন থাকলে শেষে তার মনে কি দাঁড়ায়, কিছুই তো বলা যায় না এখন থেকে বিয়ে দিয়ে দিলে সে আশঙ্কাটা থাক্‌বে না অথচ আমার প্রতি স্নেহ ভালবাসা ঠিকই থাক্‌বে।

সরলা একটু কাছে ঘেঁসিয়া মৃদুস্বরে বলিল ঠিক বলেছ, কথাটা আমি তলিয়ে বুঝি নাই, ঠিক ঠিক! তোমার প্রতি ভালবাসাটা তার অন্য রকমেরই বটে, দেখ তোমার চেহারা, ব্যভার, চাল চলন যেমন যেমন তাই তার কাছে সব ভাল, আর সব ভাল নয়। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হচ্ছে তার গায়ের রং কাল, মুখেও গোঁপ আছে দাড়ী নাই তাই ঠান্‌দিদি স্থভাকে বল্লেন, “নে, তুই যেমন কাল চাস্‌, তাই হয়েছে, খুব মনে ধরবে;” স্থভা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল “অমন কাল আমি পছন্দ করি না।” গোঁপের কথায় বলিল “গোঁপ অনেকেরই আছে, কিন্তু বোস মশায়ের যেমন গোঁপে মুখের শোভা এমন আর কারও নয়।”

সকলে শুনে তো হেসে খুন, কেউ কেউ কালামুখী বলে গালও দিল। এই সেদিন কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “বল দেখি স্থভা কাকে তুই সকলের চেয়ে স্থন্দর দেখিস;” তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল

"বোস মশায়কে।" তোমার চলন, শোয়া, বসা, হাসা, খাওয়া, সব সে এত খুঁটিয়া লক্ষ্য করে যে আমিও হার মানি। আমার তো ভয় হয় তার মনে বুঝিবা একটা ছাপই পড়ে গেছে।

নিকুঞ্জও হাসিয়া বল্লেন "এই যে বল্লে সে ভয় নাই!" সরলাও হাসিয়া বলিল "বা! তোমার জন্যে বুঝি! তার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ভাবিয়া। এখনও সে বালিকা কিন্তু মনে মনে যদি এত স্নেহ ভালবাসা অমন করে পোষে তবে ভবিষ্যতে কি হবে ভাব দেখি! আমিও যেমন জগতে তোমাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখি, সেও তেমান!" নিকুঞ্জ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তাহলে সে প্রকৃতই হতভাগিনী!"

পার্শ্বের দেওয়াল হইতে ভবিষ্যৎবাদী টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল "ঠিক, ঠিক, ঠিক্।" দম্পতি একটু চকিত হইলেন। আর কোন কথা হইল না। টিকটিকি কি ভবিষ্যৎ বলিতে পারে?

( ৪ )

সুভাসিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সময় সুভাসিনীর বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। বিবাহে নিকুঞ্জ বাবু উপস্থিত ছিলেন এবং বিবাহের আলেপনা দেওয়া হইতে সুভাসের শাঁখা পরাণের কাজ পর্য্যন্ত সবই তিনি করিয়াছিলেন। সকলেই উৎসাহিত, সকলেই আনন্দিত কিন্তু 'যার বিয়ে তার মনে নাই।' সুভাসিনী বিবাহে আনন্দিতাও নহে, বিষাদিতাও নহে, যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, সে অন্য সকলকে ছাড়িয়া বিবাহ কাল পর্য্যন্ত প্রায়ই নিকুঞ্জের কাছেই ছিল। নিকুঞ্জ সুভাসিনীর এই উদাসীন ভাব যে লক্ষ্য করেন নাই তাহা নহে। কতবার নির্জ্জনে সুভাসকে বর পছন্দ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, স্নেহ করে তাহার আনতানন উন্নমিত করিয়া তাহার সম্মুখে বরের সৎগুণাবলীর অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তথাপি সুভাসের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরেই সুভাসিনী তাহার বড় বড় চোক ছুটি নিকুঞ্জের মুখে স্থাপন করিয়া একটু মলিন হাসি হাসিয়াছে, অমনি আবার মুখ নমিত করিয়াছে। বিশেষ কারণবশতঃ সরলা এ বিবাহে পিত্রালয়ে আসিতে পারে নাই; সে জন্য নিকুঞ্জের মন পূর্ণ আমোদ উপভোগ করিতে পারিতেছে না, তার উপর সুভাসের এই ভাব দেখিয়া তাঁহার মন আরও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

বিবাহ শেষ হইবার পরে বাসর ঘরে থাকিবার সময় সুভাস কত কাকুতি করিয়া নিকুঞ্জকে তাহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল নতুবা তার ভয় করিবে। নিকুঞ্জ নানারূপে বুঝাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সুভাস অগত্যা বাসর শয্যায় ঠান্‌দিদির কোলের মধ্যে কোনরূপে নিশি যাপন করিয়াছিল। সুভাসের বর সেই বিবাহের রাত্রিতেই নিকুঞ্জের সম্মুখেই সুভাসকে অনেক প্রেমের কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের 'দম্পতীর প্রেমালাপের' এক অংশের অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন এমন কি স্বীয় প্রণয় রহস্যের গভীরতা জ্ঞাপন করিবার জন্য সুভাসের অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিলেন এবং যদৃচ্ছাগতা একটী মার্জ্জারীকে ধরিয়া সুভাসের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এদিকে নিকুঞ্জ বিশ্বস্তসূত্রে সেই রাত্রিতেই শুনিয়াছিলেন 'বর অতিশয় ভ্রষ্ট চরিত্র এবং তজ্জন্য কুৎসিত পীড়াগ্রস্ত।' শুনিয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল এবং সুভাসের অদৃষ্ট ভাবিয়া তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর নিকুঞ্জ বেজগাঁ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং সরলাকে গিয়া সব বৃত্তান্ত বলিলেন। সরলার স্নেহপ্রবণ মন যে কিরূপ হইল তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন।

দ্বিরাগমনের সময় বাটীর সকলে মিলিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সুভাসকে তাহার স্বামীর গৃহে লইতে পারে নাই; নিকুঞ্জ সেখানে ছিলেন না; অন্য সকলে প্রথমে খোসামোদ ও স্নেহবাক্য এবং তৎপরে মুষ্টিযোগ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে বরের গৃহে লইতে পারে নাই। সুভাসিনীর যেন দৃঢ়সঙ্কল্প যে সে বরের ছায়াও মাড়াইবে না। স্বার্থপ্রযত্ন হইয়া সকলে তাহাকে কত গালাগালি দিয়াছে তাহাতে অভাগিনী কোনও কথা বলে নাই, নীরবে সব সহ্য করিয়াছে। সুভাসের প্রেমিক বর নিরাশ হইয়া রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার সমস্ত রাগ বেচারা নিকুঞ্জের উপর চাপাইয়াছে। তার জন্যও সুভাসকে কম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। নিকুঞ্জকে লইয়া সুভাসকে

সবাই ঠাট্টা করে, গালি দেয় এজন্য সুভাস আজকাল নিকুঞ্জের বিষয় লইয়া বেশী কথা বলে না কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ের স্নেহ যে দিকে ধাবমান, সেদিক হইতে তাহাকে কেমন করিয়া ফিরাইবে? নিকুঞ্জের পত্রখানি আসিলে সুভাস কত আগ্রহে ছুটিয়া গিয়া তাহা পাঠ করে, তৎক্ষণাৎ তার উত্তর লিখিবার জন্য উদ্যোগী হয় কিন্তু স্বামীর কোন পত্র আসিলে সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না, দশ জনের অনুরোধে, গালাগালি প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া অন্যের ভনিতা অনুযায়ী জবাব দেয় মাত্র।

বিবাহের কয়েকমাস পরে সরলা আসিয়া সুভাসিনীকে কত বুঝাইয়াছে, সুভাস কোনও উত্তর করে নাই। সুভাস বড় চাপা, মনের ভাব কাহাকেও বলে না। বাহিরে তাহার কোনই পরিবর্ত্তন নাই, সেই উচ্চ হাসি, ছুটাছুটী, ঝগড়া বিবাদ সবই একই ভাবে রহিয়াছে যেন কোথাও কিছু নাই। যদি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে কোনও বেদনা থাকে, সে তাহা আরও গভীর প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছে, বাহিরে কাহাকেও সে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিবে না, অন্তরে শত বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা সে হাসিয়া সহ্য করিবে, অসম্ভব কল্পনায় তাহার চির জীবন অবসান করিয়া দিবে তথাপি বাহিরের কাহাকেও তাহা বুঝিতে দিবে না, বাস্তবিক কেহই তাহার বাহ্যভাবে একটু বিমর্ষতা, একটু চিন্তা দেখিতে পায় না। একদিন সুভাস কি এক প্রসঙ্গে তেলের বাটীতে জল দিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িতে নাড়িতে দিদিকে কহিল "জলে তেলে মিশ খায় না, দিদি! দুধে জলে তো মিশালে মিশে! কেন এমন হয়, দিদি? নিশ্বাস ছাড়িয়া সরলা কহিল—স্বভাব।

( ৫ )

অদৃষ্ট-লিপি অখণ্ডনীয়। মানবের শত চেষ্টা তাহার নিকট ব্যর্থ! সুভাসিনীর অদৃষ্টও সেই অমোঘ নিয়মাধীন। তাহার ফলে বিবাহের পর দুই বৎসর গত না হইতেই সে চতুর্দ্দশ বর্ষে দাঁড়াইয়া বিধবার সাজ পড়িয়াছে। কাল ক্যান্সার রোগ তাহার স্বামীকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছে; সুভাস-মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহার কোন অঙ্গেই যৌবনের কোন লক্ষণ স্ফুটিত হয় নাই, আজও সে পুতুল খেলা লইয়া মত্ত, আজও সে কুকুর বিড়ালের শাবক লইয়া সন্তান বাৎসল্যের অভিনয় করে, আজও তার সরল মন ভাব গোপন করিতে শিখে নাই কিন্তু ধাতার কঠোর বিধানে আজ সে কৈশোরে যোগিনী, ইহলোকের দৈহিক সুখ বিলাস আস্বাদ না পাইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছিল বটে কিন্তু সম্প্রদানের সময় ব্যতীত সে স্বামী-অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, সধবাবস্থাতেও সে সম্বন্ধে সে বিধবারই ভাবে রহিয়াছে কিন্তু স্বামীর পীড়ার সময় তাঁহার শুশ্রূষা সে স্ব ইচ্ছায় যথাসাধ্য করিয়াছে, স্বামীর মল মূত্র পরিষ্কার করা, তাঁহাকে বাতাস করা, আবশ্যকীয় ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে তাহার শৈথিল্য ছিল না। স্বামীকে যখন বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ পশ্চিমে লইয়া যাওয়া হয় তখনও সে সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু তাহাকে সঙ্গে লওয়া হয় নাই, পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতেও সে বিমর্ষ হয় নাই। যখন এই সাংঘাতিক সংবাদ বেজগাঁয়ে পৌছিল, যখন সুভাসের মা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, যখন বৃদ্ধ রামহরি বাবু বালকের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বাটীর আর দশ জন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন সুভাসিনী একটা কাপড় মুড়ি দিয়া খাটে শুইয়া আছে, চক্ষে অশ্রু নাই, মুখখানি একটু মলিন মাত্র, আর কোনও ভাবান্তর নাই। সরলা তখন পিত্রালয়ে, সে নিজ অশ্রু মুছিতে মুছিতে জোর করিয়া হৃদয়ের বেদনা দমনপূর্ব্বক ভগিনীকে প্রবোধ দিতে গেল কিন্তু প্রবোধ দিবে কাহাকে? সুভাস কহিল "মাকে সান্ত্বনা কর গিয়ে দিদি, আমার কিছু দরকার নাই।"

সরলা বিস্মিত হইয়া গেল 'বল্ তো সুভাস তোর কিছু কষ্ট হচ্ছে না? মন কেমন কচ্ছে না?' জিজ্ঞাসা করিল।

ধীরভাবে সুভাস উত্তর করিল "সকলে যখন চেঁচামেচি ক'রে কাঁদে তখন মনটা কেমন করে, তা না হলে বেশ আছি, কোন কষ্ট নাই।"

সরলা অতি স্নেহের সহিত কাছে বসিয়া ভগিনীর মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল "আচ্ছা, তোর কি তার উপর একটুও টান, সামান্য ভালবাসাও হয় নাই?"

ধীরভাবে সুভাস উত্তর করিল "না দিদি।"

সরলা তাহা বুঝিতে পারিল না। সরলা নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখিল বিবাহের ২।৩ মাসের মধ্যেই স্বামীর

প্রতি তাহার কেমন আকর্ষণ হইয়াছিল, এক বৎসর পরে স্বামী যখন বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া একমাস থাকিয়া বিদেশে যান তখন সে কেমন ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া পাগলের মত অস্থির হইয়াছিল। স্বামীর যাওয়ার পরই কেমন ব্যাকুলভাবে দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিল, দুদিন স্বামীর সংবাদ না পাইলেই সে কত দুর্ভাবনাগ্রস্থ হয় এই সব সে স্মরণ করিয়া দেখিল; এরূপ ভাব সে বেশ বুঝিতে পারে কিন্তু স্বামীর জন্য স্ত্রী ব্যাকুল হয় না, তাঁহার প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণ হয় না, মন কাঁদে না, এ ভাব তাহার নিকট নূতন—সে তাহা বুঝিতে পারে না, তাই সুভাসের ভাবও সে বুঝিতে পারিল না। সরলা ভগিনীকে আদর করিয়া উঠাইল, বসাইল, সুভাসের কোনও ভাবান্তর নাই, হয় সুভাস তাহার জীবনের উপর এই ভয়ানক অশনি-ক্ষেপের ভবিষ্যৎ ফল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহার তাহা বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্তও নাই নয় সে বুকের ব্যাথার উপর নীরবতার পাষাণ চাপাইয়া দিয়া বাহিরে সহজভাব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সফল-কাম কিন্তু এতটুকু বালিকার পক্ষে সে কি সম্ভব? সরলা এ রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে এক পত্র লিখিয়া সব অবস্থা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে একবার আসিতে লিখিল। নিকুঞ্জ পত্র পাইয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া অনতিবিলম্বে আসিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন; কান্নাকাটির ব্যাপার থামিয়া গেলে পর শাশুড়ী অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলেন "বাবা, পাগলটাকে লইয়া কি উপায় হইবে? কিছু বোঝে না, বদ্ধ পাগল। কপাল তো পুড়িয়াছে এখন জাতি কুল যাতে বজায় থাকে তার উপায় কর। তুমি একটু বুঝাইয়া সুঝাইয়া দিয়া যাও বাবা! তুমি ভিন্ন আর কেহ তাহা পারিবে না।"

নিকুঞ্জ সন্ধ্যাকালে সুভাসকে কাছে ডাকিলেন, বিষাদ প্রতিমা পূর্ব্ববৎ সহজভাবে নিকুঞ্জের কাছে আসিল, নিকুঞ্জ অশ্রুজল রাখিতে পারিলেন না, তাহার সহিত কথা কহিবেন কি, তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া নীরবে তাহার হস্তখানি নিজ হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর বহু কষ্টে ডাকিলেন, "সুভা।"

সুভাস উত্তর করিল 'আজ্ঞা।'

আবার নিকুঞ্জ নীরব হইলেন। পরে বলিলেন "তোমার অবস্থা বেশ বুঝিতেছ। এ অবস্থায় চালচলন একটু পরিবর্ত্তন করা দরকার তাও বোধ হয় বুঝিতে পার?" বিধবা হওয়ার কথাটা স্পষ্টভাবে নিকুঞ্জ বলিতেই পারিলেন না।

সুভাস উত্তর করিল "হাঁ, চুড়ী বালা খুলে রাখা, সাদা কাপড় পরা ইত্যাদি তো? তা আমি কর্ত্তে রাজি আছি তো!" সুভাসের স্বরে বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর নাই।

নিকুঞ্জ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "না, না, তা বলছি না, এই বেশী লোকজনের সামনে যাওয়া কি বেশী বাচালতা করা এই সব।"

"আপনি আমাকে যে ভাবে চলিতে বলিবেন আমি সেই ভাবেই চলিব অন্ততঃ চলিতে চেষ্টা করিব। যাতে লোক নিন্দা না হয়, বাবা মার মুখ ছোট না হয় সে সব ব্যভার আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যান, আমি তাই কোরবো।" পূর্ব্ববৎ সুভা উত্তর করিল। নিকুঞ্জ স্নেহের সহিত সুভাসের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "আমার কাছেও কি তুই মনের কবাট খুলবি না সুভাস? সব কথা বলবি না?"

হাসিয়া সুভাস বলিল "সে আবার কি? আমি কি কিছু গোপন করি নাকি? কবাট খোলাখুলি আমি বুঝি না।"

নি। আমি যা জিজ্ঞাসা কোরবো তার ঠিক জবাব দিবি।

সু। হাঁ, তা দিব; কবে দেই নাই?

নি। ঠিক জবাব দিস্ বলেইত সাহস কচ্ছি! আচ্ছা তার উপর তোর একটুও ভালবাসা ছিল না?

সু। 'না।'

নি। কেন বল দেখি, তার কারণ কি?

সু। তা আমি জানি না, বলিতেও পারি না।

নি। তোর পূর্ব্ব ব্যবহার জন্য একটুও কষ্ট হয় না?

সু। না।

নি। বর্ত্তমান অবস্থার জন্যও কষ্ট হয় না? ভবিষ্যতের কি ভাবনা হয় না?

সু। দুয়েএ কোন তফাৎ আছে তাই আমি বুঝি না!

তখনও যেমন ছিলাম,' এখনও তেমন আছি, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে যা বদল, তাতে আমার বিশেষ কিছু অসুবিধা নাই। ভবিষ্যতেও হবে না, চিরকাল একই ভাবে কাটিবে।

নি। আচ্ছা দেখ্, এখনও তুই সম্পূর্ণ বালিকা, বয়স চৌদ্দ হইলেও দেখিতে ও কাজে তুই অতি বালিকা, তোকে আবার যদি বিবাহ দেই ?

সুভাস এবার হাসিয়া বলিল "ছি! তাও কি হয় ?"

নিকুঞ্জ কহিলেন, "যদি হয়; সমাজে যদি চলে, আমি যদি পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা নিতে পারি, আর কেউ যদি তোকে বিয়ে কর্ত্তে প্রস্তুত থাকে ?"

সুভাস একটু বালা-সুলভ ঔৎসুক্য দেখাইয়া বলিল 'কে ?'

নিকুঞ্জ। যদি কেউ থাকে ? ধর কেশব বাবু! ইনি একজন এম্, এ, পাশ, সুদর্শন, বড় চাকরে, মৃতদার।

সুভা। 'না।'

নিকুঞ্জ আরও ২।৪ জনের নাম করিলেন, সুভাসের একই উত্তর। শেষে নিকুঞ্জ বলিলেন "আচ্ছা আমিই যদি তোকে বিয়ে করতে চাই।" চমকিয়া ডবডবে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাল এক দৃষ্টিতে বালিকা নিকুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিল—সে ছল ছল নেত্রের সে ভাব নিকুঞ্জের হৃদয়পটে চিরকাল আঁকা থাকিবে—চক্ষুর সে নীরব ভাষা নিকুঞ্জের হৃদয়কে যেন তিরস্কারের আঘাত করিল—সে চক্ষু যেন তাঁহাকে দৃঢ়স্বরে ভৎসনা করিয়া কহিল "তুমি! তুমিও আমার সহিত রহস্য করিবে, তুমিও আমাকে লইয়া—আমার প্রাণটাকে লইয়া খেলা করিবে! যাহা অসম্ভব, তুমিও জান, আমিও জানি যাহা অসম্ভব সেই কথা লইয়া তুমি আজ আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ—জগতের মধ্যে কেবল যাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি সেই তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বেদনা দিতে আসিয়াছ—বেশ, যাহা ইচ্ছা কর, আমি সব সহিতে পারিব।" সুভাসের মনে এত কথা ছিল কিনা আমরা জানি না তবে নিকুঞ্জের এইরূপই মনে হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সুভাস চোক ফিরিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে জবাব দিল "না।'

নিকুঞ্জ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাস্তবিকই পরীক্ষাস্থলেই বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তার মধ্যে নিজকে জড়ান যে ভাল হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

সুভাস বাহিরে গিয়া একটা বিড়ালের ছানা ধরিয়া তাহাকে লইয়া মহা গণ্ডগোল আর হাসি তামাসার সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

নিকুঞ্জের শাশুড়ী নিকুঞ্জের ঘরে আসিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে পাগলের পাগলামী!"

নিকুঞ্জ "হ্যাঁ," বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

( ৬ )

সুভাসের কপাল ভাঙ্গিবার পর আরও দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন সুভাসিনী বয়সের হিসাবে ষোড়শী কিন্তু দেখিতে ঠিক একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়ার ন্যায়। আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে সে রীতিমত বিধবার আচার পালন করিতেছে তাহার এক চুলও ব্যতিক্রম করে না, কিন্তু অন্যান্য ব্যবহারে সে এখনও বালিকা! এখনও সেইরূপ সরল, উচ্চ হাসি, উচ্চ চীৎকার, ঝগড়া দ্বন্দ্ব, স্নেহ ভালবাসা সবই তার ঠিক পূর্ব্ববৎ আছে। বাটীর কেহ কেহ তাহাকে অন্তরে আঘাত দিলে সে সুদ সমেত তাহা ফিরাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করে না সে পিতাই কি মাতাই কি ? কিন্তু সংসারের কাজ কর্ম্ম, সকলের প্রতি স্নেহ মমতা সে সবও তার ঠিক সমভাবেই আছে বরং তাহা বাড়িয়াছে। নিকুঞ্জের প্রতি তাহার ভাব বাহিরে একরূপই রহিয়াছে; নিকুঞ্জ তাহাদের বাড়ী গেলে এখনও তাঁহার কাছে থাকিতে, কথা বলিতে, তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতে তাহার আগ্রহ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। কিন্তু তাহা অতি পবিত্র, অতি সরল।

নিকুঞ্জ এই বৃন্তচ্যুত কুসুমকলিকাটির দিকে যখন তাকান তখনই তাঁর মনে একটা কষ্টের তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। এক সরলা ব্যতীত বাটীর সকলেই তাহাকে হতভাগিনী বলিয়াই বলে, আমরাও তাহাকে তাই বলি কিন্তু সে নিজে যেন তাহা স্বীকার করে না, একদিন কি কথায় সে বলিয়াছিল "আমি যে কিসে এত হতভাগিনী তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না, অন্যের চেয়ে আমার অসুখ্টা কি—যে আমি হতভাগিনী!"

নিকুঞ্জ সরলা একত্রে প্রার্থনা করিলেন, 'হে ভগবান, উহার মন যেন এমনই থাকে, দাম্পত্য সুখের আস্বাদ ও

কিছুই পায় নাই, ও যেন চিরদিনই এইরূপ অনাঘ্রাত পুষ্পই থাকে, কখনো যেন না বুঝে যে সে হতভাগিনী।”

জানি না ভগবান্ দম্পতীর এ কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন কিনা।

সুভাসিনী আজ ১৬।১৭ বৎসরের যুবতী কিন্তু সে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোরমার মত আমাদের নিকট এখনও একটা প্রহেলিকা, একটা রহস্যের মত। আমরা তাহাকে এ পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারি নাই। সে হাসে, খেলে, বেড়ায়, কোন্ সময় তার কি ভাব তাহা যেন আমরা বুঝি না কিন্তু কখনও স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য তাহাকে নির্জ্জনেও দুঃখিত হইতে আমরা দেখি নাই। বয়সের উপযোগী বুদ্ধি ক্ষমতা তাহার হইয়াছে ইহা যদি স্বীকার করিতে হয় তবে প্রহেলিকা আরও জটিল আকার ধারণ করে। ইহা কল্পনা নহে, বাস্তব ঘটনা!

সে মানবী, কি দেবী কি পশু তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

তাহার হৃদয়ের কোনও স্থান কি শূন্য নাই? সে শূন্য স্থান কি সময় সময় পূর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুল হয় না? অথবা তাহা কি কোন অদ্ভুত উপায়ে সুভাসিনী পূরন করিয়াছে?

শত্রুরও তাহার স্বভাবের প্রতি বিন্দুমাত্র কলঙ্কলেপনের ক্ষমতা নাই এমন নির্ম্মল স্বভাব তাহার।

জানি না সে যোগিনী কি না, জানি না তাহার মনঃসংযম ক্ষমতা কতদূর, জানি না তাহার হৃদয়ের কখন কি খেলা—তাহার ইতিহাস সে নিজে না বলিলে এ জগৎ কিছুই জানিতে পারিবে না—জগৎ কেবল জানিবে সে হতভাগিনী।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

# ইংরাজের বঙ্গাধিকার। *

প্রথম প্রস্তাব।

পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন—প্রবন্ধের শিরোলিপি দর্শনে হয়ত অনেকেই বলিবেন মিল, মার্শমান, ইলিয়ট্ প্রমুখ ঐতিহাসিকদিগের লেখনী বহুকাল পূর্ব্বে শীর্ষোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশ্রাম লইয়াছে, গ্রাম্য পাঠশালার বালক বালিকা হইতে কালেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরের অঙ্গনা কেহই “ইংরেজের বঙ্গাধিকারের” কথা জানিতে বাকী নাই—অনেক দিন হইল একথা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তবে আর “চর্ব্বিত চর্ব্বণের” প্রয়োজন কি—কথা সত্য, বিষয়টীও যে বহু পুরাতন তাহাও মিথ্যা নহে, দেশের বালক বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই একথা শুনিয়াছেন, ছোট, বড়, মাঝারি নানা রকমের দেশী বিলাতী ভাষার ইতিহাসে ইহার বিস্তর বর্ণনা আছে। যিনি যখন এ দেশের ইতিহাস লিখিয়া লেখনী কণ্ডূতি নিবারণ করিয়াছেন, তিনিই এতৎসম্বন্ধে দুই এক কথা না কহিয়া নিরস্ত হয়েন নাই, কেন না বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলেই এ কথা লিখিতে হয়, না লিখিলে চলে না, সে পক্ষে ত্রুটী করিলে ইতিহাসই হইবে না, বিষয়টী এতই প্রয়োজনীয়। সাময়িক পত্রিকার লেখকগণও ক্ষান্ত নহেন, তাহারাও যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া ইংরেজের সংগৃহীত ইতিহাসের পুরাণ কাহিনীর পুনঃপুনঃ অনুবাদ করিয়া শোথরগ্রস্থা রমনীর ন্যায় মাতৃভাষার অসঙ্গত পুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। আমিও প্রায় ইহাদেরই মধ্যে একজন, তবে আমার উদ্দেশ্য পৃথগ্বিধ। অধুনা এই পুরাণ ঘটনা লইয়া অনেক নূতন কথা শুনা যাইতেছে, অনেক নূতন তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইতেছে। তাই আজি পুরাণ ঘটনা,

* শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবুর “সিরাজউদ্দৌলা,” নিখিল বাবুর “মুর্শিদাবাদ কাহিনী” এবং বিহারী বাবুর “ইংরাজের জয়” গ্রন্থে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের সহিত অনেক স্থলে আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও প্রাচীন, ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনায় প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে বলিয়া এই প্রবন্ধ পত্রস্থ করা হইল। প্রঃ সং

পুরাণ কথা নূতন করিয়া তুলিতে হইতেছে। নূতন কথার নূতন তত্ত্বের আলোচনারই জন্য নূতন প্রবন্ধের প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা বড়ই গুরুতর ব্যাপার, —চক্ষে দেখা নাই, হয়ত কর্ণেও শুনা নাই, কোন্ কালে কে কোথায়, কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়, যিনি লিখিয়া গিয়াছেন কথিত বিষয়ের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল কি না, তিনি তৎকালে আপনার স্বাধীন মত প্রচারে কতদূর সমর্থ ছিলেন; এই সকল বিষয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বিশেষতঃ সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, প্রকাশ্যরূপে স্বাধীনভাবে কোন শাসনকর্ত্তার শাসন-নীতির বিরুদ্ধে মত প্রচার করিবারও কাহার কোন অধিকার বা শক্তি সামর্থ্য ছিল না, কেহ তাহাতে প্রস্তুত হইলে তাহাকে শূলে চাপিতে হইত। এহেন দুঃসময়ের রাজনৈতিক ঘটনাগুলির স্মৃতি যে একবারে বিলুপ্ত হইবার ব্যবস্থা হয় নাই ইহাই যথেষ্ট উপকারের কথা বলিতে হইবে। সেই সকল ঘটনার পরিচয় মাত্র আমাদের সমালোচনার একমাত্র অবলম্বন। তদানীন্তন মীমাংসার উপর ততটা নির্ভর করা যায় না। আজি কালি আমরা যাহাকে আমাদের স্বদেশের বা স্বজাতির ইতিহাস বলি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাস নহে। প্রাচীনকালের শাসন কর্ত্তাগণের আশ্রিত ও উপজীবিত ব্যক্তিগণের লিখিত বিবরণ মাত্র একথা সহস্রবার মানিয়া লইতে হইবে। তবে তাহাদের সঙ্গতি অসঙ্গতি সম্বন্ধে বিবেচনা করা চাই।

"ইংরেজের বঙ্গাধিকার" সম্বন্ধে যে কয়েকটী নূতন কথা উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী কথা—সেরাজ উদ্দৌলাকে যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার বলিয়া ইংরেজের ইতিহাসে বর্ণনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। ইংরেজ আপন শত্রুর দোষ বর্ণনায় মুক্ত-হস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ কথার মীমাংসা করিতে হইলে সেরাজ-চরিত্র আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে হয়।

সেরাজ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র। যখন আলিবর্দ্দি বিহারের শাসন কর্ত্তা ছিলেন তখন আনুমানিক ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সেরাজের জন্ম হয়। আলিবর্দ্দির তিনটী কন্যা ব্যতীত আর অপত্য ছিল না। সেই তিনটী কন্যা তিনি আপন অগ্রজ হাজি মহম্মদের তিনটী পুত্রকে অর্পণ করেন। সেরাজ আলিবর্দ্দির সর্ব্বকনিষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈন উদ্দিনের পুত্র। আলিবর্দ্দি খাঁ সেরাজকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন, ইহা বাক্যতঃ নহে কার্য্যতঃ। পাঠক, অপেক্ষা করুন, তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাইবেন। সেরাজকে তিনি যার পর নাই ভাল বাসিতেন। অতিমাত্রায় মাতামহের আদর পাইয়া বাল্য কাল হইতেই সেরাজের মনে যথেচ্ছাচারিতার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। নবাব বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন হইবার পর হইতেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেনাপতিগণের বিদ্রোহিতারও বিরাম ছিল না, মুস্তফা খাঁ যখন তাঁহার অবাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া বিহারে উৎপাত করিতে থাকে, তৎকালে জৈন উদ্দিন বিহারের শাসন কর্ত্তা। পিতৃব্যের আদেশানুসারে তিনি মুস্তফা খাঁকে প্রদমিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন, পরিশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিলে এবং নবাবের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিয়া কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কিয়দ্দিনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশে প্রস্থান করিলে নবাব মহা আড়ম্বরে দৌহিত্রের পরিণয়োৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। * বলা বাহুল্য যে অতঃপর সেরাজ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েন, এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করে নাই। একে অপুত্রক নবাবের নাতি, তাহাতে বাল্য বিবাহ ইহাতেও সেরাজের শিক্ষার প্রত্যাশা বিড়ম্বনা বই কি বলিব।

মুসলমান আভিজাতিকদিগের আত্মদ্রোহিতায় ঐতিহাসিকের লেখনী অতি বড় কলঙ্কিত। ভারতের মুসলমান সম্রাট ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের সুষুপ্তিতেও

* In the short interval which he (Ali Vardi Khan) now enjoyed, the viceroy celebrated with great pomp the nuptials of his two grandsons, the children of Zyn-ooddeen.
Marshman's "History of Bengal."

শান্তি ছিল না,—মানুষ যাহাদিগকে লইয়া সংসারী হয়, যাহাদের জন্য সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ, যাহাদের সুখ দুঃখে আপনাদের সুখদুঃখ জ্ঞান করে, সেই সকল পরমাত্মীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র ভ্রাতা অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের জন্য পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ, মাতামহাদির জীবন হিংসায় প্রবৃত্ত। শ্বশুরের বধসাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া জৈন উদ্দিন নবাবের পদচ্যুত সেনাপতি সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ নামক দুইজন পাঠানকে আপনার অধীনে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে তাহাদিগকে পাটন্যায় আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদেরই হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন। জৈন উদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া না দেওয়ায় বিশ্বাসঘাতক পাঠান তাঁহার যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করে, তাহাতেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সেরাজ এই সময়ে মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত শত্রুহস্তে বন্দী হয়েন। আলিবর্দ্দি খাঁ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নিধন, বিহার প্রদেশ স্বাধিকারচ্যুত এবং দুহিতা ও দৌহিত্রাদি আত্মীয়গণের শত্রুহস্তে পতন এতগুলি দুঃসংবাদ পাইয়া অবিলম্বে বিহার যাত্রা করেন এবং শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আত্মীয়গণের উদ্ধার সাধন করেন।

বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বই আলিবর্দ্দির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী, বিহারে অবস্থিতি করিয়াই তিনি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্তির সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন; বিহার সমধিক উর্ব্বরা ভূমি, বিহারের রাজস্বও প্রচুর অতএব তিনি বিহারের শাসন কর্ত্তৃত্ব অপরকে দিতে ইচ্ছা করিলেন না; সিরাজকেই তাহাতে নিযুক্ত করিয়া প্রীতিলাভ করিলে, রাজা জানকীরাম তাঁহার নায়েবী পদ পাইলেন। আলিবর্দ্দি নিতান্ত স্বার্থান্ধ হইয়াই এরূপ অপরিণামদর্শীর কাজ করিয়াছিলেন। এই অপ্রাপ্তব্যবহার বালকের হস্তে বিহারের ন্যায় প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান যে তাঁহার ভাবী জীবনের কিরূপ কল্যাণকর হইয়াছিল, তৎকালে বৃদ্ধ নবাব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই তাহার শিক্ষার এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মতিগতি ও চরিত্রগঠনের উপযুক্ত সময়। এ সময় সৎসঙ্গ ও সৎশিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে সৎপথ দেখাইতে পারিলে তবে তাঁহার জীবন সুখসম্পদে শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিত। অল্প বয়সে আধিপত্য লাভ করিয়া মোগল কুলতিলক আকবর সাহের ন্যায় চরিত্র ভাল হওয়া কম জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে—আকবর প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। প্রতিভা প্রথম হইতেই ফুটিতে থাকে। বাল্যে অভিভাবক-বিহীন কিন্তু সেরাজ শৈশবাবধি পিতা ও মাতামহের অধীন। ইহাতেও আকবর ও সেরাজের চরিত্র স্বর্গ ও নরকের ন্যায় বিভিন্ন কেন? তিনি বাল্যাবধিই দুঃশীল ও দুরাচার। এরূপ বলিবার কারণ এই যে ইহার দুই বৎসর পরেই মাতামহের মৃত্যুর বিলম্ব তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি তাঁহার সিংহাসনলোলুপ হইয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। অবিলম্বেই পাটনার প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সানুচর তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা জানকী রামকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার আদেশ দিলেন। রাজা জানকী রাম জানিতেন সেরাজ মাতামহের আদরের দৌহিত্র, তাঁহার মার্জ্জনা হইবে কিন্তু তাঁহাকে বশীভূত করিতে গিয়া যদি তাঁহার কোনরূপে পীড়া জন্মে তাহা হইলে নবাবের নিকট তাহার মার্জনা নাই। অতএব অতি সাবধানে তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে স্ববশে আয়ত্ত করিলেন।

দৌহিত্রের বিদ্রোহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই আলিবর্দ্দি অবিলম্বে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ভয় এই পাছে যুদ্ধে সেরাজের কোন শারীরিক ক্ষতি হয়। দৌহিত্র যে তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত তাহা ভ্রমেও ভাবিলেন না। তিনি পাটনায় উপস্থিত হইয়া যখন সেরাজকে অক্ষতাঙ্গে দেখিলেন, তখনও আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন। সেরাজের শাসন হইল না—প্রজ্জলিত হুতাশন ইন্ধন পাইলে যেরূপ হয় সেরাজ সেইরূপ হইয়া উঠিলেন। কু-সঙ্গী ও কুসহচরে সেরাজকে শ্বাপদ অপেক্ষাও শঙ্কার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল।

খৃঃ ১৭৫১ অব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্দ্দান্ত দৌহিত্র তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে দেন নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আর কোন উপদ্রবই ছিলনা, কিন্তু এই বৎসর আলিবর্দ্দি খাঁর বড়ই দুর্ব্বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের পোষ্যপুত্র একরাম উদ্দৌলা এই বৎসর প্রাণত্যাগ করেন। প্রিয়তর দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলা লম্পটতা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দোষে সাধারণের যার

পর-নাই অপ্রিয় হইয়া উঠেন, তাঁহার উপদ্রবে মুর্শিদাবাদ নগরী অস্থির হইয়া পড়ে। প্রবাদ এইরূপ যে তিনি কোন কুলাঙ্গনার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিলে দিবা দ্বিপ্রহরেও তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহার সতীত্ব নাশে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। গর্ভমধ্যে ভ্রূণ কি অবস্থায় থাকে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য গর্ভিনীর গর্ভ বিদারণ করিতেন,—জনপূর্ণ পোত নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হইলে আরোহিরা কিরূপ ভাব প্রকাশ করে দেখিবার জন্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি রাজ-পথে বাহির হইতেন তখন মুর্শিদাবাদবাসিরা ত্রাহি মধুসূদন!—ত্রাহি মধুসূদন" করিতেন। এই সকল কথা কি অতিরঞ্জিত? উহার ইংরেজ ঐতিহাসিকের অতিশয়োক্তি হইলে আজিও সাধারণে স্বেচ্ছাচারিকে নবাব সেরাজ উদ্দৌলার সহিত তুলনা করিত না—রাঢ়ে বঙ্গে স্বেচ্ছাচারী দেখিলে কে না বলে—যে "নবাব সেরাজ উদ্দৌলা"। সেরাজের রাজ কাজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল মাত্র এই অল্প সময়ে কখন সমগ্র বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় এ কলঙ্কের শাখা প্রচারিত হইতে পারে না। দীর্ঘকালের কুকার্য্যেই তিনি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সেরাজের কোন্ কাজটী মার্জ্জনার যোগ্য, আমরাও তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিনা—মুসলমান নবাবের অল্পবয়স্ক আদুরে দৌহিত্র স্বভাবতঃই একটু উগ্র প্রকৃতির হওয়া সম্ভব। ইংরেজ-ইতিহাস লেখকগণের অনেকেই রাজ্য প্রাপ্তি কালে তাঁহার বয়স বিংশতি বর্ষ অপেক্ষা ন্যূন ছিল এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা কতদূর সম্ভবপর বলা যায় না—যদি তাহাই হয়, তবে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ইতিহাসের সন তারিখের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় যে, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে বিহারে মুস্তাফা খাঁর বিনাশসাধনের পর এবং ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মিরজাফরের মারহাট্টা দমনের মধ্যে আলিবর্দ্দি খাঁ সেরাজের বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন—দশ বৎসর বয়সের বালকের বিবাহ মুসলমান নবাবের সংসারে অসম্ভব না হইলেও এই বৎসরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর বিহারের শাসনকর্তৃত্ব দিয়া প্রাণের পুত্তলি দৌহিত্রকে কেবলমাত্র রাজা জানকীরামের নিকট দূরবর্ত্তী স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মোহময় বৃদ্ধ মাতামহের পক্ষে কত দূর সঙ্গত! তর্কস্থলে ইহাও সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিলে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার বুদ্ধি ও সামর্থ্যলাভ সেরাজের ন্যায় বালকের পক্ষে সম্ভবিতে পারে না। অধিকন্তু মার্শমান সাহেব লিখিয়াছেন, রাজ্যপ্রাপ্তি কালে সেরাজের বয়স চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল * তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। ইহাই বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত বয়স; এ বয়সে যদি কাহার বিবেক-বুদ্ধির সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালে তাহার আর হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অল্প বয়স্ক বলিয়া যে একটা মার্জ্জনা তাহা তাঁহার প্রাপ্য নহে। সেরাজ-চরিত্রের কোন অংশে মহত্ত্বের লেশ মাত্র নাই। আর তিনি বড় ঘরের ছেলে হইয়া যে নিতান্ত অজ্ঞান, অব্যবস্থিত ও অধঃপতিত, ইহা ভিন্ন তাঁহার জন্য কিছুতেই মন কাঁদে না। এরূপ ব্যক্তির জন্য অকারণ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবার আড়ম্বর অনুষ্ঠানই বা কেন?—যদিই কোন মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার চরিত্রের অসারতা সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন কেহই নাই যে তাঁহার দুষ্কৃত কার্য্যের উল্লেখে ক্ষান্ত আছেন।

এই বৎসরই সেরাজ আরও কয়েকটী দুষ্কার্য্য সম্পাদন করেন। তাহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ ঢাকার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন, হোসেন কুলি খাঁ নামে তাহার একজন নায়েব ছিলেন, তাঁহার প্রতি সেরাজের ঘোরতর আক্রোশ ছিল, তিনি তাঁহাকে স্ববংশে, বিনষ্ট করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া ঢাকায় দূত প্রেরণ করেন, সেই ব্যক্তি সুস্পষ্ট দিবালোকে হোসেনকুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়া চলিয়া আইসে। অতঃপর সেরাজ হোসেনের প্রাণ-বধের জন্য মাতামহের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহাতে তিনি বলেন "—তাঁহার প্রভু নিবাইশের অনুমতি ব্যতীত তাহা হইতে পারে"না।" আলিবর্দ্দি জানিতেন, সেরাজ যাহা ধরিয়াছে তাহা ছাড়িবার পাত্র নহে। তিনি এ দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়া রাজমহলে মৃগয়া যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধা নবাব-মহিষী এবং নিবাইশের পত্নী উভয়ে হোসেন কুলির জীবন

* "His (Ali Vardi's) throne was now filled by a youth of twenty four; proud, cruel, weak and profligate who had no other object of life but his own pleasure."—

রক্ষার জন্য কতই অনুনয় বিনয় করিলেন, সেরাজ তাহাদের সমক্ষে সম্মত হইলেন, কিন্তু আসিবার সময় পথিমধ্যে হোসেন কুলি খাঁকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া ঘাতক দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে, তাঁহার অন্ধ ভ্রাতাও তৎসহ বিনষ্ট হইলেন। রাজা রাজবল্লভ নিবাইশের অন্যতর নায়েব—তাঁহার প্রতিও সেরাজের কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ এই সময়ে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন, সেরাজ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এই দুই ব্যক্তিই নবাব সরকারে চাকরী করিয়া অসদুপায়ে বহুল ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। নবাবী আমলে কে না এরূপ বড় মানুষ হইয়াছেন? পিতার বন্দীত্বের সংবাদ পাইয়া রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস কলিকাতার গবর্ণরের নামে কাশিমবাজারস্থ ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবের পত্র লইয়া ধন সম্পত্তি ও পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে তথায় প্রস্থান করেন।

এই বৎসরেই নিবাইশ মহম্মদ এবং সৈয়দ আমেদ নামক ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কাল-কবলিত হইলে শোকতাপে ও সেরাজের অত্যাচার জনিত মনোদুঃখে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলিবর্দ্দি খাঁ ইহলোকলীলা সম্বরণ করেন। পরদিনই সেরাজ মাতামহের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তিনি সদাচার ও সাধুশীল হইলে এতদুপলক্ষে কতই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন—কিন্তু করিলেন কি—স্বীয় পিতৃব্যপত্নী ও মাতৃস্বসা নিবাইশ-পত্নীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন—এবং অবিলম্বেই কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিবার জন্য কলিকাতাস্থ ইংরেজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। মেদিনীপুরের রাজা রামনারায়ণের ভ্রাতা তৎকালে নবাব সরকারে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই পত্র খানি লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার পদোচিত কোনই আড়ম্বর ছিল না, একখানি সামান্য নৌকারোহণে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করেন।

উমিচাঁদ একজন উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী। তিনি কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে ঠিকাদারী করিয়া প্রভূত অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন ক্রমে তাঁহার কার্য্যে শঠতা প্রকাশ পাইলে ইংরেজগবর্ণর তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এজন্য তিনি মনে করিলেন ইহাতে উমিচাঁদের কোনরূপ চাতুরী আছে, এই ভাবিয়া নবাবদূতকে প্রতারক বলিয়া অবজ্ঞা করিলেন, এবং পত্রেরও কোন উত্তর দিলেন না। এরূপ অবাধ্যতা ও অভদ্রতা প্রকাশ ইংরেজ গবর্ণর ড্রেকের পক্ষে উপযুক্ত হইলনা। প্রকৃত প্রস্তাবে সে ব্যক্তি যদি প্রতারকই হইত, তাহা হইলেও উত্তর দিবার কি প্রত্যবায় ছিল। ড্রেকের এইরূপ ও অন্যরূপ অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ইংরেজকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

অদ্য আমরা সেরাজদ্দৌলার চরিত্র বিষয়ক কয়েকটী কথা বলিয়া প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা যদিই তাহার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা বর্ণনা না করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া সেরাজকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক স্থির করা যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না। মুসলমান লেখকের লিখিত ইতিহাসে তাহার দুষ্কার্য্যের তালিকা পাওয়া যায়। সেরাজ ও ক্লাইভ উভয়ের সহিতই আমাদের সমান সম্বন্ধ। এখন সেরাজও যেখানে, ক্লাইভও সেখানে। উভয়েই আপনাপন সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের দোষগুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া একদেশদর্শিতা প্রদর্শনে আমাদের লেখনী কলঙ্কিত করায় কোনই লাভ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের পক্ষপাতিতা দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলে পৌরষ আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের দোষ দেখাইতে গিয়া আমাদিগকে সেই দোষে দূষিত হইতে না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে "অন্ধকূপ হত্যার" সত্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

---

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নবাবদূত কলিকাতা হইতে ফিরিয়া না যাইতে যাইতেই কলিকাতাস্থ ইংরেজ গবর্ণরের নিকট নবাবের আর এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে নবাবের আদেশ ছিল যে, ইংরেজেরা কলিকাতা দুর্গের সংস্কার করিতে

পারিবেন না, বরং পুরাতন যাহা আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিতে হইবে। এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ফরাসীতে বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মে তৎসূত্রে সত্বরেই উভয় জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ স্থলে এদেশেও যে বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত জানিয়া কলিকাতার গবর্ণর দুর্গ সংস্কারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন না, বিশেষতঃ বহুদিন ধরিয়া ইংরেজ বণিকদিগের যুদ্ধবিগ্রহের শঙ্কা না থাকায় দুর্গের সংস্কার কার্য্য উপেক্ষিত হইয়াছিল।

ইতিহাসের উক্তি এই যে, এই সময়ে সেরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজ্যের পদস্থ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁর অন্য দৌহিত্র, সৈয়দ আমেদের পুত্র সফৎজঙ্গকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পদে সংস্থাপিত করা স্থির করিয়াছিলেন। সেরাজ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সফৎজঙ্গের উচ্ছেদ সাধনার্থ সসৈন্যে পূর্ণিয়া যাত্রা করিবার স্থির করিয়াছেন এমন সময় কলিকাতা হইতে ড্রেক সাহেবের অবাধ্যতাসূচক পত্র পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নবাবের আজ্ঞা কোন মতেই প্রতিপালিত হইতে পারে না।" যত দিন মনুষ্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন থাকেন, তত দিন তিনি অন্যায় করিলেও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না। তদ্বিপরীতে তাঁহার ন্যায্য আদেশও অবজ্ঞাত। যৎকালে দীল্লির বাদসাহ ফেরেকসের ইংরেজদিগকে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী আটত্রিশ খানি গ্রাম প্রদান করেন, তৎকালে মুর্শিদকুলিখাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি সম্রাটের অনুমতির প্রতিকূলে আপন অধীন জমিদারগণকে আজ্ঞা দিলেন—"ইংরেজ কোম্পানী সূচ্যগ্র ভূমি দখল করিতে না পারেন, তাঁহাদের যাহা আছে তাহাই থাকিবে।" কার্য্যতঃও তাহাই হইল, মুর্শিদকুলিখাঁ জীবিত থাকিতে দীল্লির বাদসাহের প্রদত্ত আটত্রিশ খানি গ্রাম ইংরেজ কোম্পানী দখল করিতে পারেন নাই। সেরাজের সে বল বিক্রম কিছুই ছিল না, তাই ড্রেক সাহেব অনায়াসে তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

কিন্তু সেরাজ নিরস্ত হইলেন না, তিনি এই অবজ্ঞাসূচক উত্তরে পেশিতপুচ্ছ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—আর পূর্ণিয়া যাওয়া হইল না, সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অনুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠি লুঠিয়া লইলেন এবং সেখানকার ইংরেজ কর্ম্মচারীগণকে বন্দী করিয়া কলিকাতাভিমুখী হইলেন। কলিকাতা-দুর্গে ইংরেজদিগের যুদ্ধের উপযোগী কোন উপকরণই ছিল না, সৈন্যসংখ্যাও ৫৪০, তন্মধ্যে ১৭৪ জন মাত্র ইংরেজ। তাহারাও বন্দুক ধরিতে জানিত না। সেরাজের সৈন্য ৫০ হাজার। ইংরেজ গবর্ণর বিষম বিপাকে পড়িলেন, অবিমৃষ্যকারিদিগের পরিণামে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও তাহাই ঘটিল। হিংসা দ্বেষের বশীভূত হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া যে সকল ব্যক্তি হঠকারিতার অনুবর্ত্তী হয়, পশ্চাৎ তাহাদিগকে আপনাদের কৃতকার্য্যের জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইয়া থাকে। ড্রেক সাহেবকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল। এখন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিরশত্রু হইলেও বিদেশের মিত্র অপেক্ষা স্বদেশের শত্রুর সহায়তা শ্লাঘনীয় বোধে তিনি চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজ এবং চন্দননগরস্থ ফরাসীদিগের সাহায্যার্থী হইয়া তাহাতেও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। ওলন্দাজেরা একবারেই এপ্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন, ফরাসীরা বলিলেন—"ফরাসডাঙ্গায় আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাইলে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।" তখন নিরুপায় হইয়া ড্রেক নবাবের ক্রোধশান্তির জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, এবং কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ না করিলে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবাব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল ইংরেজদিগকে কলিকাতা হইতে একবারে উঠাইয়া দিবেন, ইংরেজ নামে পরিচয় দিতে কলিকাতায় এক জনকেও রাখিবেন না। উষ্ণ মস্তিষ্ক মুসলমান যুবক যদি—"মারা অপেক্ষা ধমকান ভাল" কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল, বোধ হয়, কিছু বৃদ্ধি পাইলেও পাইতে পারিত। তিনি ড্রেক অপেক্ষা সমধিক হঠকারী, সুতরাং তাঁহার নিকট এরূপ ব্যবহার একেবারেই প্রত্যাশা করা যায় না। সেরাজ সহিষ্ণুতার পাঠ কস্মিন কালেও অভ্যাস করেন নাই, বিনয়

ও শিষ্টাচারের অর্থও পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় নাই, বিবেকের আশ্রয় কেমন তাহা জানিতেই পারেন নাই। তাঁহার জেদ হইল কলিকাতা আক্রমণ করিবেন।

ক্রমে সেরাজ-সৈন্য কলিকাতার সমীপবর্ত্তী হইল। ১৭ই পৌষ নবাব কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বাগবাজারে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। মুসলমানের আগ্নেয়াস্ত্র ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। শত্রুসৈন্য কলিকাতা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পরদিন ১৮ই জুন কলিকাতা নবাব হস্তে পতিত হইল, দুই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নবাব অধিকার করিয়া বসিলেন। বহুল ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট এবং অনেকেই আহত হইল। ইংরেজেরা নগর ত্যাগ করিয়া সকলেই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ বড় বড় ঘরগুলি আগুনে জ্বলিতে লাগিল। দুর্গমধ্যে একটী সামরিক সমিতির বৈঠক হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিরা একবাক্যে সকলেই বলিলেন—পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দুর্গমধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় এতাধিক লোক সমাবেশ হইয়াছিল যে, অবরোধে অবস্থিত হইলে সঞ্চিত খাদ্যে এক সপ্তাহও চলিতে পারিত না। এজন্য স্থিরীকৃত হইল যে রাত্রি প্রভাত হইলেই সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে পরে অন্যান্য সকলকে সরাইতে হইবে। দুর্গসমীপে যে একখানি জাহাজ ছিল, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে তাহাতেই গিয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, কেহ কাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে প্রস্তুত নহে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে লাগিল, ড্রেক শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। কাজে কাজেই পলায়নেও শৃঙ্খলা রক্ষা হইল না, সকলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে মানে মানে পলায়ন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। সম্রাট আরঙ্গজেবের আমলে তিনজন ইংরেজ সৈনিকের সহিত হুগলীর বাজারে নবাব সেনার সংঘর্ষ হইলে ক্রোধোদ্দীপ্ত সম্রাট যখন ইংরেজের দণ্ড বিধানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন সুচতুর জব চার্ণক সাহেব হুগলী কুঠির কর্ত্তৃত্ব করেন। তিনি আপনার আশ্রিত অনুগত সকলকে লইয়া প্রথমে সুতানুটীতে—সেখানে নিরাপদের সম্ভাবনা না দেখিয়া একবারে হিজলি কাঁথিতে পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করেন। এবার ড্রেকের কর্ত্তৃত্ব—তিনি একটুকু বুদ্ধি কৌশল দেখাইতে পারিলে সব দিক্ রক্ষা পাইত। কেহই ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইলেন না, ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কোলণ্ড নামে দুইজন সিবিল কর্ম্মচারীর প্রাণে বড়ই ভয় জন্মিল, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিবার ব্যপদেশে গিয়া আর ফিরিলেন না। ইহাতে অপরাপর লোকও বড় ব্যস্ত হইল, কেহই আর দুর্গে রহিতে রাজি হইল না। সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজের দিকে দৌড়িতে লাগিল, কেহ কাহার মুখ চাহিল না। সকলেই "য পলায়তি স জীবতি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে ব্যাকুল। মার্শম্যান বলেন গবর্ণর ড্রেক এবং সেনাপতি মিঞ্চিন দুই জনে এই রাত্রেতেই প্রস্থান করেন, বস্তুত তাহা নহে। সেই ১৮ই জুনের রাত্রিতেই সেই জাহাজ খানি নঙ্গর তুলিয়া দুই ক্রোশ দক্ষিণে চলিয়া গিয়া ভাগীরথী বক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইংরেজের অন্যান্য জাহাজ ও নৌকা সমস্তই হাওড়া বাগী প্রভৃতি স্থানে গিয়া নঙ্গর করিল।

১৯এ জুনের প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রায় অর্দ্ধেক ইংরেজ দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করা স্বত্বে তাঁহাদের রক্ষার ভার যাঁহাদের উপরে সেই ড্রেক ও মিঞ্চিন সাহেবও সরিয়া পড়িলেন। ইহাতে দুর্গস্থ সকলে অনন্যোপায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন একজনকে কর্ত্তৃত্ব দিবার প্রয়োজন হইল, যিনি প্রবীণ নেতর ছিলেন, তিনি আপন দাবি ত্যাগ করিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে হলওয়েল সাহেবই কর্ত্তৃত্বের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন। কলঙ্কের পসরা মাথায় লইবার জন্যই হলওয়েলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ, কিন্তু উপায় কি—না হইলেও চলে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষার কোন আশাই ছিল না, আশা ছিল একমাত্র পলায়নের—যতক্ষণ তাহার সুবিধা না ঘটে, ততক্ষণ দুর্গ রক্ষা না করিয়াই কি করেন, অগত্যা বল না থাকিলেও তাহাতে ক্ষান্ত থাকা চলিল না। চিৎপুরে গঙ্গার উপর "রয়েল জর্জ্জ" নামে ইংরেজের আর একখানি জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, দুর্গস্থ সকলেই মনে করিতেছিল যে তাহার দ্বারাই পলায়নের উপায় হইবে। জাহাজ খানিকে দুর্গসমীপে আনিবার জন্য বারম্বার সংবাদ দেওয়া হইল, লোকও পাঠান হইল, জাহাজের কাপ্তেন সাহেবও তাহাতে প্রস্তুত হইলেন, নাবিক ভাবিল যখন যাবতীয় পদস্থ ব্যক্তি সকলেই প্রাণ লইয়া পলাইয়া

আসিয়াছেন তখন না জানি দুর্গের নিকটস্থ হইলে কোন না কোন বিপদ ঘটিবে, এই ভয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইয়া, জাহাজ চালাইতে গিয়া তাহা চড়ায় লাগাইয়া দিল। তখন আশার আলোক একবারে নিভিয়া গেল। তবে পলায়িত ব্যক্তিগণ এখন নিরাপদ হইয়া সুস্থির মনে যদি ভাবিয়া দেখে যে দুর্গস্থ সকলে নিষ্ঠুর নবাবের ক্রোধাগ্নিতে নিশ্চিতই ভস্মীভূত হইবে, তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না, তাহা হইলে যদি কোন উপায়াবলম্বন করে—কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবিল ভীরুর ন্যায় যখন তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে, তখন আর তাহারা শত্রুর সমীপস্থ হইতে সাহস করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া দুর্গস্থ সকলে বড়ই মুহ্যমান হইল। দুইদিন কাটিয়া গেল। দুর্গ হইতে পুনঃ পুনঃ বিপদের নিশান দেখান হইতে লাগিল—হাহাকার শব্দ উঠিল, শত্রু বেষ্টিত নগরে অগ্নিশিখা উঠিতে লাগিল। শত্রু সৈন্যের কামান ধ্বনিতে দূরস্থিত লোকে বিপদ বুঝিতে পারিল, তথাপি কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না, পলায়িত ইংরেজেরা যেন মন হইতে মনুষ্যত্বকে অপসারিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।* এই ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—যদি পনর জন সাহসী পুরুষ একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া দুর্গ পার্শ্বে লাগাইতে পারিত তাহা হইলে শত্রুগণের সহস্র চেষ্টা স্বত্বেও দুর্গস্থ সকলেই পরিত্রাণ পাইতে পারিত, কিন্তু তাহারও অভাব হইল।

১৯শে জুন রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ গৃহগুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মার্শমান সাহেব বলেন—নবাব সৈন্য ঐ দিন দুর্গ আক্রমণ করিয়া কিছুই করিতে না পারিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, একথা পাগলের প্রলাপোক্তির ন্যায়—ক্লাইবের ন্যায় কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির হস্তে দুর্গভার থাকিলেও একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া হলওয়েল যে ৫০ হাজার শিক্ষিত সৈন্যের পরাভব সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা মনেও করিতে পারা যায় না।

ইংরেজ ইতিহাস লেখকই বলিয়া গিয়াছেন—কামান মরিচা ধরা, বারুদ ভিজা, সৈনিক বলিয়া পরিচয় দিতে যাহারা ছিল তাহারা কেমন করিয়া বন্দুক ধরিতে হয় তাহাই জানিত না। † এরূপস্থলে দুই দিন বল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে ইংরেজ হস্তে কলিকাতা দুর্গস্থ সকলে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ইহা কেবল তাহাদের জাতীয় গৌরব রক্ষার চেষ্টা মাত্র।

বোধ হয় ষ্টুয়ার্ট সাহেবই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া থাকিবেন, তখন এ দেশের লোকে ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা অতি অল্পই করিত, যৎকালে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারবাহুল্য ঘটিতেছিল, সেই সময়ে মার্শমান সাহেবের লিখিত ইতিহাসই স্কুল কলেজে পঠিত হইত। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা স্কুলগুলি সংস্থাপিত হইলে সর্ব্ব প্রথম পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ঐ দুই খানি গ্রন্থই মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত, তৎকালে ঐতিহাসিক তত্ত্বের গবেষণা আজি কালিকার মত সহজ-সাধ্য ছিল না—অর্ম্মি, মিল প্রভৃতির ইতিহাসেরও এরূপ প্রচার বাহুল্য ছিল না, ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল পাঠ্য মার্শম্যানের ইতিহাসে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই অনুবাদ করিয়াছেন, এবং তাহাই স্কুলের বালকেরা অভ্রান্তজ্ঞানে অভ্যাস করিয়া গিয়াছে, কিন্তু মার্শম্যান সাহেব যে স্বকপোল কল্পিত অনেক কথা তাহার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বসিয়া আছেন, তাহা অনেকেই ভাল করিয়া দেখেন নাই। পাঠক পাঠিকাগণ ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।

* For two entire days did the fugitives look upon those signals, while the flames which burst from all parts of the town testified still more amply to the distress of their country men, and the continual firing of the enemy told of their increasing danger. Without making a single effort to answer the calls upon their humanity or to inter-pose the slightest assistance,—

Marshman's History of Bengal.

† There were scarcely any among them who knew the right from the wrong end of their muskets—

Thornton's History of British Empire in India.

২০এ জুন * নবাব সৈন্য পুনরায় কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করিল। নবাবের সেনাপতি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—মিরজাফর, বীরভূমের রাজা আলি নাকি খাঁ, তদীয় সোদর আসদ জম্মা খাঁ, দেওয়ান মানিকচাঁদ ও মোহনলাল। মার্শম্যান সাহেব বলেন—হলওয়েল উপায়ান্তর না দেখিয়া নবাবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তদনুসারে নবাব-শিবির হইতে যুদ্ধ বিরতির নিশানা প্রদর্শিত হইলে, ইংরেজ সৈনিকেরা সুরাপানে উচ্ছৃঙ্খল ভাব অবলম্বন করে, এই সুযোগে বিশ্বাস-হননপূর্ব্বক নবাব সৈন্য দুর্গ দখল করিয়া লয়। ঐতিহাসিক মারেরও প্রায় এইরূপ কথা, কিন্তু থরণ্টন বা অন্য কেহ এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।' তাহা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় নবাব সেরাজউদ্দৌলা ডুলিতে চাপিয়া বাগবাজারের শিবির হইতে কলিকাতা দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার সেনানী কর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। তথায় তিনি দরবার করিয়া কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাঁহারা উভয়েই উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদাস নবাবের মনোভাব বেশ বুঝিতেন। তিনি তাঁহার ক্রোধোপশমনের সুকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহা না হইলে এত ক্রোধ, এত বিদ্বেষ একবারে কিসে গেল। উন্নতফণসর্প গর্জ্জিয়া দংশনোদ্যত হইয়াছিল, নতশির হইল কি উপায়ে। সেরাজ কৃষ্ণদাসকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দানে পরিতুষ্ট করিলেন। ইহাও সেরাজ চরিত্রের অব্যবস্থিতির পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে যেমন বহু আড়ম্বর লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয় ইহাও সেইরূপ হইল। কৃষ্ণদাসের প্রতি নবাবের ক্রোধশান্তি হইল, কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। যে কৃষ্ণদাসকে লইয়া ইংরেজ সেরাজের শত্রু, তাঁহাদের প্রতি পূর্ব্বভাবের অপচয় হইল না, ব্যাপার অত্যদ্ভুত সে পক্ষে সন্দেহ নাই। নবাবের বিশ্বাস কৃষ্ণদাসের পিতার সঞ্চিত অর্থ অসদু-পায়ার্জ্জিত, সেই অর্থ বাজেয়াপ্তির জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আশ্রয় না দেওয়া হয়। তদর্থ গবর্ণরকে অনুরোধ—সেই অনুরোধ রক্ষা হয় নাই—একে মুসলমান নবাব তাহাতে সেরাজ উদ্দৌলা। কৃষ্ণদাস যে তাঁহার নিকট মাথা বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিবেন, যতক্ষণ তাঁহার পারিতোষিক না হইয়াছিল ততক্ষণ কেহ কি তাহা মনেও করিতে পারিয়া-ছিল। যাহা হউক কৃষ্ণদাসের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইংরেজ জাতিরও বটে, নয় কেবল সেদিনের কতকগুলি অল্পায়ুঃ ইংরেজ কয়েদীর।

হলওয়েলকে বাঁধিয়া নবাবসমীপে উপস্থিত করা হইল। সেরাজ তাঁহার বন্ধনোন্মচনের আজ্ঞা দিলেন। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে "দুষ্ট গৃহস্থের দংশনশীল কুকুর" নবাবকর্ম্মচারীগণ হলওয়েলের বন্ধনে তাহারই পরিচয় দিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে অভয় দিলেন, তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই তাহাও বলিলেন, কেবল অবাধ্যতা প্রদর্শন জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন মাত্র এবং সঞ্চিত টাকা যাহা কিছু আছে বাহির করিয়া দিবার জন্য ধমকাইতে লাগিলেন। রাত্রি সাতটার পর তিনি শিবিরে প্রস্থান করিলেন—সে রাত্রির জন্য দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর দুর্গ রক্ষার ভার রহিল।

অতঃপর অন্ধকূপ হত্যার ব্যাপার। আজি কালিকার কোন কোন নবীন লেখক বলেন—নবাবের কলিকাতার লীলা খেলা এই খানেই শেষ, অতঃপর আর কিছু হয় নাই, নবাব পিতার শিষ্টশান্ত সুপুত্রের ন্যায় দুর্গলুণ্ঠিত কিছু অর্থ লইয়া আপনার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরে প্রত্যাগমন করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সেরাজ চরিত্র অতি ঘৃণ্য পতিপন্ন করিবার জন্যই "অন্ধকূপ ব্যাপার" অতি রঞ্জিত করিয়াছেন। নতুবা অন্ধকূপহত্যা আদৌ হয় নাই। সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক যাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আপত্তি নাই পশ্চাৎ তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে "অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ" নামে একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাও আজি কালি দুষ্প্রাপ্য,

* মার্শম্যান সাহেব আপনার ভারতেতিহাস লিখিবার সময় লিখিয়াছেন ইহা ২১এ জুনের ঘটনা, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন ২০এ জুনের। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই ২০এ জুনের কথা লিখিয়াছেন। এত বড় একটা ঘটনা সম্বন্ধে আরও গোলযোগ, পশ্চাৎ পাঠকগণকে সকলের কথা উদ্ধৃত করিয়া শুনাইব।

তাহাতেও সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভারতের বা বঙ্গদেশের যে সকল ইতিহাস অনুবাদিত বা সংকলিত হইয়াছে তাহাদের কোনটীতেই এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এ জন্য যত দূর সম্ভব তত দূর লিখিবার দোষ কি।

নবাব বাগবাজারে চলিয়া যাইলে ইংরেজ কয়েদীদিগকে রাখিবার জন্য স্থানান্বেষণ হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল উপযুক্ত স্থান মিলিল না। বন্দীগণকে কোথায় কিরূপে রাখিতে হইবে নবাব তাহার কোন কথাই কাহাকেও বলিয়া যান নাই—অন্ততঃ ইতিহাসে একথার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি তাহাদিগকে যে অবরোধে রাখিতে হইবে ইহারও বিশ্বস্ত প্রমাণের অভাব। থরণ্টন বলেন—উপযুক্ত স্থান না পাইবার কথা প্রকৃত, কি ভাণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। (Difficulty was found, or pretended, in discovering a proper place of security) অতঃপর দুরন্ত ইংরেজ সৈনিকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাহাদিগকে কয়েদ করিবার একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, তাহাতেই অদ্য রাত্রিতে সমস্ত কয়েদীদিগকে রাখাই স্থির হইল। ঘরটী অতি ক্ষুদ্র তাহাতে দুই চারি জন মাত্র সুবিধা মত থাকিতে পারে। কেহ বলে তাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২০ ফিট, কেহ বলে ১৮×১৪ ফিট মাত্র। সৈনিকেরা ইহাকে অন্ধকূপই বলিত। তাহার এক দিকে ছোট দুইটী মাত্র জানালা ছিল, তাহা দিয়া স্বাধীন ভাবে বায়ুর গতিবিধি হইত না। এই সংকীর্ণ গৃহে একটী স্ত্রীলোক এবং বারটী আহত সৈনিক সমেত ১৪৬ জনকে অবরুদ্ধ করা হইল। যে ব্যক্তি শেষে গৃহ প্রবিষ্ট হইল তাহাকে বল পূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইতে হইয়াছিল। সকলে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারিল না, ঠাসা ঠাসি হইল। অনেকেই অনেক প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু সে কথা শোনে কে? যাঁহার উপর দুর্গের কর্তৃত্ব ভার ছিল, তিনি হুকুম দিলেন "যে না যাইতে চাহে তাহার মাথা কাটিয়া ফেল।" যদিও মাথা কাটিয়াকেলা এবং সেই দারুন দুঃসহ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে সেই ক্ষুদ্র গৃহে ১৪৬ জনের অবস্থিতি উভয়ই তুল্য তথাপি জীবন সম্বন্ধে তিল মাত্র সময়কে তাহার সহস্র গুণ বেশী বলিয়া বোধ হয়। জীবন যতক্ষণ থাকে ততই মঙ্গল এই ভাবিয়া সকলেই তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

আষাঢ় মাসের রাত্রি, বৃষ্টি নাই, থাকিলেও তজ্জনিত শৈত্যানুভূতি ক্ষণিক মাত্র। গাছের পাতা নড়ে না, দারুণ জলাশয়ের জলও কাঁপেনা, বায়ুর সঞ্চার একবারে বন্ধ। দারুন দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্য, তাহাতে প্রাণবায়ু বিকল না হইয়া থাকে না। তাহাতে ক্ষুদ্র গৃহে বহুলোকের অবস্থান, প্রশ্বাস দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যেই গৃহস্থিত বায়ু বিষবৎ হইয়া উঠিল; সকলেরই তাহা অসহ্য হইল সকলে মিলিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিবার জন্য বল প্রকাশ করিতে লাগিল। কপাট ভিতর হইতে সহজে খুলিয়া ফেলিবার নহে; যেহেতু তাহার চৌকাট বাহিরের দিকে। সকলেই অশিষ্ট উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। হলওয়েল একটী জানালার নিকট দাঁড়াইতে পাইয়াছিলেন, তিনি সকলকেই অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজি রাত্রিতে জীবিত থাকিতে হইলে সকলকেই কায়মনে সংযত ও সুস্থির থাকিতে হইবে, তাহা হইতে যে সকলে রক্ষা পাইবে, তাহার নিশ্চয় নাই তবে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল, আর শশব্যস্ত ও অধীর হইলে অনেককেই প্রাণ হারাইতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত।" তাঁহার অনুরোধে কিয়ৎকালের জন্য রক্ষা পাইল, কিন্তু সে অবস্থায় সুস্থির থাকা অসাধারণ ধৈর্য্যশীলের কাজ, দুর্দান্ত গোরারা সহজেই চঞ্চল, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তাহারা সকলেই অশিষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। হলওয়েল জানালা দিয়া একজন বৃদ্ধ জমাদারকে দেখিতে পাইলেন, সেই তখন পাহারার কর্তৃত্ব করিতেছিল। হলওয়েল অতি কাতরভাবে তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, যদি কোন উপায়ে তাঁহাদিগকে আর একটী ঘরে ভাল করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি রাত্রি প্রভাতে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। জমাদারের প্রশান্ত মুখশ্রীতে হলওয়েলের আশার উদ্রেক হইয়াছিল, তাই তিনি এরূপ প্রস্তাবে সাহসী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ জমাদার তাঁহার কথা শুনিয়া কিয়ৎকালের জন্য কোথা চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল "নবাবের হুকুম ব্যতীত তাহা হইতে পারে না।" অনুমান হয় কয়েদীদিগের সম্বন্ধে যেন নবাবের কোন রকম হুকুম দেওয়া ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। হলওয়েল ভাবিলেন বুঝি জমাদারের

লোভ বেশী তিনি পুনরায় দুই হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন। জমাদার আবার চলিয়া গেল, আবার আসিয়া বলিল "নবাব নিদ্রিত, কেহই তাঁহাকে জাগাইতে সাহসী নহে।"

অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হইবার পরক্ষণেই অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের অনবরত ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে, তৎপরেই প্রবল পিপাসা, বক্ষে বেদনা, শ্বাস-কষ্ট, আরম্ভ হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি, প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, বায়ুর জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই গাত্র-বসন উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল আপনাপন টুপি গুলি দ্বারা বায়ুর উদ্বোধনে প্রয়াস পাইল। প্রতীকার পাওয়া গেলনা তখন সকলেই "গুলি করিয়া মারিয়া ফেল—গুলি করিয়া মারিয়া ফেল, তাও ভাল।" বারম্বার এইরূপে আর্ত্ততা জানাইতে লাগিল। শেষে পরামর্শ স্থির হইল—সকলে একই সময়ে বসিয়া, কিছু ক্ষণের পর সকলেই এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলে, হয়ত সুবিধা হইতে পারিবে। উপর্য্যুপরি তিনবার সেইরূপ করিতে করিতে কয়েক জন বসিয়া আর উঠিতে পারিল না, অন্যের পাদপিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইল। অতঃপর আবার সকলেই জানালার নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। পুনরায় দ্বার ভঙ্গের চেষ্টা হইল, তাহাতে ব্যর্থ হইল। অতঃপর কেবল "জল, জল" এই শব্দ উঠিল; বৃদ্ধ জমাদারের প্রাণ কাঁদিল। সে দুই তিন ভিস্তি জল আনাইয়া জানালা দিয়া দিতে লাগিল,* কিন্তু তাহাতে যাতনার হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি পাইল। জল দেখিয়া সকলেই "আমি আগে আমি আগে" এইরূপে জল লইতে গিয়া, কেহ ভূমিতে পড়িয়া মারা গেল, কেহ শ্বাসাবরোধে ভূলুণ্ঠিত হইল, আর উঠিতে পারিল না। জলের জন্য এতই ব্যাকুলতা যে তিলার্দ্ধ কাল কেহই বিলম্ব সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। একে একে সকলকে দিতে পারিলে এরূপ ঘটিত না। জল আজি জীবনের বিনিময়ে বিকাইয়া জীবন নাম সার্থক করিয়া লইল। নবাব সেনার কেহ কেহ, বোধ হয়, জানালার ভিতর দিয়া আলো ধরিয়া গোরাদের জল কাড়াকাড়ি দেখিয়াছিল হয়ত কোন কোন নিষ্ঠুর কৌতুক বোধে হাস্যও করিয়া থাকিবে। তাই ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃদ্ধ জমাদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "দয়ার পরিবর্ত্তে তামাসা দেখিবারই জন্য অত্যল্প জল জানালার গরাদের ভিতর তাহারা দিয়া দিয়াছিল। পরিশেষে যাহারা জানালার কাছে ছিল তাহারা টুপিতে করিয়া জল লইয়া পশ্চাতের লোকদিগকে দিতে লাগিল। জলে পিপাসা শান্তি হইল না। বহির্বায়ুর অভাবে প্রাণ বায়ু বিকল হইয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে অন্ধকূপে অবরুদ্ধ অনেকেই প্রাণ হারাইল। দুইটার সময় পঞ্চাশ জন মাত্র রহিল। কি ভয়ানক দুর্ঘটনা। ইহা অপেক্ষা ফাঁসি বা শূলে চাপাইয়া মারিলেও তাহাদিগের এত যাতনা হইত না। এই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী পৃষ্ঠে এরূপ অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে যাহাতে নরশোণিতের নদী বহিয়া গিয়াছে কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্করী প্রাণাপহা ঘটনা কোথাও ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। আষাঢ়ের হ্রস্ব তমস্বিনী অন্ধকূপাবরুদ্ধ কয়েদীগণের পক্ষে দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাত্রি যেন আর ফুরায় না। ক্রমে হলওয়েল হতচেতন হইয়া পড়িলেন, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছিল; উষার ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে পূর্ব্বাশার পরিষ্কৃত হইতে না হইতেই কয়েদীগণ মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রহরীদিগের কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কৌন্সিলের সেক্রেটরী কুক সাহেব ভাবিলেন হলওয়েলের কথা বেশী ভার বোধ হইতে পারে—তিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার আসন্ন মৃত্যু। তখনও নাসায় নিশ্বাস বহিতেছে। তাঁহাকে জানালার নিকট আনিবার চেষ্টা করিলে যাহারা সেখানে ছিল, তাহারা সরিতে চাহিল না; অবশেষে কাপ্তেন মিলস্ আপনার জায়গা ছাড়িয়া জানালার নিকট হলওয়েলকে স্থান দিলেন। সুখ স্পর্শ সুমন্দ বায়ু সেবনে হলওয়েলের চেতনা সঞ্চার হইতেছিল, এমন সময় রাত্রি

* He applied to an old Jemadar, who bore some marks of humanity in his countenance * * * The good Jemadar immediately ordered some skins of water to be brought to the windows. Bengal obituary, Page 4.

The Jemantdars, or Indian guards were walking before the window, and Mr. Holwell seeing one who bore on his face a more than usual expression of humanity * * * The humane Jemantdar pushed through the bars several skins of that liquid.

Murray's History of British India.

প্রভাত হইল। ধীরে ধীরে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কি ভীষণ দৃশ্য, কারাগৃহ শ্মশানে পরিণত—শবরাশিতে গৃহ পরিপূর্ণ—কাহার দন্ত বহির্গত কাহার নেত্র নির্গত—সেই শব স্তূপের উপর তেইশটী মাত্র অর্দ্ধমৃত মনুষ্য দণ্ডায়মান, তাঁহাদের মুখে দুঃখের চিহ্ন—গৌরকান্তি ইংরেজের মুখশ্রী পাণ্ডুরোগীর ন্যায় প্রতিভাশূন্য—দ্বার উন্মুক্ত হইলে তাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের সুখানুভব করিল। হলওয়েল চলৎ শক্তি রহিত—নবাব সমীপে নীত হইলে নবাব তাঁহাকে বসিবার আসন ও পানীয় জল আনাইয়া দিলেন মাত্র, অন্য কোন সহানুভূতির কথা কহিলেন না।* অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা নবাবের এই মনুষ্যত্বের কথাটীও স্বীকার করিতে চাহেন না। ভারতেতিহাসে মার্শম্যান বলেন—"নবাব বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বা রাত্রির দুর্ঘটনার জন্য কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই বরং দুর্গস্থিত ধন অর্থ লুক্কায়িত রাখিবার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন।" কিন্তু বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তিনিই বলিয়াছেন—"এই দুর্ঘটনার কথা পৃথিবীর সকল দেশের লোকের মনে চিরদিন জাগরূক থাকিবে, কেবল ইহারই জন্য সেরাজউদ্দৌলা নিষ্ঠুরতার রাক্ষসাবতার বলিয়া গণনীয় হইবেন। কিন্তু তিনি পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। যত কিছু দোষ সমস্তই মাণিক চাঁদের তাঁহারই উপর সে রাত্রিতে দুর্গরক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল।"

ঐতিহাসিক মারে সাহেব বলেন—হলওয়েলের মনের ভাবে বোধ হয়, নবাবের এই ভয়ানক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটাইবার ইচ্ছা ছিল না, নবাবের নিম্নপদস্থ কোন কোন কর্ম্মচারী এই সুবিধা পাইয়া প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইয়া থাকিবে। আরও কয়েকজন ইংরেজ বন্দী এইরূপ কথা প্রকাশ করায় থরণ্টন সাহেব তাহাদের দেবত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসী হইয়াছেন। অনেকেরই এই মত দেখিয়া ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ সেরাজকে অন্যান্য বিষয় লইয়া ঘোরতর অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে ত্রুটী করেন নাই। তাহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন—ভৃত্যের ব্যবহারেই প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। সেরাজ দুর্ব্বল ও দুর্ম্মতি না হইলে তাঁহার ভৃত্যেরা দুষ্ট ও দুরাশয় হইত না। তাঁহারা ইংরেজ কয়েদীদিগের অবরোধ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রভুর অনুমোদিত হইবে না নিশ্চতই জানিতেন। সে যাহা হউক হলওয়েল যে অন্ধকূপ হইতে বহির্গত হইয়া সেরাজের নিকট এক গেলাস জল ও বসিবার আসন পাইয়াছিলেন ইহাই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি—ইংরেজ গবর্ণরের সহিত নবাবের চাক্ষুস ব্যবহার এই সর্ব্ব প্রথম।

সেরাজ দুর্গমধ্যে ৫০ হাজার টাকার বেশী পাইলেন না, মনে করিয়াছিলেন প্রভূত অর্থ লাভ হইবে কিন্তু তাহা ঘটিল না বলিয়া হলওয়েলের উপর কিছু ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবাব নয় দিন কাল কলিকাতার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিয়া দেওয়ান মাণিক চাঁদের উপর কলিকাতার সমস্ত ভারার্পণে মুর্শিদাবাদ-যাত্রা করেন, যাইবার পূর্ব্বে হলওয়েল ও আর তিন জন ইংরেজকে মুর্শিদাবাদে

* Mr. Holwell being revived by the fresh air, was immediately supported into the presence of the Nabab, who in beginning the dismal tale, ordered for him a seat and a dr aught of water, but showed no other mark of sympathy.

M urray's History of British India.

When Mr. Holwell was borne into his presence, he manifested no compassion for his sufferings, nor the least remorse for the fate of the other prisoners, but reproached him a new with the concealment of the public treasure, and ordered him to be placed in confinement.

Marshman's History of India.

Seraj-ood-dowla has passed as a monster of cruelty chiefly on this account. But he knew nothing of this deed of darkness, till the next morning. The whole blame rested on the Hindoo, manik chand, who had been left in charge of the fort for that night.

Marshman's History of Bengal.

Holwell seems of opinion that the Nabob had no actual intention of causing the dreadful catastophe, but that some inferior officers had seized this opportunity of gratifying their revenge.

Murray's History of British India.

But these apologetic suggestion, however creditable to the generosity of the sufferers, can do little to relieve the character of the man under whose authority this wholesale murder of prisoners took place. The character of the officers of government is in a great measure determined by that of those whom they serve, and if the servants of Seraj-od-dowla exercised any discretion in the choice of a prison, it may safely be concluded that their choice was made under a full impression that it would not be disagreeable to their master.

Thorouton's History, of British Empire in India.

পাঠাইয়া দিয়া এবং অন্ধকূপ বন্দিনী সেই ইংরেজ মহিলাটীকেও তাঁহার অন্তঃপুর বাসের জন্য সঙ্গে লইয়া যান। চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজ ফরাসডাঙ্গার ফরাসীরাও অমনি যান নাই—নবাব তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

---

## তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে কয়েকজন ইংরেজী ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থ হইতে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি এখন দেখা যাউক অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটী কতদূর প্রামাণিক, এবং তাহার প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই বা কত দূর সঙ্গত। ইংরেজ গবর্ণর হলয়েলকে অভয়দানের পর হইতে আরম্ভ করিয়া নবাবের আপন শিবিরে প্রত্যাগমন, নবাব কর্ম্মচারীর কারাগৃহ নির্ব্বাচন, ইংরেজ বন্দীগণের অন্ধকূপে প্রবেশ, দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে তাঁহাদের কাতরতা, উৎকট পিপাসার্ত্ততা দর্শনে প্রহরী জমাদারের কারুণ্য, ও তৎপ্রশমনের উপায় বিধান, অর্থলোভ বা পরদুঃখকাতরতা দর্শনে তৎপ্রতীকার চেষ্টা, পরদিন প্রাতঃকালে নবাব কর্ত্তৃক হলওয়েলের প্রতি কথঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা যেরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অন্ধকূপ হত্যা যে একবারে হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে কি প্রবৃত্তি হয়?—সত্য বটে অনেক ইংরেজী ঐতিহাসিক ও সমালোচকএই ঘটনাটীকে অতিরঞ্জিত করিয়া সেরাজ-চরিত্রকে অতিবড় ঘৃণিত ও কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তদুপলক্ষে অনেক অপ্রকৃত বিষয়ের সমাবেশও করিয়াছেন, সেরাজের আজ্ঞানুসারেই যে অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল এ কথা স্পষ্টতঃ বলিতে না পারিলেও ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তাহা তাঁহাদের স্ব কপোলকল্পিত। সেরাজের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাবের উত্তেজনার জন্যই যে তাঁহাদের এরূপ চেষ্টা যত্ন সে পক্ষে সন্দেহ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সেরাজ-চরিত্রের কোন অংশই প্রশংসিত নহে, তবে অন্ধকূপহত্যা যে তাঁহার অনুমোদিত বা অনুজ্ঞাত তাহারও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই।

শস্যবহুলা বঙ্গভূমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—স্বর্ণভূমি বলিয়া ইহা জগদ্বিখ্যাত। বঙ্গের মাটীতে সোণা ফলে একথা দিগ্‌দিগন্তরের লোকে জানে। পৃথিবী মধ্যে এরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্র কুত্রাপি নাই। যে দিন হইতে ইহা পাশ্চাত্য জাতিগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার অধিকার-লালসা তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রজ্জলিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা শৈত্যসঞ্জাত দেহ ধারণে এই কর্কট ক্রান্তির দারুণ দুঃসহ তাপে দগ্ধ হইতেও কুণ্ঠিত নহেন। বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে গতিবিধি করিতে করিতে তাঁহারা অসম্বৃত লোভে অস্থির হইয়া উঠেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এডমিরাল নিকলসন্ ভারতাধিকারার্থ দ্বাদশ খানি রণপোত লইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেন,—"আদার ব্যাপারী" হইয়াও তাঁহারা জাহাজের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎকালে এদেশে আরঙ্গজেবের আমল—মোগলের সৌভাগ্যসূর্য্য উগ্রমূর্ত্তিতে নৈদাগগগণের উর্দ্ধতম বিন্দুতে বিরাজমান। "ঝোপ বুঝিয়া কোপটী" করা হয় নাই, তজ্জন্য ইংরেজকে এ যাত্রা ব্যার্থ হইতে হইয়াছিল, তথাপিও ভারতের প্রতি ইংরেজের অসম্বৃত লোভের ভ্রম পরিহার হয় নাই। তাঁহারা যে তখন হইতে ভারতের অধিকার লোলুপ ছিলেন তাহা আর কাহার কি বুঝিতে বাকী ছিল? কিছু দিন পরেই মোগলের প্রতি কমলার অকৃপা হইল, সিংহের বংশে শৃগালের উদ্ভব হইতে লাগিল। দীল্লীশ্বর হীনবল হইয়া পড়িলেন,—বঙ্গেশ্বরের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। সেরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইংরেজের নিকট হইতে রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, নবাব তাহার প্রতিকারার্থ সসৈন্যে কলিকাতায় আসিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন, পরিশেষে তাহা ভস্মীভূত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, ইহাতে শত শত ঋদ্ধিমান কলিকাতাবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, কত নরনারী, বালক বালিকা পুড়িয়া মরিল। অন্ধকূপ হত্যায় যে ১২৩জন ইংরেজ প্রাণ হারাইবার কথা শুনা যায়, যদি তাহা মিথ্যা হইত তাহা হইলে নবাবের অত্যাচারকে গুরু হইতেও গুরুতর করিবার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ঐ ১২৩ জনকে কলিকাতা দাহ দগ্ধ—অথবা দুর্গবেষ্টন করিয়া তাহারই মধ্যে পুড়াইয়া মারিবার কথা লিখিতে পারিতেন।

আবার অন্ধকূপের ন্যায় একটা নূতন নাটকের কি প্রয়োজন ছিল—সুচতুর চিত্রকরে রংটা একটু ভাল করিয়া ফলাইয়া কায়দার সহিত তুলিকা ধরিলে কলিকাতা দাহের চিত্রটীও বেশ উত্তরাইতে পারিত।

অন্ধকূপ হত্যার জন্যই ড্রেকের চরিত্র চিত্র অতিবড় বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকূপ হত্যা না হইলে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ড্রেকের কাপুরুষতা ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার জন্য তাঁহাকে এতাধিক লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিতেন না। ড্রেকও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। তিনি যে সকল স্বজাতীয়কে নিরাশ্রয় ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন তাহারা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে নিন্দনীয়ও হইতে হইত না। অন্ধকূপ হত্যার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—অন্ধকূপ হত্যা সত্য হইলে ইংলণ্ডের তদানীন্তন ডিরেক্টর সভার সেরেস্তায় তৎসম্বন্ধীয় পত্রাদিও খুঁজিলে মিলিত। একথা কতদূর সঙ্গত একবার দেখা যাউক—ড্রেক সাহেব পলাইয়া যারপর নাই কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সংবাদ পাঠাইতে তিনিই এরূপ স্থলে তিনি কি লিখিতে পারেন যে—"শত্রুসৈন্যে নগর বেষ্টন করিলে আমি কমাণ্ডার মিঙ্কিনকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছি—আরও কতকগুলি লোক আমাদের পলাইয়াছিল, বাকী ১৪৬ জনকে অবরুদ্ধ দুর্গে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহাদের কি হইয়াছে কিছুই বলিতে পারি না অথবা শুনিয়াছি যে নিষ্ঠুর নবাব তাঁহাদিগকে অন্ধকূপ নামক সংকীর্ণ কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছে, বাকী হলওয়েল সহ ২৩ জন বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাঁহারা কে কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছে তাহার কিছুই জানি না।" এ সংবাদ ড্রেকের লিখিয়া পাঠান কতদূর সম্ভব এবং সঙ্গতপর। হলওয়েল? তিনিত বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে—তবে আর অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ কে পাঠাইবে। মান্দ্রাজে যে সংবাদ গিয়াছিল তাহাও ম্যানিংহামের বাচনিক বলিয়াই বোধ হয়। তিনিও মান্দ্রাজ যাত্রার পূর্ব্বে অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই কিরূপে তাহা বিলাতে লিখিয়া পাঠাইবেন। এই জন্যই বিলাতের ডিরেক্টর সভার সেরেস্তার কাগজ পত্রে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সম্বন্ধে কাগজ পত্র না থাকিতেই পারে।

অতঃপর সৈর-ই-মুতাক্ষরীণ নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসের কথা—তাহাতেও অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই নাই। পাশ্চাত্য জাতির নিকটই ইহা একটা অতীব বিসদৃশ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত, মহানুভব আকবর সাহ ব্যতীত শত্রুর প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন বা সমর্পিতাত্ম শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে মুসলমানদের অন্য কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা জানিতেন যে,যে শত্রু সে শত্রুই—যে কোন প্রকারে তাহার নিধন সাধন করিতে পারিলেই প্রকৃত শত্রু-ধর্ম্ম পালন করা হয়, তাহা যেপ্রকারেই হউক,—নবাবের কলিকাতা বিজয়ে তাহাই হইয়াছিল ইহাতে আর অসাধারণত্বই বা কি আছে? যদিই সৈর-ই-মুতাক্ষরীণ লেখকের মনে অতি বড় অন্যায় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি ত মুসলমান তাঁহার কি স্বজাতি বাৎসল্য ছিল না যে, তিনি নবাবকে নিতান্ত নিষ্ঠুরাচারী প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে কিছুমাত্র যত্ন লয়েন নাই। তাঁহার একদেশদর্শিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন—'তৎকালিন মুসলমান ইতিহাস লেখক ঘৃণাক্ষরেও এই নৃশংস অত্যাচারের উল্লেখও করেন নাই।"

হলওয়েলের প্রাণ নিতান্ত কষ্টসহ তাই তিনি অন্ধকূপে বাঁচিয়া মুর্শিদাবাদে বন্দীত্ব সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন॥ শুধু তাহাই নহে "ষষ্ঠীর দাস" হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বৎসরে নর জন্মের অনেক সাধ মিটাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি এদেশে থাকিতে থাকিতেই অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি রক্ষার্থ মহানগরী কলিকাতা মধ্যে একটী স্মৃতিস্তম্ভ উত্তোলন করিয়া তাহাতে একখণ্ড প্রস্তর সংলগ্ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে,—

To the Memories of :—Edward Eyre and Ballie Esqrs. The Rev. Jervas Bellamy; Messrs. Jenks, Reevely, Law, Coates, Nalcourt, Jebb, Torrians, E. Page, S. Page, Grub, Strut, Harod, P. Johnstone, Ballard, N. Drake, Carse, Knapton, Gosting, Dod and Dalrymple, Captains Clayton, Buchanan, and Witherington; Lieutenants Bishop, Hays, Blagg, Simpson and J. Bellamy; Ensigns Paccard, Scott,

Hastings, C. Wedderburn, and Dumbleton ;
Sea-Captains Hunt, Osburn, and Parnell,
Messrs Carey, Leech, Steavenson, Gay,
Porter, Parker, Canlkar, Bendal, and
Atkinson, who with Sundry other
inhabitants military and militia
to the number of 123 persons, wore
by the tyranic violence of
Suraj-ud-Dowlah, Suba of Bengal,
Suffocated in the Black Hole
prison of Fort-William on the
night of the 20th day of June 1756
and promiscously thrown the
Succeeding morning into the
ditch of the ravelin of this place.
This monument is erected by their surviving
Fellow Sufferer
J. E. Holwell.
This horrid act of violence was amply
and deservedly revenged on
Suraj-ud-Dowlah by
His majesty's arms under
the conduct of
Admirel Watson and Colonel Clive
amo 1757.

এই স্মৃতিস্তম্ভটী ট্যাঙ্ক স্কোয়ার নামক তৎকাল পরিচিত স্থানের ঈশান কোণে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ১৮১৯ অব্দে উহা ভগ্ন করা হয়। পাশ্চাত্য জাতি মাত্রেই প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির ও স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার বড়ই পক্ষপাতী। কোন কবির প্রিয় কুকুরের স্মরণার্থ তিনি তাহার সমাধির উপর একখানি প্রস্তরে একটী কবিতা খোদিত করাইয়া দিয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যাকে ইংরেজের একটী জাতীয় দুর্ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহার স্মৃতিস্তম্ভের যে এরূপ অনাদর হইবে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ইংরেজ আজি সমগ্র ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী। বনিকবৃত্তি অবলম্বনে এদেশে অবস্থিতি কালে অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ দারুণ দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন ভারতে তাঁহাদের সেই এক দুর্দ্দিন, আর আজি কি সুখের দিন। যে ইংরেজ একদিন প্রণষ্ট গৌরব নামে মাত্র দীল্লির বাদসাহের কৃপা ভিক্ষার্থী ছিলেন আজি তাঁহারা সেই ভারতবর্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা, একছত্রীরাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী—মনুষ্যের দুঃখের অবস্থার পরে সুখের দশা এবং সুখের পর দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হইলে অতীত স্মৃতির সমাদর হয় অতীত কথা দশ জনকে শুনাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি উত্তেজনার চেষ্টা হয়, এই সুখ দুঃখের কাহিনী অন্যকে শুনাইবার জন্য স্বভাবতঃ একটা কেমন আগ্রহ হয়—তাহাতে যেন মনে অনেকটা আত্মপ্রসাদ জন্মে। ইংরেজ তাই অন্ধকূপ হত্যার প্রণষ্ট স্মৃতিচিহ্নের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসী। এতদিনের পর সেরাজের স্কন্ধ হইতে অন্ধকূপ হত্যার দোষ অপসারিত করিবার প্রয়াস যে কত দূর কার্য্যকরী হইবে তাহাও বলা যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই পূর্ব্ব হইতে তাহা সারিয়া রাখিয়াছেন—অন্ধকূপ হত্যায় সেরাজ যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তিনি ঘৃণাক্ষরেও জানিতেন না যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে। ইংরেজ বন্দীগণকে যথারীতি রক্ষা করা হইবে ইহাই তিনি জানিতেন, দৈবাৎ মাণিকচাঁদের দোষে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য, মনে যাহাই থাকুক, মনুষ্যত্বের খাতিরে হলওয়েলকে যেন তৃষ্ণায় জল, বসিবার আসন দেওয়া হইয়াছিল, তেমনি তাহার উপর একটু বাচনিক সৌজন্য দেখাইয়া মাণিকচাঁদকে দুকথা কড়াভাবে শুনাইয়া দিলেই হইত, যাহা হইয়া গিয়াছিল তাহাও আর শুধরাইবার উপায় ছিল না,—কিন্তু ইহা যে চতুরের কাজ, সেরাজ কি তাহা বুঝিতেন—ইহাই তো রাজনৈতিক চালাকী, সেটুকু সেরাজের ন্যায় শাসন কর্ত্তার নিকট প্রত্যাশা করা যায় না,—তিনি যে তাহা করেন নাই, ইহাই বলিবার কে আছে, ফলে তাঁহার অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া মনে হয় তাঁহার দ্বারা সে কাজ হয় নাই, এবং হইবারও নহে।

অন্ধকূপ হত্যার নিশাবসানে যখন হলওয়েল কোর্ট ও ওয়ালিকট নামক তিন জন ইংরেজকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ স্থির হইল তখন বাকী কুড়ি জন যথা ইচ্ছা তথা

যাইবার অনুমতি পাইলেন, তাঁহারা ইংরেজদিগের জাহাজে যাইবারই চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে গঙ্গার ধারে নবাবের লোকেরা সশস্ত্র দাঁড়াইয়া আছে সে দিকে যাইলেই হত্যা করিবে। ছযুগে লোক সকল সময়, সকল স্থানেই থাকে—যদি তাহাই হইবে, তবে নবাব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া নবাব সেই খানেই ত হত্যা করিতে পারিতেন। সেই সকল অভয় প্রাপ্ত ইংরেজকে কয়েক জন বাঙ্গালী আপনাদের বাড়ীতে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করে—সেই সকল বাঙ্গালী ইংরেজদের কলিকাতার কুঠীতে কাজ করিত, বাঙ্গালী চির দিনই পর-দুঃখ-কাতর—পরের দুঃখ দেখিলে সকল সময়, সকল অবস্থাতেই তাহারা সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই পরোপকারপরায়ণ বাঙ্গালীকে মেকলে সাহেব জগতের চক্ষে কত দূর নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা পতনের সংবাদ লইয়া ম্যানিংহাম সাহেব ৫ই আগষ্ট মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়েন। তৎপূর্ব্বে ১৫ই জুলাই নবাব কর্ত্তৃক কাশিমবাজার লুণ্ঠনের সংবাদ তথায় পঁহুছিয়াছিল। তজ্জন্য ২৩০ জন সেনার অধ্যক্ষ করিয়া মেজর কিলপ্যাট্রিককে তথায় পাঠান হইয়াছিল। ইহা যুদ্ধের আয়োজন নহে, নবাবের ক্রোধ শান্তির জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যাহাতে তত্রত্য কুঠির কাজ নিরুপদ্রবে চলে তাহারই ব্যবস্থা করিবার কথা উক্ত সেনাপতিকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চাৎ ম্যানিংহামের মুখে পতনবার্ত্তা অবগত হইয়া মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সর্ব্বপ্রথমে "হা হতোঽস্মি" করিয়া পড়িয়াছিলেন। কোম্পানীর বহুল অর্থ ক্ষতি, অনেকগুলি স্বজাতীয়ের জীবনহানি, সর্ব্বোপরি তাঁহারা যে ইজ্জতের (Prestigeএর) জন্য প্রাণ দিতেও অকাতর, সেই প্রেষ্টিজ নষ্ট! নবাবের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইলে উপকূলস্থ অধিকার নিরাপদ থাকে না। মান্দ্রাজ কৌন্সিলের অনেকেই গায়ের রাগ গায়েই মারিবার চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অর্ম্মি এই সময়ে উক্ত কৌন্সিলের একজন মেম্বর ছিলেন, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না—তাঁহার মনে প্রতিহিংসাবৃত্তি বলবতী হইল, বিপুল বিক্রমের সহিত নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য তিনি জেদ ধরিলেন। ইহাতেই বোধ হয় অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ তৎকালে মান্দ্রাজে পঁহুছে নাই—তাহা হইলে কি যুদ্ধযাত্রায় কাহারও অমত হইত। ড্রেকের মত লোক ইংরেজের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা বলিয়া সকলেই যে তাঁহার মত, একথা কখন বিশ্বাস করা যায় না।

অনেক বাদ প্রতিবাদের পর অর্ম্মির মতই প্রবল হইল—নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাই স্থির হইল, আডমিরাল ওয়াটসনকে নৌসেনার অধিনায়কত্ব দিবার ব্যবস্থাই ঠিক হইল কিন্তু স্থলযুদ্ধের কর্ত্তৃত্ব কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা অনেক হইল। মান্দ্রাজের গবর্ণর পিগট সাহেব আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তিনি আপিশ আদালতের কাজেই মজবুৎ ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া সকলের তাহাতে মত হইল না। তাঁহার পরে অল্‌ভারক্রণ সাহেবের কথা উঠে, তিনি লোক উপযুক্ত বটে, কিন্তু এদেশে নূতন, কাজেই এদেশ সম্বন্ধে তাদৃশ অভিজ্ঞতা ছিল না কর্ণেল লরেন্স সকল বিষয়েই উপযুক্ত বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া তিনি অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অর্ম্মিই অভ্যুদয়শীল ক্লাইবকে পাঠাইবার কথা তুলিলেন,—ক্লাইবের চিরবন্ধু লরেন্স সম্মতি প্রদান করিলে, কেহ আর অমত করিলেন না, ক্লাইবের আসা ঠিক হইয়া গেল। অতঃপর কথা উঠিল কলিকাতার গবর্ণর ও তত্রত্য মেম্বরগণের সহিত অভিনব সেনাপতির কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে। তিনি অধীন ভাবে কাজ করিবেন কি, যেরূপ সুবিধা বিবেচনা করিবেন, সেইরূপে আপন বিবেচনা মত চলিবেন। নানা গোলযোগে দুই মাস কাল কাটিয়া গেল। শেষে স্থির হইল কলিকাতা কৌন্সিলের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎই থাকিবে, কিন্তু সৈনিক কার্য্যে ক্লাইব সর্ব্বে সর্ব্বা হইবেন। তাঁহাকে কাহার মুখাপেক্ষী হইয়া কাজ করিতে হইবে না পলায়নপটু ম্যানিংহামের তাহা সহ্য হইল না, তিনি প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা কে শোনে, আপত্তি টিকিল না।

ওয়াটসনের অধীনে পাঁচখানি রণপোতের অতিরিক্ত আর পাঁচ খানি জাহাজ ১৬ই অক্টোবর মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। এই দশ খানি জাহাজে সর্ব্বসমেত নয় শত গোরা এবং পনর শত দেশীয় সেনা

ছিল। কিন্তু অল্‌ডার ক্রণ জেদ ধরিলেন, তাঁহাকে আসিতে না দিলে তিনি রাজকীয় কামান ও যুদ্ধোপকরণ ছাড়িয়া দিবেন না। অগত্যা তাহা না লইয়া ইংরেজ-বাহিনী বঙ্গোপসাগরে পাড়ি মারিল। শরৎকালীন ঝড়-বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া ২০এ ডিসেম্বর তাঁহারা কলিকাতার দশ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী ফল্‌তা নামক স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন। "কাম্বেরলণ্ড ও মার্‌লবরো নামক দুইখানি জাহাজের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ঐ দুই খানি জাহাজেই অধিকাংশ যুদ্ধোপকরণ ছিল। বলা বাহুল্য যে কলিকাতা দুর্গ হইতে পলাতক ইংরেজেরা এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মেজর কিল্‌প্যাট্রিকও ইতি পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া আড্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাহাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল—তাঁহার সেনাগণ এদেশের তৎকালিক জল বায়ুতে অসুস্থ হইয়া প্রায় অর্দ্ধেকগুলি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, বাকী অর্দ্ধেকের মধ্যে কেবল মাত্র ত্রিশ জন কার্য্যক্ষম ছিল, অবশিষ্ট সকলেই পীড়িত। এই সময়ে বোম্বাই হইতে দুই জাহাজ সৈন্য আসিয়া পঁহুছিবার কথা ছিল, কিন্তু ক্লাইব কাহার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার নবানুরাগ, আর্কটের উৎসাহে তাঁহার মন উৎফুল্ল। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বে চড়কের সন্ন্যাসীরা যেমন পৃষ্ঠে লোহার কাঁটা চালাইয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, ক্লাইবের ব্যগ্রতা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। তিনি কাহারও বা কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কলিকাতা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ইহাঁরই বলবিক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের জয়শ্রী লাভ হয়, ইংরেজ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েন এই ক্লাইবই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মান্দ্রাজস্থ কুঠির একজন সামান্য কেরাণী হইয়া এদেশে আইসেন, এদেশে আসিয়া তাঁহাকে কেরাণীর কাজ ভাল লাগিল না। তাঁহার জন্য কীর্ত্তি-দেবী কোল বাড়াইয়া ছিলেন, খড়্গখর্পরধারিনী রণোন্মাদিনী মহাশক্তি তাঁহাকে বিপুল বলে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন ক্লাইবের দেহে এখন যেন তিনি শত হস্তীর বল হইয়াছিল।

ক্লাইব বাল্যকালে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই মসিজীবী হইবার যে বিদ্যা টুকুর প্রয়োজন তাহারই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও উচ্চ অঙ্গের নহে। হয়ত তিনি বাল্যকালে ভাল করিয়া বন্দুক ধরিতেও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাবান্ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রতিভা আপনা হইতেই প্রস্ফুরিত হয়, কিছুরই অপেক্ষা করে না। দৃষ্টান্তের জন্য দূরদেশে যাইবার প্রয়োজন কি? পশুপালক হাইদরআলিকে বাল্যকালে কে যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষা দিয়াছিল? মুর্শিদ কুলিখাঁ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি কিরূপে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবী করিলেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানে ফুলচন্দন লইয়া যাঁহার পূর্ব্বপুরুষের জীবন পাত হইয়াছে, সেই মুর্শিদকুলিখাঁর সমর তৃষ্ণা কিসে জন্মিল, কে আনিয়া ছিল, কোথা হইতে আসিল? ছত্রপতি শিবজীর কথাটাও তো একবার চিন্তা করিলে হয়। প্রতিভা জাতিকুল মানে না, অবস্থা মানে না, বিপদ আপদকে গণে না, বাধা বিঘ্ন মানে না, আপনার তেজে আপনিই বিকাশ পায়। ক্লাইবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল।

এই সময় মধ্যে সেরাজউদ্দৌলার কথা যেন আমরা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সেরাজ অন্ধকূপে যে ইংরাজ রমণী-রত্নলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, কলিকাতা দুর্গে যদিও তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী পান নাই, কিন্তু উমিচাঁদের গৃহ লুণ্ঠনে চারি লক্ষ টাকা মিলিয়াছিল। তদতিরিক্ত কলিকাতার অন্যান্য ঋদ্ধিমান ব্যক্তির গৃহে যাহা কিছু ছিল তাহাতে তাঁহার সেনাপতিও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণেরই থলি ভারী করিয়াছিল। আসিবার সময় চন্দননগরের ফরাসিরা সাড়ে তিন লাখ এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা সাড়ে চারিলক্ষ টাকা না দিয়া থাকিতে পারিল না। তাঁহাদের উপর বিলক্ষণ জোর জবরদস্তি করিবার ভয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। যদিও টাকার জন্য পীড়াপীড়ি কম হয় নাই, কিন্তু সেরাজ নানা রকমে প্রায় চৌদ্দ পনর লক্ষ টাকা পাইয়া যত না সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কলিকাতা বিজয়ে। তিনি মুর্শিদাবাদে পঁহুছিয়াই দীল্লির বাদশাহকে মহাড়ম্বরে আপনার বিজয়বার্ত্তা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন ইংরেজকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন। বাল্যাবধি তিনি যে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন এত দিনে তাহা সার্থক করিতে পারিয়া আনন্দে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন,আপন ভুজ বল পরিচয়ে আপনিই অস্থির হইয়াছিলেন। একে নূতন নবাব নূতন উৎসাহ—যে শত্রুকে মাতামহ পর্য্যন্ত মানিয়া চলিতেন তাহাদিগকে নির্জ্জিত ও নিষ্পীড়িত করিয়া দেশত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন। আর যে তাঁহারা পুনরায় যুদ্ধার্থী হইতে পারিবেন, এ আশাকে তিনি একবারেই মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে দশ হাজারের বেশী লোক নাই! জয়দর্পিত সেরাজ কি আরও মাতৃস্বস্রেয়র বিনাশ সাধনে ক্ষান্ত থাকেন—বেরিয়া নামক স্থানের যুদ্ধে সফৎজঙ্গের বিনাশ সাধন করিয়া আপনাকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ক্লাইব ফল্তা হইতে নবাবের কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারীকে অতি উৎকট ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দেন, কলিকাতার তদানিন্তন শাসন কর্ত্তা মাণিক চাঁদ তাহা নবাবকে পাঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না।

২৭এ ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব সসৈন্যে আয়াপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আপন সৈন্য স্থলপথে পরিচালনা করিলেন। পথিমধ্যে বজবজ নামক স্থানে নবাবের যে একটী দুর্গ ছিল তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম, তাহাতে সৈনিকদিগের এক একজনকে দুইটী করিয়া বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণে গুলিবারুদ আপনাপন স্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছিল। ফল্তার ইংরেজ কৌন্সিল নবাবের ক্রোধোদ্দীপ্তির আশঙ্কায় ক্লাইবকে তাঁহার যুদ্ধোপকরণ বা অন্যান্য জিনিষ পত্র লইয়া আসিবার কোন সাহায্যই করিতে পারেন নাই *। ঐতিহাসিক থরণ্টনের এই কথাটা কেমন কেমন লাগে। যাহাই হউক ক্লাইবকে অতি কষ্টেই ফল্তা হইতে বজবজের পথে আসিতে হইয়াছিল। পাঁচ ক্রোশ পথ আসিতে ষোল ঘণ্টা লাগিয়াছিল। দিবা অবসান হইল, অতঃপর সেনাগণ বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হইল, আর চলিতে পারিল না। নিদ্রাতুরের শয্যাজ্ঞান থাকে না, সকলেই আপনাকে লইয়া অধীর, সকলেই শয়ন করিল, কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা হইল না। কলিকাতার শাসনকর্ত্তা মাণিক চাঁদ ইংরেজ সৈন্যের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া—সসৈন্যে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে ইংরেজ সৈন্যকে নিদ্রিতাবস্থায় পাইয়া তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা চমকিতভাবে সকলেই জাগ্রত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, ক্লাইব তৎক্ষণাৎ সাজিয়া দাঁড়াইলে—উভয় পক্ষেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। মাণিক চাঁদ হস্তী পৃষ্ঠে ছিলেন, ইংরেজের বিক্ষিপ্ত একটী গোলা তাঁহার উষ্ণীষ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, ভয়ে অস্থির হইয়া মাণিক চাঁদ কলিকাতায় ফিরিলেন, সৈন্যগণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে তাঁহার অনুগমন করিল। মাণিক চাঁদ কয়েক ঘণ্টামাত্র কলিকাতায় থাকিয়া মুর্শিদাবাদের পথে পলাইলেন, কলিকাতা রক্ষার জন্য পাঁচশত মাত্র সৈন্য রহিল, বাকী তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছিল।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে আর ভাল হয় না, যদিও মাণিক চাঁদ প্রাণ হারাইতে হারাইতে আপনাকে বাঁচাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য আর সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না, একটা মাতাল সৈনিক নেশার ঝোঁকে বজবজের কেল্লার পরিখায় পড়িয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে তাহা সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া দুর্গ প্রাচীরে উঠিয়া দেখে তন্মধ্যে কেহই নাই—মাতাল সৈনিক মাতলামি করিয়া বলিতে লাগিল—"আমি একাই কেল্লা ফতে করিয়াছি।" বারম্বার এই কথা বলিতে শুনিয়া অনেকেই গিয়া দেখিল প্রকৃতই তাহাতে কেহই নাই—সকলেই পলাইয়াছে। পরে তিনি স্থল পথেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন, তাঁহার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রণপোত কয়েক খানি কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে পঁহুছিয়াছিল। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য কলিকাতাতেও কেহ ছিল না। ইংরেজ সৈন্য তীরে উঠিয়াই নিরাপত্তিতে দুর্গ প্রবেশ করিল। এ যাত্রা শোণিত পাত ব্যতিরেকে কলিকাতা পুনরধিকৃত

* This arose from the continued apprehensions of the council at Fulta who, clinging to their first fear with more than martyrs steadfastness, did not ventur to frovide a single beast either of draughts or burden lest they should incur Soubadar's resentment.

Thorton's History of British Empire In India page 47 Vol I.

হইল। ইহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারির কথা। ইহার পর কলিকাতা দুর্গের সিংহদ্বারে আর কাহাকেও শত্রুভাবে শিরঃপ্রবিষ্ট করিতে হয় নাই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

# সমুদ্রের প্রতি।

—০ঃ*ঃ০—

( ১ )

মন্দর-মন্থন-দণ্ডে ভীমরবে মহাশূন্য ভেদী
আলোড়িত যবে, হে বারিধি!
উঠেছিল যে নির্ঘোষ অন্তহীন বিশ্বকেন্দ্র হ'তে,
ভয়ত্রস্ত সুরাসুর কম্পমান ত্রিদিব মরতে,
সে প্রচণ্ড প্রলয়ের বুঝি শেষ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি
এ মহাকল্লোল তব! কিম্বা আজ(ও) চমকি' অবনী,
দিবস রজনী;
ফেলে শ্বাস নাগরাজ পূর্ব্বজ্বালা স্মরি',
বন্ধনে শিহরি'।

( ২ )

শতকোটী শোকাতুর হৃদয়ের ঘন দীর্ঘশ্বাস—
তোমার এ উন্মাদ উচ্ছ্বাস!
জগতের দ্বারে দ্বারে দেশে দেশে ফিরি' দিবানিশি
স্রোতস্বিনীকুল বহি' মানবের অশ্রুজলরাশি
তোমার অসীম অঙ্গে ঢালিয়াছে যুগযুগান্তর
প্রত্যেক কল্লোলে বুঝি শুনি তাই শোকার্ত্তের স্বর;
হেরি শশধর,
উথলে বিরহী শত আঁখি জলধার
তাই অনিবার।

( ৩ )

অথবা এ কলরোল বিশ্বলোক করিবারে ত্রাণ,
দেবতার আকুল আহ্বান!
বসিয়া তোমার তীরে কহেন কি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
উচ্চ বিচীরবে জগত জনের কি হইবে গতি?
নেহারি তোমারে অন্য পারাবারে ধায় সদা মন;
উত্তরি কেমনে তাহা করি নাই কিছু আয়োজন!
তরী শ্রীচরণ,
পাপীর ভরসা বল, তাই বাঁধা কিরে
সাগরের তীরে?

( ৪ )

নশ্বর ধরনীতলে অনন্তের ছায়া করিয়া বিস্তার
বহিছ কোথায় পারাবার?
উঠেছিল দিবাকর জগতের প্রথম প্রভাতে
যেরূপ উজলি বিশ্ব তোমার বিপুল বক্ষ হ'তে,
এখনো তেমনি তপন চরণ-পরশ-রঙ্গিমা
উধায় তোমার সুনীল সলিলে ঢালে মধুরিমা;
উদার নিঃসীম
মাঝে পড়ে নাই কভু যুগান্তের রেখা—
কালচক্র লেখা।

( ৫

এমনি তোমার কূলে সায়াহ্নের দিনপতি প্রায়।
আয়ু মোর যেন অস্ত যায়!
অতৃপ্ত নয়নে হেরি নিত্য তব রূপ অভিনব;
সমীর হিল্লোলে ভুঞ্জি বসন্তের অনন্ত উৎসব;
নিশিসমাগমে বৈতালিকসম মোহময় গান
পরশিবে ঘুমঘোর চিন্তাক্লিষ্ট বিনিদ্র নয়ান।
নাহি চাহে প্রাণ
ছাড়িয়া তোমারে যাই—দূরদেশে ঘর,
ধন্য রত্নাকর!

শ্রী ঃ—

# দণ্ডের ইতিহাস।

—০:*:০—

আমার নাম—দণ্ড। আমার জন্মদাতার স্থির নাই। কেহ বলেন, আমার পিতার নাম—বংশ। কেহ বলেন, তাহা নয় দণ্ডের বাপের নাম—কাষ্ঠ। আবার কেহ বলেন তা' হ'ল না, উহার বাপে নাম—বেত্র। নিশ্চয় করিয়া কেহ আমার জন্মদাতার নাম বলিতে পারেন না, আমিও জানি না। সকলেরই গর্ভধারিণী আছে, আমার তাও নাই—আমি ভুঁইফোড়। মা থাকিলেও বা তাঁহার নিকট বাপের নামটা জানিয়া লইতাম। তাই বলিতেছি আমার মা বাপ নাই, থাকিলেও তাহারা কে বা তাহাদের নাম জানি না। জানি কেবল আমার নাম—দণ্ড। আমি রাজরাজেশ্বরের হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া জীর্ণ কান্থধারী খঞ্জ ভিক্ষুকের কর পর্য্যন্ত সকলের হাতে সমভাবে বিরাজ করি। আমার ভেদ জ্ঞান নাই, আমি ধর্ম্মাধিকরণেও থাকি, অবৈধজনতাকারিদিগের সঙ্গেও থাকি, আমি সাধুর সঙ্গেও থাকি, অধার্ম্মিকেরও সঙ্গী হই। আমি পৃথিবীর সকল স্থানে বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে এবং বিচারালয়ে বিদ্যমান থাকিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করি। তুমি লেখক—তুমি যে আমার ইতিবৃত্ত লিখিতেছ,—সত্য করিয়া বল দেখি, পাঠশালায় গুরুমহাশয় কি তোমার মেরুদণ্ডের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুমধুর সুখ সম্পাদন করেন নাই? তুমি অস্বীকার করিলেও তোমরা যাহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি কর সেই জন্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন,—"আমার শিক্ষক আমায় খুব চাবুক কষিতেন, না হলে আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতাম না।"

দেখ, আমার অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য দুষ্ট লোক ও ছেলেদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত। আমি না হলে তাহাদিগকে ঠিক করিতে আর কেহ পারে না। দুষ্ট লোকে আমার অখ্যাতি রটায় বটে কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য করি না,—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আর এক কথা, তাহারা আমাকে ঘৃণা করিলেও আমিই কিন্তু তাহাদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক। জন্‌সন্ একদিন লিক্কনশায়ারে কয়েকটী ভদ্রমহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাদের মধুর ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়াছিলেন এবং যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহাদের জননীদেবীর শাসন ও সংস্কার গুণে তাঁহারা এরূপ ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Rod! I will honour thee for this thy duty."

জনসনের এ কথাটির মূল্য কম নহে। প্রকৃত পক্ষেই আমি (দণ্ডদেব) সম্মানের পাত্র, কারণ আমিই তোমাদের (মানবজাতির) ভাগ্যনিয়ন্তা এবং ক্রমে জানিতে পারিবে, সভ্যতার ইতিহাসেও আমার অধিকার আছে।

সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর যখন পাপের বোঝা স্কন্ধে চাপাইয়া মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি মানবহৃদয়ে এক জন উপদেষ্টাকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বিবেক। এই বিবেকের অনুরোধেই মানবজাতি পাপের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অস্ত্রচালনা করিয়া আজ এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এই বিবেকের অনুরোধেই তাঁহারা তাঁহাদিগের আদিম অবস্থায় আমার সাহায্যে পাপীজনকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া দুষ্ট পাপের মনে একটা ত্রাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। শাস্তিপ্রদানের সেই সর্ব্বপ্রথমাবিষ্কৃত অস্ত্র—"দণ্ড" অর্থাৎ আমি স্বয়ং। কিন্তু কালক্রমে নানারূপ উপযোগী আকারে আমাকে পরিণত হইতে হইয়াছে এবং আমার প্রয়োগ-প্রণালীর নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বিগত সার্দ্ধ শতাব্দীর পরিবর্ত্তের প্রবল বাত্যায় কোন্ দেশের কোন্ প্রথা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে বা রাখিয়া গিয়াছে তাহা বলা অতীব সুকঠিন। সুতরাং সন্দেহকে অতিক্রম করিবার মানসে আমি আমার তৎপূর্ব্বের ইতিহাসই বলিতেছি, শ্রবণ কর। সার্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বেও আমার রাজত্ব একপ্রকার জগৎ বিস্তৃত ছিল। রুষিয়া তখনও কথা বর্জ্জন করেন নাই, পোলাণ্ডের ভদ্রমহিলাগণ তখনও রুশ সৈনিককর্ত্তৃক সাধারণ সমক্ষে কষাহত হইতেন, চীনে তখনও বংশদণ্ডের প্রাদুর্ভাব ছিল, তুরস্ক তখন যষ্টির দ্বারা শাসন করিতেন আটিবাঁধা লাঠিতে তখনও শ্যামবাসীদিগের শাস্তিবিধান হইত; আফ্রিকা হইতে তখনও "মাম্বো জাম্বো" (Mumbo Jumbo) অন্তর্হিত হয় নাই, আমেরিকার কতকগুলি বিদ্যালয়ে তখনও বয়স্কা ভদ্রমহিলাদিগের উপর চাবুকের ব্যবস্থা হইত! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে

যে "দণ্ড" শক্তি এরূপ দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহা যে ইতিমধ্যেই আমূল উৎপাটিত হইবে তাহা তোমরা মনেও স্থান দিও না। কিন্তু হেমচন্দ্রের "অসভ্য জাপান" আজ সভ্য, তাই বলিতে বাধ্য, তোমরা যাহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে কর ঘটনাচক্রে তাহাও সম্ভব হইয়া যায়; সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা বা অনুমানের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি নীরব হইলাম।

আমি দণ্ডদেব কোন্ দেশে কিরূপ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতাম এবং কোন্ দেশে কিরূপ 'জাগ্রত' ছিলাম, তাহার ইতিহাস এখন বলিব না, এবং প্রত্যেক দেশের উপর আমার প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলেও দুই এক দিনে কুলাইবে না। তজ্জন্য আমি তোমাদিগকে আমার স্থূল বিবরণ মাত্র বলিতেছি।

প্রাচীন ইউরোপে রোমরাজ্য শীর্ষস্থানীয় এবং সভ্যতার ইতিহাসেও রোমের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, তাই সর্ব্বপ্রথমেই আমি আমার রোমের রাজত্ব কাহিনী বলিব। দণ্ডবিদ্যায় রোমানগণ যে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকে জান না। এখানে আমরা তিনটী সহোদর ছিলাম। রোমকগণ সাধারণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে কশাদণ্ড ব্যবহার করিতেন; এবং এই কশাদণ্ডের শক্তির তারতম্যহেতু আমাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ হইয়াছিল, শক্তি বিষয়ে Flagellum সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ, Scutica মধ্যম এবং Ferula সর্ব্ব কনিষ্ঠ। রোমের বিচারালয় সমূহ এবং মহিলাগণের সজ্জাগৃহ সকল সর্ব্বদার জন্য এই প্রকার কশাদণ্ডে অলঙ্কৃত থাকিত। অপরাধীদিগের উপর বিচারকগণের অসীম ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় দয়াপরবশ (!) হইয়া প্রভু অথবা প্রভুপত্নী আমাদের সাহায্যে স্বকীয় কৃতদাসের দুঃখময় জীবনের অবসান করিতেন! নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের প্রীতি উৎ-পাদনার্থ ভোজের সময় অথবা ভোজান্তে কৃতদাসদিগকে কশাঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল! কোমলাঙ্গিগণই নাকি কঠোরতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন! রোমান মহিলা-গণের বহুসংখ্যক দাসী থাকিত, এক একজনের প্রতি এক এক কার্য্যের ভার অর্পিত হইত। যাহারা তাঁহা-দিগের সজ্জাগৃহে কার্য্য করিত তাহাদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল, তাহাদিগকে এক রকম উলঙ্গ অবস্থায় কর্ত্রীঠাকুরাণীর সেবা করিতে হইত, পাছে কশাঘাতের ব্যাঘাত ঘটে এইজন্য তাহারা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে পারিত না। অতি সামান্য অপরাধ করিলেও, অপরাধ কেন, অতি সামান্য ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলেও, দয়াস্বরূপিনী রোমান অঙ্গনাগণ তাঁহাদের দাসীদিগকে এরূপ পুরস্কার হইতে বঞ্চিত রাখিতেন না। এই স্থানেই আমাদের প্রভাবের পরিসমাপ্তি নহে। তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত আরও এক ভীষণ উপায় অবলম্বিত হইত। কড়ি কাঠে সুদীর্ঘকেশ বাঁধিয়া তাহাদিগকে টাঙ্গান হইত, পাছে অপরাধকারী পদাঘাত করে এই কারণে তাহা-দের পায়ে বিশেষ ভার জিনিষ বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং তৎপরে তাহাদের অঙ্গের কাঠিন্য পরীক্ষার নিমিত্ত আমা-দিগকে নিয়োজিত করিতেন। এ সকল শুনিলেও বোধ হয় তোমাদের গা শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের তা'তে সুখ হয়! আরও শুন, কৃতদাসগণের উপরেও উক্তরূপ ব্যবস্থা হইত, কিন্তু প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে তাহাদের এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। পুরুষের চুল ছোট বলিয়া কড়িকাঠে তাহাদের হাত দুইখানি বাঁধা পড়িত! মহিলাদিগের নিকট আমরা এতদূর আদৃত হইয়াছিলাম যে, রোম সাম্রাজ্যের সূত্রপাত সময়েই এতৎ নিবারণার্থ অনেক বিধি লিপিবদ্ধ হয়; সম্রাট আড্রিয়ানের রাজত্ব কালে উক্ত অপরাধে একটী মহিলা পাঁচবৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। অনেক সময়ে রোমান যুবকগণ অসদভিপ্রায়ে প্রতিবেশীর অন্তঃপুরে কৃতদাস বেশে * প্রবেশ করিতেন, এবং গৃহস্বামীগণও জানিতে পারিলে তাহাদের যথোচিত কশাঘাতের আয়োজনে ত্রুটি করিতেন না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সেলাষ্ট, টালিয়া-দুহিতা কষ্টিমার প্রণয় লাভ করিতে যাইয়া ধরা পড়েন, এবং কশাঘাতে বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

এখন আমি হোলাণ্ড, জর্ম্মণি, প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও পোলাণ্ডের কথা বলিব, তোমরা সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এ সকল দেশেও পরিবার মধ্যে, বিদ্যালয়ে এবং বিচারালয়ে আমি বিরাজ করিতাম। এতদ্ব্যতীত সংস্কার মন্দিরে (House of Correction) ও আমি পূজিত

* কৃতদাসের সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে তাহাদিগকে চিনি-বার উপায় ছিলনা।

হইতাম। এই সকল সংস্কার মন্দিরে চরিত্র ও ব্যবহারগত দোষের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইত। অভিভাবকগণ অধীনস্থদিগের অবৈধ চরিত্র কি অন্যায় ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে সংস্কার মন্দিরের শাসনাধীন করিতেন এবং সেখানে আমাদিগের সাহায্যে (দণ্ডাঘাতে) তাহাদিগকে সংস্কৃত করা হইত।

জর্ম্মন রাজ্যে আমি বহু মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলাম। যথা ;—(১) কষাদণ্ড, (২) বেত্রদণ্ড, (৩) বার্চদণ্ড। কোতোয়ালও বিচারকদিগের কষাঘাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সংস্কার মন্দিরে হতভাগিনীদিগের সংখ্যাই অধিক হইত অনেক সময় নিরপরাধিনী রমনীকে ক্রূরমতি নির্ম্মম-হৃদয় প্রতিবেশী অথবা আত্মীয় স্বজনের পাকচক্রে পড়িয়া কষাঘাতের দারুণ যন্ত্রণা এবং অবমাননা সহ্য করিতে হইত। কখনো কখনো শ্রীলতার অনুরোধে অপরাধিনীগণকে অনাবৃতাঙ্গ করা হইত না, এবং রমণী হস্তেই দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা হইত; কিন্তু সাধারণত এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইত না;—হতভাগিনীদিগকে বিবস্ত্রা হইয়া পুরুষের হস্তেই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত! সময়ে সময়ে সাধারণের সমক্ষে এই সকল শাস্তি প্রদত্ত হইত, আবার কখনো কখনো বা অর্দ্ধ গুপ্ত অবস্থায় আত্মীয় বন্ধুর সমক্ষে কষা-দণ্ড প্রযুক্ত হইত। জর্ম্মন সাহিত্যে এই সকল কষাঘাতের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবীণ ফরাসী লেখক ভল্টেয়ারের হংসপুচ্ছও ব্যঙ্গচ্ছলে ফ্রান্সে দণ্ডদেবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সও আমার কঠোর হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। তথাকার বিদ্যালয় সমূহে আমার প্রাদুর্ভাব ছিল। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকেও আমার অনুগ্রহ (!) গ্রহণ করিয়া আমাকে চুম্বন করিতে এবং দণ্ডানুগ্রহবিধায়কক্ষে অভিবাদন করিতে হইত। এ রাজ্যেও রমণীর সুকোমল করকমলে আমি শোভিত হইতাম। এস্থলে তাহার একটী মাত্র প্রীতিপ্রদ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। "রোমান ডি লা রোজ" নামক সর্ব্বজন সমাদৃত কাব্যগ্রন্থে কবিবর ক্লপিনেলে স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে চারি ছত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ, পোপের সেই—

"Every woman is at heart a rake."

ইহাতে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হন এবং একদিন সুযোগক্রমে কবিবরকে আয়ত্বে পাইয়া তাঁহাকে সংশোধিত করিবার জন্য আয়োজন করেন। পলায়ন করা অসম্ভব দেখিয়া, কবিবর বলিলেন,—"আমি অপরাধ করিয়াছি, শাস্তি পাইব। কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা আছে;—ঐ ছত্র ক'টীতে আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তিনিই আমায় সর্ব্বপ্রথমে শাস্তি প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া কেহই আর অগ্রসর হইলেন না, কবি ক্লপিনেলে নিস্তার পাইলেন।

রুশ রাজ্যেও আমার আধিপত্য অতীব প্রখর ছিল। সকল প্রকার অপরাধেই সাধারণ দণ্ড অথবা কশাদণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদত্ত হইত। কি পুরুষ কি রমণী কি বালক কি বৃদ্ধ কি রাজকর্ম্মচারী কি সাধারণ লোক, অপরাধ করিলে সকলকেই আমার অনুপম অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে হইত। কৃষকদিগের অবস্থা যারপর নাই হীন ছিল; তাহারা সকারণে অথবা অকারণে যাহার তাহার দ্বারা কষাহত হইত, এবং কেবলমাত্র স্বীয় পত্নী ও অশ্বের উপর রাগ ঝাড়িয়া তাহারা আপন আপন অন্তর্জ্বালার উপশম করিতে যত্ন পাইত। রুশিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হস্তের সহিত আমার (যষ্টির) এরূপ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল যে তাহারা ত্রুটি ও দোষ দমনের নিমিত্ত অপর কোন উপায় মনে করিতেও পারিতেন না; তাঁহাদের মতে অপরাধিবৃন্দের উপর প্রযুক্ত হইবার জন্যই আমার সৃষ্টি হইয়াছিল। এ রাজ্যে আমি একটী প্রীতিপ্রদ কর্ত্তব্য পালন করিতাম। এদেশে দণ্ডাঘাতই নাকি ভালবাসার চিহ্ন! বিবাহিতা রমণী নাকি স্বামীর হস্তে আমাকেই পাইবার জন্য লালায়িত! স্বামী যদি স্ত্রীকে মাঝে মাঝে এরূপ আদর (!) না করেন, তাহা হইলে স্ত্রী মনে করেন স্বামীর ভালবাসা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে! শুধু সমাজের নিম্ন স্তরেই এরূপ প্রথা দৃষ্ট হইত না, উচ্চতর স্তরেও এরূপ প্রথার প্রসার ছিল—একাধিক ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। বারক্লে লিখিয়া গিয়াছেন যে দণ্ডাঘাতের সংখ্যা হইতেই স্বামীর ভালবাসা নিরূপিত হইত। এতদ্ব্যতীত স্নানাগারেও সপত্র বার্চ দণ্ডের প্রবলপ্রতাপ দেখিতে পাওয়া যাইত; স্নানকারীর সর্ব্বাঙ্গ উক্ত দণ্ড দ্বারা প্রহৃত;—ষ্টিফেন্স সাহেব * স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

* Mr. Stephens in "Incidents of Travel in Greece Russia, Turkey and Poland."

আমেরিকাতেও আমার আধিপত্য কম ছিল না। বালক বালিকাদিগের গার্হস্থ্য জীবন সেখানেও আমার দ্বারা পরিচালিত হইত। পিউরিটানদিগের সময়ে কশাঘাত সাধারণ দণ্ড মধ্যে পরিগণিত ছিল। কোয়েকার সম্প্রদায়কে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত আমেরিকার যুক্ত রাজ্য আমার বিশেষ প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে। আমার (দণ্ডের) প্রয়োগের বন্দোবস্তেও ত্রুটি ছিলনা। কাঠের এক রকম বাঁট ছিল, তাহাকে পিলোরী (pillory) বলিত, অপরাধিগণকে তাহাতেই সংযুক্ত করিয়া কষাঘাত করা হইত। আমেরিকার আদিম জাতিদের মধ্যে আমার কিরূপ গতিবিধি ছিল, তাহার ইতিহাস তোমাদিগকে বলিব না; তবে অপরাপর আদিম জাতির জাতীয় জীবনের সহিত তাহাদের জীবনের সাদৃশ্য দেখিয়া এই মাত্র অনুমান করিয়া লইতে পার যে,তাহারাও আমরই পূজা করিত। বর্ব্বরজননী আফ্রিকায়ও আমার যথেষ্ট সম্মান এবং যথেষ্ট আদর। আমি শৈশবেই শিক্ষার সহচর। সর্দ্দারতনয়গণ আমার প্রভাবাধীন থাকিয়া সমবয়স্ক সঙ্গী সমূহের সমভিব্যাহারে রাজনীতি, শাসনকার্য্য ও বিষয় কার্য্য শিক্ষা পাইত। "আমি (যষ্ঠি) স্বর্গাগত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ *" ইহা প্রাচ্য প্রবাদ। মিসরবাসীদিগের এ প্রবাদের উপর বিশেষ আস্থা ছিল এবং নরপতিগণও প্রজাবর্গকে এ আশীর্ব্বাদ (!) সম্যক্ উপভোগ করাইতেন। এ রাজ্যে আমার প্রভূত সাহায্য ব্যতীত রাজস্ব আদায় করা একরূপ অসম্ভব ছিল। অধিবাসীগণ কর প্রদান না করার চেষ্টা করিত সুতরাং আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইত না, এবং পৃষ্ঠদেশে ঐ সকল বীরত্ব চিহ্ন প্রদর্শন করাই তাহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিত। প্রতি গ্রামে প্রধানকে রাজস্বের জন্য দায়ী থাকিতে হইত এবং তাহারাও কৃষকবিশেষের উদ্ধত স্বভাবের নিমিত্ত আমার দ্বারা লাঞ্ছিত হইত। মিসরের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বড়ই অদ্ভুত—মিসরের পিরামিডের ন্যায় অদ্ভুত! সুন্দর বলিতে তাহারা অপরিমিত স্থূলকায় বুঝিত এবং এই পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত রাজদুহিতাগণ আমার অধীন হইয়া স্বেচ্ছাবিরুদ্ধেও দুগ্ধ পান করিতে বাধ্য হইত! আফ্রিকার অসভ্যদিগের মধ্যে আমার প্রকোপ পত্নীর উপরও প্রসারিত ছিল। স্বামী, স্ত্রীকে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিতে দেখিলে, আমার যথাযুক্ত তৃপ্তি সাধন করিয়া কুলকলঙ্কিনীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিত। সপত্নীদিগের মধ্যে কলহ বাঁধিলে স্বামী স্বয়ং আমার সাহায্যে বিবাদ ভঞ্জন করিত, পত্নীগণও সকল সময় নিরীহ থাকিত না। মৎকর্ত্তৃক অযথা উপদ্রুত হইলে তাহারাও দলপতির নিকট অভিযোগ করিত, সাধারণ সমক্ষে তাহাদের বিচার হইত এবং আদালতের মীমাংসায় অসন্তোষ প্রকাশ করিলে 'মাম্বো জাম্বোর' অব্যাহত শক্তি তাহাদিগের উপর প্রযুক্ত হইয়া বিচার কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া দিত। ১৮২৭ খৃঃ অঃ সাইএয়ালিওনিতে কষাঘাত কাফ্রিদিগের সাধারণ শাস্তি মধ্যে গণ্য ছিল। আফ্রিকার পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে বালক বালিকা দিগের উপর আমার সমধিক প্রসার প্রতিপত্তি ছিলনা বটে,কিন্তু সেখানে কঠোরতর শাস্তির অভিনয় হইত। অবাধ্য সন্তানের চক্ষে মরিচ ঘসিয়া দেওয়া হইত, তাহারা জালা যন্ত্রণায় চীৎকার করিত। বয়স্কদিগের উপর যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহা আরো ভীষণ;—তাহাগিকে শূন্যে ঝুলাইয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে মরিচ প্রয়োগ করা হইত।

তোমাদের এসিয়া খণ্ডও আমার বিস্তীর্ণ রাজ্য। এসিয়া মাইনরে য়ীহুদিদিগের মধ্যে আমার প্রবল প্রতাপ পরিলক্ষিত হইত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিতে যাইয়া সেন্টপল কি কি অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তর উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"য়ীহুদিদিগের নিকট পাঁচবার আমি এক কমা দু'কুড়িবার কশাহত হইয়াছি; তিনবার আমি দণ্ডাহত হইয়াছি;…………!" * নিউটেষ্টামেন্টের লেখকগণ সকলেই এই প্রকার কষাঘাতের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কশাহত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইংরেজি অব্দ যীশুর জন্মকালের সাক্ষ্য, সুতরাং অনেক পরিমাণে আমার প্রাচীন প্রভাবের প্রমাণ। য়ীহুদিদিগের মত পারশীকগণও প্রাচীন জাতি এবং তাহাদের মধ্যেও আমার বিস্তৃত ব্যবহার দৃষ্ট হইত, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে

* "Tho stick came down from heaven a blessing from God."

* Of the jews five times received I forty stripes save one; "and Thrice was I beaten with rods."

সকলের উপরেই দণ্ডাঘাত বিহিত হইত ও দণ্ডাহত ব্যক্তি মাত্রকেই দণ্ডপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন করিতে হইত। কিছুদিন পরে ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কুলীনদিগের ( nobles ) রক্তমাংসে রচিত শরীরে কশা প্রয়োগ না করিয়া তাহাদের গাত্র বস্ত্রে প্রয়োগ করা হইত,এবং সে অদ্ভুত পূর্ব প্রথা হইতেই "রাজার হাল স্বর্গে বর"এর মত একটা প্রবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল।

চীনরাজ্যে আমার ( দণ্ডের ) আধিপত্য সাধারণ এবং সর্ব্বজনীন। এমন কোন অপরাধী নাই যাহার শাস্তি বিধানে আমার আবশ্যক হইত না। সর্ব্বোচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী হইতে অতি হীন ভৃত্য পর্য্যন্ত, অপরাধ করিলে সকলকেই আমার প্রভাব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে হইত। দণ্ডাঘাতের সহিত অবমাননার কোনরূপ জ্ঞান চীনবাসীদিগের মনে স্থান পাইত না; কেবলমাত্র যন্ত্রণাপ্রদ বলিয়াই দণ্ডাঘাত তাহাদের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইত। সৈন্যাধ্যক্ষও অম্লান বদনে আমার কঠোর অনুগ্রহ সহ্য করিয়া আপনার উচ্চপদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। চীনে শুধু অপরাধীর উপরেই আমার প্রকোপ সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃত দোষীকে বাহির করিয়া না দিতে পারিলে অপরাপর ব্যক্তিরও সাজা হইত। তস্কর অথবা দস্যুকে ধরিয়া দিতে না পারিলে, জেলার কোতোয়াল ও প্রহরীবর্গ পুনঃ পুনঃ কশাদণ্ডে দণ্ডিত হইত। তোমাদের পুলিশ আদালতের মত চীনেও কতকগুলি বিচারালয় ছিল। প্রাতে এবং অপরাহ্নে তথায় প্রতারণা হাতাহাতি মারামারী মাতলামী প্রভৃতি সামান্য সামান্য অপরাধের বিচার হইত এবং উপস্থিত মত বিচারকের আদেশক্রমে অপরাধীগণকে দু' চারি দশ ঘা' দিয়া বিদায় করা হইত। সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য সন্তোষজনক না হইলে, অভিযুক্তের মত তাহারাও দণ্ডগ্রহণ করিত! চীনের প্রথা ছিল—দণ্ডগ্রহণের পর সকলকেই বিচারককে শিষ্ট সম্ভাষণ করিতে হইবে,কেন না তিনি তাহাদের নৈতিক শিক্ষার জন্ম এরূপ যত্ন লয়েন।

চীনের আইন ইতিহাস একরূপ শাস্তি ও দায়িত্ব লইয়া। অপরাধের নিমিত্ত কেবলমাত্র অপরাধীই দায়ী নহে, সে অপরাধের সহিত যাহারা অতি দূরভাবেও সম্পর্কিত তাহারও দায়ী। এই দায়ীত্বের উল্লঙ্ঘনে পুরস্কার (!) আছে, দণ্ডদেব স্বয়ং আমিই তাহার বিধানকর্ত্তা। বিচারকের অন্যায় বিচারের জন্য বিচার সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকেও শাস্তিভোগ করিতে হইত, কিন্তু নিম্নতর সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে দায়িত্বের আধিপত্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিত, সুতরাং শাস্তিও ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া যাইত। চীনে শত পরিবারে যে একজন করিয়া মণ্ডল নির্ব্বাচিত হইত, তাহার দায়িত্ব কম নহে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অপরাধ ছিল, মণ্ডলের অধীনস্থ পরিবার সমূহের মধ্যে তাহার অভিনয় হইলে, তাহাকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত! পেকিনের জ্যোতিষ সভা ( Astronomical Council of Pekin ) প্রত্যেক ভ্রমের জন্য ষষ্ঠি সংখ্য বংশ দণ্ডাঘাতে তিরস্কৃত করিত। দেব-সেবায় নিয়োজিত শূকরশাবক অসুস্থ অথবা ক্ষীণতনু হইলে, তত্ত্বাবধায়কের উপর প্রতি শাবকের জন্য পঞ্চাশৎবার দণ্ডদেব অবতীর্ণ হইতেন!

চীনের বিবাহ বিধিতেও আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। পুত্র কন্যার অভিমত না লইয়া পিতামাতা প্রথম বার বিবাহ দিতে পারিতেন কিন্তু পুত্র পত্নীহীন হইলে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত পুত্রকে বাধ্য করিতে পিতার অধিকার ছিল না, এরূপ অবৈধ কার্য্য করিলে তিনি অশীতিবার আমার দ্বারা প্রহৃত হইতেন। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর কন্যাকর্ত্তা যদি কোন ব্যক্তির সহিত সেই বালিকার বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর সপ্ততি অথবা অশীতি সংখ্যক দণ্ডাঘাতের ব্যবস্থা হইত এবং যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও এরূপ বিবাহ করিতেন, তিনিও কার্য্যফলস্বরূপ অশীতি সংখ্যক দাণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হইতেন! তোমাদের দেশে যেরূপ জনকজননী অথবা স্বামীর অভাব হইলে কালাশৌচ পালন করিতে হয়, চীনেও সেইরূপ একটা নিয়ম ছিল। কালাশৌচের মধ্যে বিবাহ করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইত এবং এই দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত উভয় পক্ষই শত দণ্ডাঘাতে লাঞ্ছিত হইত! পিতামহ পিতামহী, পিতৃসহোদর বা পিতৃসহোদরা প্রভৃতির মৃত্যুজনিত অশৌচকাল মধ্যে বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইত না সত্য কিন্তু অশীতিবার দণ্ডাঘাতে দণ্ডনীয় হইত। স্বামীর জীবিতকালে যে রমণী সম্রাট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেন, বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এতৎসম্বন্ধেও যদি তিনি

বিবাহ করিতেন তাহা হইলে তাহার উপর শত দণ্ডপাত হইত ও তিনি নরপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেন। স্ত্রী-পুরুষ একই গোত্র হইলে বিবাহ পণ্ড হইত ও তাহাদের দণ্ড হইত। নৈতিক চরিত্রকে ভল্টেয়ারের সেই Learned and virtuans people (বিদ্বান এবং সদ্গুণান্বিত জাতি) বড়ই মূল্যবান জ্ঞান করিত এবং তাহার অবমাননায় নরনারী মাত্রেই বংশদণ্ডের নিগ্রহ লাভ করিতেন।

এত দেশের কথা বলিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ও তোমাদের দেশের (ভারতবর্ষের) কথা বলি নাই। সকলের পরে বলিব বলিয়াই বলি নাই। ইংলণ্ড এখন উন্নত, ইংরেজ এখন লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র, তাই তাঁহাদের নিকট এখন আমার (দণ্ডদেবের) বিশেষ আদর নাই। কিন্তু না থাকিলেও কশাদণ্ডের আধিপত্য বড় কম নহে। বিদ্যালয়ে আমার মূর্ত্তি পূজিত, অশ্বপৃষ্ঠে আমার প্রভাব প্রকটিত, সৈন্য বিভাগে আমার শক্তি সম্মানিত। আর ভারতে? ভারতে আমার একাধিপত্য, তোমাদের বাঙ্গলায় আমার আদিম ও অকৃত্রিম মূর্ত্তির পূর্ণবিকাশ! ভারত নিঃস্ব, তাই প্রকৃতসুলভ দণ্ডকেই তোমরা আপনার বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছ, ধন মানের একমাত্র প্রহরী করিয়া রাখিয়াছ। ভারতবাসী এখন অনেক পরিমাণে সভ্য হইলেও, অর্থের অভাবে বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে নাই, তাই পিতা-পিতামহ-পূজিত দণ্ডদেবের আশ্রয়েই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়ের হস্তে বেত্রদণ্ড, গোচারণে গোপালের হস্তে পাঁচনী, পল্লীমধ্যে প্রজা-উৎপীড়ক তহসীলদারের হস্তে সুদীর্ঘ বংশদণ্ড, শান্তিরক্ষক পুলীশের হস্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত "বাটন্," অন্তঃপুরে গৃহিণী-কর-কমলে সম্মার্জ্জনী, পাখার ডাঁট্, উনুনের খড়ি কত কি? এ সকলই আমার মূর্ত্তিভেদ, এ সকলই শাসনের জন্য, অত্যাচারের জন্য নিয়োজিত। তাই বলি যদি বর্ত্তমানে কোনস্থানে আমার প্রকৃত অধিষ্ঠান থাকে তবে তাহা ভারতে! আর এই বিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে যদি কোথাও আমার প্রকৃত আলোচনা হয় তবে তাহা তোমাদের এই দীন বাঙ্গলায়। জমীদারে জমীদারে বিবাদ বাধিলে এখনও আমার এক মূর্ত্তি লাঠির মধ্যবর্ত্তিতায় মীমাংসিত হয়, এখনও লাঠিয়াল সম্প্রদায় বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, হইবে কি না তাহাও সন্দেহের স্থল। গবর্ণমেণ্টের "অস্ত্রপাশ" বিধিতে আমার রাজ্যই ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই "পাশ" প্রথা কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে আমি চিরকাল আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিব তদ্বিষয়ে কি তোমাদের সন্দেহ হইতে পারে?

পাঠক! আমার কথা তোমাকে অনেক বলিলাম, আজ আর বলিব না। এক দিন সব কথা বলিলে ভুলিয়া যাইবে। তাই আজ আর দুই একটী কথা বলিয়া নীরব হইব। সময়ান্তরে আমার আর আর বৃত্তান্ত বলিব। আমি যে শুধু শাসন রাজ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলাম এমত নহে, ধর্ম্ম জগতেও আমি একদিন আলোচিত আন্দোলিত হইয়াছিলাম,—রোমের লুপারকেলিয়া (Lupercalia) তাহার সাক্ষ্য। পাপের শাস্তি আছে, দূর ভবিষ্যতে ঈশ্বর তাহার প্রতিবিধান করেন। পুরাকালে রোমকগণ এই শাস্তি স্বহস্তে আমার সাহায্যে (দণ্ডাঘাতে) অগ্রিম গ্রহণ করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। এই প্রায়শ্চিত্ত প্রথায় একদিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশ সমূহে একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের * উদ্ভব হইয়াছিল,—ইতিহাসবক্ষে তাহার সুস্পষ্ট ছায়া এখনো অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

# প্রার্থনা।

যতদিন দীননাথ, সহিতে যাতনা  
রাখিতে মরতে মোরে করেছ মনন,  
তব প্রীতিপূর্ণ আঁখি করিয়া করুণা  
মোর' পরে ততদিন করিও স্থাপন!  
তব পুণ্য কার্য্যে যেন এ পাপ জীবন  
ব্যয়িত করিতে পারি যতনে গোপনে,  
এড়াইয়া জগতের পাপ প্রলোভন,  
আর করি' ছিন্ন স্বতঃ মোহের বন্ধনে!  
সদা-সর্ব্বক্ষণ যেন এ পাপ রসনা  
তোমার মহিমা-গীতি করেহে কীর্ত্তন,  
বিনাশিয়া সযতনে বিষয় বাসনা  
মাতাইয়া জগতের নর অগণন!  
পাপ-প্রলোভনে যেন হে জগত-পতি!  
আমার অন্তর কভু নাহি করে গতি!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

* The sect of the Flagellants.



স্বর্গীয় ছোটলাট সারজন উড্‌বরণ।

জন্ম, ১৮৪২ খৃঃ ] [ মৃত্যু, ১৯০২ খৃঃ

# কবিতা-গুচ্ছ।

## শরতের শশী।

শরতের পূর্ণশশী বিমল আকাশে বসি'
তরল রজত স্রোতে প্লাবিয়া ধরণী

ঢালি শুভ্র সুধাধারা হাসিয়া হ'তেছ সারা
কোথা পেলে এত হাসি বল দেখি শুনি।

দূর মেঘ সিংহাসনে বসিয়া আপন মনে
ঢালিছ কিরণ ধারা উজ্জ্বল বিমল

পুলক বিহ্বল মনে সাগর ভূধর সনে
সেই জ্যোতিঃ সুধাস্রোতে আসে ধরাতল।

ও শুভ্র সুন্দর হাসি, কোথায় শিখিলে শশি
ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি হাসিতে তোমার,

দূরে যায় মলিনতা, পূর্ণ-প্রেম পবিত্রতা
ধরায় ফুটিয়া ওঠে শোভা অমরার।

মহান মহিমা ধায় পূর্ণ সুধা পারাবার
বিন্দুমাত্র পেয়ে যায় তুমি সুধাকর,

(তব) জ্যোৎস্না ভূষণে সাজি সে পদ রাজীবে আজি
প্রীতিভরে প্রণমিছে বিশ্ব চরাচর।

—০:*:০—

## আগ্রার তাজমহল।

কি আছে ধরণীমাঝে তুলনা তোমার!
দেখিয়াছি কত শত হর্ম্ম্য মনোহর,
অনুপম দেবালয় প্রাসাদ নিকর—
সুসভ্য জাতির কত গর্ব্ব অহঙ্কার।

শ্যাম যমুনা জল প্রতিবিম্ব ঝরি
নীলাকাশে দেবেন্দ্রের স্বর্গ পুরী যত;
বসন্ত স্বপ্নের দেবী ছায়াবাস গরি
নন্দন কাননে যেন বিরাজে সতত।

অমর্ত্ত্য সুন্দরী হেরি মুকুর মাঝারে
অপ্সরী নিন্দিত মূর্ত্তি সহসা আপন
যেইরূপ মুগ্ধা রহে, তুমি আপনারে
যমুনা সলিলে হেরি নিশ্চল নয়ন।

নিশীথে জোছনা রাতে মাধুরী তোমার,
তুষার বিমল বিভা স্বপ্ন শোভা সার।

শ্রীনির্ম্মলমোহন বসু।

—০:*:০—

## কি দিয়ে পূজিব তোমা।

( ১ )

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
আছে ফুল নানারূপ,
বিশ্ব বিমোহন রূপ,
ফুটন্ত সে ফুলদল তব প্রেম-হাসিময়,
কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়।

( ২ )

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
আছে যেই হৃদাসন,
তোমার সে চিরাসন,
বল তবে অন্যাসন অন্বেষণে কিবা হয়,
আসন পাইব কোথা বল ওহে দয়াময়।

( ৩ )

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
অমায়াদি পুষ্প যত,
আছে সদা মুকুলিত,
এ দেহেতে প্রকাশিত কভু তারা নাহি হয়,
কি দিয়ে পূজিব তবে বল ওহে দয়াময়।

( ৪ )

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
ষড়রিপু মহাবলী,
কেমনে দিব হে বলি,
যুঝিতে তাদের সনে হয় মোর পরাজয়,
কি দিয়ে পূজিব তবে বল ওহে দয়াময়।

( ৫ )

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
পূজোপকরণ যাহা,
সর্ব্বময় তুমি তাহা,
তোমার জিনিষ তোমাদানে কিবা ফল হয়,
কি দিয়ে পূজিব তবে বল ওহে দয়াময়।

( ৬ )

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু,
সকলি তোমার তনু,
পুজিবে কে তোমা প্রভু আমিইত আমি নয়,
কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়।

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

—•:•:•—

## কবি-স্মৃতি।

নিশীথে কবি মরণ তীরে
করিল শেষ রচনা,
জীবন-দীপ নিভিল ধীরে
থামিল সব যাতনা।
সরস শ্যামল নবীন তৃণ
বিছায়ে কায়া কোমল ক্ষীণ,
রচিল কবির সমাধি-দীন
মিশায়ে তায় আপনা,
নীরবে কবি মরণ-তীরে
করিল শেষ রচনা।

ধরার কেহ নয়ন-ধারা
বুকের দীর্ঘ শ্বাস,
ফেলিলনা হায় একটু সেথায়
সুরভি কুসুম-রাশ।
শুধু প্রভাতের শিশির দল।
ঢালিল দু'ফোটা অশ্রু-জল,
শুধু সাঁঝের শৃগাল-কুল
গুঞ্জে বিষাদ-ভাস,
ফেলিলনা কেহ নয়ন-ধারা
বুকের দীর্ঘশ্বাস।

অনেক বর্ষ বহিয়া গেল
সময় সিন্ধু-সলিলে,
একদা রাজা 'হর্ষনাথ'
সেবন তরে অনিলে,
রচিল সেথা বাগান বাটী
উলটি পালটি সমাধি-মাটী,
করিল অতি পরিপাটী
কবির স্মৃতি দলিলে!—
হে রাজাধিরাজ হর্ষনাথ,
সেবন তরে অনিলে!

নানান্ মত কেয়ারি করি
যতনে সারি বাঁধিয়া,
রতন-ঝারি পূর্ণ বারি
ঢালিল কত সাধিয়া;
সূর্য্যমুখী, রক্তজবা
সন্ধ্যামনি অভিনবা,
চাঁপা, বেলী মনোলোভা
ফুটিল দিক্ মোহিয়া
রতন-ঝারি পূর্ণ বারি
ঢালিল যবে সাধিয়া!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

# বন্ধু বটে।

[ক্ষুদ্র গল্প।]

( ১ )

সুবোধচন্দ্র ঘোষ ও রামময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস উত্তরপাড়া গ্রামে। একজন কায়স্থ ও অপরজন ব্রাহ্মণ হইলেও উভয়ের এক প্রাণ ও এক আত্মা—কেবল 'পাক পৈতা' ভেদ। বাল্যে উভয়ে এক বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন যৌবনে উভয়ে এক গবর্ণমেণ্ট অফিসের একই বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন। এরূপ স্থলে বন্ধুত্বটা যে কিরূপ গাঢ় হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুবোধচন্দ্রের বয়স প্রায় ছাব্বিশ বৎসর, আর রামময় বাবু সবে মাত্র চব্বিশ বৎসরে পড়িয়াছেন।

মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর নাম—অনঙ্গমোহিনী,নামটা কেমন বদখৎ গোছের। তা হইতে পারে, কারণ অনঙ্গমোহিনীর পিতৃবংশ বড় আধুনিক। আর সুবোধচন্দ্রের স্ত্রীর নাম—নবদুর্গা। নবদুর্গা গোবিন্দপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ জমীদার ৺ প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। রামময় বাবুর যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন বারো বৎসর বয়স্কা বালিকা অনঙ্গমোহিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, সুতরাং অনঙ্গ মোহিনীর বয়স এখন কিছু কম কুড়ি বৎসর। আর গোবিন্দপুরের বসুজা মহাশয় অষ্টম বৎসরের নবদুর্গা আঠার বৎসরের সুবোধচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিয়া, গৌরীদানের ফল লাভ করেন। সুতরাং সে হিসাব ধরিতে গেলে, নবদুর্গার বয়ঃক্রম এখন ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তবে অনঙ্গ মোহিনী একে সুন্দরী তায় বন্ধ্যা, সুতরাং এই কুড়ি বৎসর বয়সেও তাহার রূপের ঢেউ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। আর নবদুর্গা সুশ্রী অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্না শ্যামবর্ণা, আবার এই ষোল বৎসর বয়সেই যেন যৌবন সীমা অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—এই বয়সেই নবদুর্গার আড়াই বৎসরের এক পুত্র, আর দুই মাসের এক শিশু কন্যা কোলে।

মুখোপাধ্যায়ের সংসারে আর অন্য কেহ ছিল না, অনঙ্গমোহিনী আর 'নফরার মা' নাম্নী এক দাসী। সুবোধচন্দ্রেরা চারি ভাই, তার মধ্যে তিনি তৃতীয়, অন্যান্য ভাইদিগের বিবাহ ও সন্তানাদিও হইয়াছিল, সুতরাং আরো নিকট আত্মীয় শাখা পল্লব ধরিলে সুবোধচন্দ্রের সংসারকে, একটা প্রকাণ্ড গৃহস্থ পরিবার বলা যাইতে পারে।

পরিচয়টা এখন এই পর্য্যন্তই বলা ভাল।

( ২ )

চৈত্র মাস। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনির শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন সময় বিষণ্ণ মনে আফিস হইতে রামময় বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি সচরাচর যে সময় আফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা কিছু বিলম্ব দেখিয়া অনঙ্গ মোহিনী কহিল—"আজ যে তোমার এত দেরী হ'ল।

রামময় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"বড় বিপদ।"

অনঙ্গ আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি কহিল—"সে কি! কি বিপদ?"

রাম। বল্‌ছি—আগে ঠাণ্ডা হই। তারপর সব খুলে বল্‌ছি।

অনঙ্গ। ওগো, তোমার মুখ দেখে, আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে গো—কি বিপদ আমায় খুলে বল। কথাটা শুনেই আমার প্রাণটা বড় কেমন কর্‌ছে যে।

রাম। আমায় এ বৎসর সীমলায় যেতে হবে। সংসারে আর কেউ নাই, তোমায় একলা ফেলে কি ক'রে যাই, এই বিপদ।

অনঙ্গ মোহিনী কিন্তু এ কথার মধ্যে বিপদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। তথাপি কহিল—"তা আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেই হবে।"

রাম। তাই বা কেমন করে হয়—একেত সেখানে ছয় মাসের জন্য যাওয়া, তারপর সেখানে পরিবার নিয়ে থাকৃতে গেলে খরচ অনেক। আমি তা কেমন ক'রে পেরে উঠ্‌বো?

অনঙ্গ। তবে আমায় একলা ফেলে কি ক'রে যাবে?

রাম। তার একটা ব্যবস্থা করবার জন্যেই আমার আফিস থেকে আস্‌তে এত বিলম্ব হলো।

অনঙ্গ। কি ব্যবস্থা করেছ?

রাম। ঠনঠনেয় আমার এক মাসী আছে, জান?

আমি তাঁকে এনে এখন সংসারে রাখ্‌বো। আর সুবোধ রইলো, সে তোমাদের সর্ব্বদাই দেখ্‌বে শুন্‌বে।

অনঙ্গ।- সুবোধ বাবুকেত দেখ্‌তে শুন্‌তে হবেই, কিন্তু কোথা থেকে কে এক মাসী এসে যে আমার হাড় মাস জ্বালাতন করবে—তা কিন্তু আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

শেসে রামময় বাবু অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহার সেই ব্যবস্থাতেই পত্নীর মত করিলেন, তখন তাঁহার মন কতকটা সুস্থ হইল। নফ্‌রার মা এই সময় পা-ধুইবার জল দিয়া গেল. তিনি হাত-পা মুখ ধুইয়া, কিছু জলযোগের পর, নফ্‌রার মার সাজা তামাক টানিতে টানিতে আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

( ৩ )

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার চারিদিবস পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় অনঙ্গমোহিণীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, পঞ্জাবমেলে রামময় বাবু সীমলা যাত্রা করিলেন। বন্ধু সুবোধচন্দ্র হাওড়ার ষ্টেশনে পৌছিয়া দিয়া, তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। যাইবার সময় রামময় বাবু বন্ধুকে কহিলেন,—"ভাই রামময়, আমি তোমারই ভরসায়, বিদেশে যাচ্ছি, তা নইলে আমার এ চাকুরী ছেড়ে দিতে হতো। তা ভাই, আমার টাকাকড়ি, আর স্ত্রীর গহনা প্রভৃতি সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্য যেমন তোমার কাছে রেখে গেলুম, সেই রকম তোমার কাছেই থাক। আর আমার মাইনে থেকে যা কিছু পার্‌বো মাসে মাসে আগামী মাস থেকে তোমার কাছেই পাঠাবো। সংসারের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র তুমি নিজে কিনে দেবে, কেবল রোজ রোজ বাজার খরচের হিসাবে কিছু নগদ টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দিও, তার পর যা কিছু থাক্‌বে, সে টাকা তোমার কাছেই রেখো।"

বিষণ্ণমনে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"সে জন্যে ভাই, তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি যথাসাধ্য তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো।"

গাড়ী সশব্দে ছাড়িয়া দিল। সুবোধচন্দ্র কিছু শূন্য মনে সেই ধাবিত গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে গাড়ী অদৃশ্য হইল, তখন তিনি বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন।

এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে, একদিন নফরার মা আসিয়া সুবোধ বাবুকে কহিল—"দাদা বাবু, মাসীমার সঙ্গে ত মা-ঠাকুরুণের এক তিল বনে না, তিনি আজ খুব ঝগড়া করে কল্‌কেতায় চলে গেছেন।"

সে সংবাদ শুনিয়া সুবোধ বাবু একটু বিস্মিত হইয়া, কহিলেন,—"সে কি? কাজটা ত ভাল হয় নাই, এখন উপায়? আচ্ছা, দোষটা কার?"

নফরার মা উত্তর করিল—"সত্যি কথা বল্‌তে কি দাদা বাবু,—মাসী-মা বড় খিট্‌খিটে। মা-ঠাকুরুণ চিরকাল একলা এক সংসারে খাটিয়েছেন, একজন শাশুড়ী ননদ পর্য্যন্ত কেউ নাই। সে কি এখন কনে বউটির মতন তাঁর কথায় উঠবস্ কর্‌তে পারেন? কাজেই ঝগড়া হয়। মা-ঠাকুরুণ একবারেই গিন্নী বউ হয়েছেন এখন কি আবার কনেবউ-সাজতে পারেন?"

কথাটা সুবোধ বাবুর কতকটা মনোমত হইল বটে, কিন্তু তিনি এই ঘটনায় বড়ই বিব্রত হইলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সংসারের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। প্রথম প্রথম অনঙ্গমোহিণী ঘোম্‌টা দিয়া থাকিত, আর ঝির দ্বারা উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিত। ক্রমে ঘোম্‌টার ভিতর হইতেই দুই একটি করিয়া সুবোধ বাবুর সহিত অনঙ্গমোহিনীর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। শেষে ঘোমটার সে মুখাবরণটা আর রহিল না, একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল। এইবার অনঙ্গমোহিনী খোলা মুখে কথা আরম্ভ করিল। যাইহোক কেবল কথা, কথার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি! আবার কেবল কি সেই হাসি? সে হাসির সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী চাহনি! আবার কেবল কি চাহনি? সে চাহনির সঙ্গে সঙ্গে কেমন গা-জ্বালানি সকল অঙ্গের ভাবভঙ্গী! কিন্তু এ সকল কিছুই সুবোধচন্দ্রের ভাল লাগিল না। এই সকল দেখিয়া তিনি বরং বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এইরূপে প্রায় দেড় মাস কাল কাটিয়া গেল।

( ৪ )

একদিন প্রাতে নফরার মা আসিয়া কহিল—"দাদা বাবু, আজ রাত্রে মা-ঠাকুরুণ আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সন্ধ্যার পর গিয়া আজ আপনি সেখানে আহার করবেন।"

সুবোধ বাবু যেন একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন— "সন্ধ্যার পর কিসের আবার নিমন্ত্রণ?"

নফ্রার মা। সংক্রান্তির দিন, তাঁর কি ব্রত ছিল, সে দিন বামুন খাওয়ান হয় নাই, তাই আজ আপনাকে বামুন খাওয়াবেন।

সুবোধ। দিনের দিন যখন ব্রাহ্মণ খাওয়ান হয় নাই তখন রবিবার খাওয়ালেই চল্বে। তুই তোর মা-ঠাকরুণকে বলিস্—"আজ সন্ধ্যার পর আমি খেতে যেতে পার্বো না, বরং রবিবার দুকুর বেলা গিয়ে খেয়ে আস্বো।

নফরার মা। তা হবে না, দাদা বাবু, মা ঠাকরুণ যে সব উদ্‌যুগ করেছেন, আজই আপনাকে খেতে যেতে হবে।

তখন অগত্যা অনেক জেদাজেদির পর সুবোধ চন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, নফরার মা সে সংবাদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

আজ বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখ। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আর আপিশ হইতে সুবোধ বাবু গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বেই একটা ভয়ঙ্কর জলঝড় আরম্ভ হইল। বৈশাখ মাস বৈকালে এমন দুর্য্যোগ প্রায়ই ত হইয়া থাকে, কিন্তু আজ যে দুর্য্যোগটা যেন ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সুবোধ চন্দ্র নবদুর্গাকে ডাকিয়া কহিলেন "মেজবউ, আজ এ দুর্য্যোগে আমি রাম দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাব না, আমার খাবার তৈয়ার কর্‌তে হবে।"

সুবোধ বাবু কথা কয়েকটি পত্নীকে বলিতেছেন, এমন সময় একটা ছাতি মাথায় লণ্ঠন হস্তে নফরার মা সেই জলঝড়ে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া এইখানে উপস্থিত হইল। তখন সুবোধ বাবু সতৃষ্ণ নয়নে একবার পত্নীর মুখের প্রতি চাহিলেন। নবদুর্গা অমনি কহিল "এই দুর্য্যোগে, যখন নফরার মা এত কষ্ট করে তোমায় ডাকতে এসেছে, তখন তোমার যেতেই হবে। বাড়ীতে আজ তোমার খাওয়া হতে পারে না।"

তখন কাজেই অনিচ্ছা সত্বেও সুবোধ চন্দ্রকে এই দুর্য্যোগ রাত্রে রামময় বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে হইল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভিজিতে ভিজিতে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নবদুর্গা তখনও নিদ্রা যায় নাই। স্বামীর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি গৃহে আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু সেই আলোকে স্বামীর মুখ দেখিয়া নবদুর্গার প্রাণটা ছ্যাক্ করিয়া উঠিল। নবদুর্গা তাড়াতাড়ি কহিল—"তোমায় মুখ অমন শুক্‌নো কেন? কোন অসুখ করে নাই ত?"

সুবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন—"নবী, বড় ভয়ঙ্কর সংবাদ আছে।"

সুবোধচন্দ্র আদর করিয়া নবদুর্গাকে নবী বলিয়া ডাকিতেন। নবদুর্গা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত কহিল—"কি সংবাদ আমায় শীঘ্র বল। তোমার কোন অসুখ করে নাই ত—সেই কথা আমায় আগে বল।"

সুবোধ। না আমার কোন অসুখ নাই।

নবদুর্গা। তবে তোমার মুখ অমন শুক্‌নো কেন—তোমার মুখ দেখে আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে।

সুবোধ। কিন্তু আমার কথা শুন্‌লে, তুমি একবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

নব। কি কথা আমায় বল না।

সুবো। বল্‌বো আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। আজ থেকে নফরার মা হারামজাদীকে আমাদের বাড়ী আর আস্‌তে দিব না—মাগী বড় পাজী।

নব। হাঁ গা কি হয়েছে, আমায় বল না। তোমার দুটি পায় পড়ি—আমায় শীগ্‌গীর বল।

সুবো। আমায় যে আজ রামময়ের স্ত্রী নিমন্ত্রণ করে ছিল, সে কেবল নিমন্ত্রণ খাওয়ান নয়, তার ভিতর আর একটা ভয়ঙ্কর মৎলব ছিল।

নবদুর্গা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কি মৎলব গো! আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে।"

সুবোধ। আমার আয় সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্ব্বনাশ করবার মৎলব আর কি।

নব। ওমা! সে কি গো? কথাটা ছাই, আমায় সব ভেঙ্গেই বল না।

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সে বড় ভয়ঙ্কর কথা—তোমায় বল্‌বো কি তাই একটু ইতস্তত কর্‌ছি। আচ্ছা বলি—কিন্তু দেখ, একথা যেন

কোন রকমে প্রকাশ হয়ে না পরে! আমি যতদূর দেখ্‌লুম, তাহাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, রামময় দাদার স্ত্রী অসতী, আর নফরার মা হারামজাদী তার পাপ পথের প্রদর্শক। মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখেছ—আমার মুখের উপর স্পষ্ট সে কথা বল্‌লে।"

স্বামীর কথা শুনিয়া নবদুর্গার বুকের ভিতর একটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। একটু সামলাইয়া নবদুর্গা আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল—"পোড়ার মুখী, উনুনমুখী, মরুকা—মরুকা—মরুক। এত বড় আস্পর্দ্ধা—বামন হয়ে চাঁদে হাত!"

কেবল মুখের গালি দেওয়া নয়, নবদুর্গা যেন একবারে অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র নবদুর্গার রকম সকম দেখিয়া যেন একটু বিস্মিতভাবে কহিলেন—তোমার এত রাগ কেন নবদুর্গা?"

নবদুর্গা তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। সুতরাং যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—"রাগ হবে না? আমার যে তোমার উপরও রাগ হচ্ছে।"

সুবোধ। কেন—আমার অপরাধ? তুমিইত জেদ করে আমায় সেখানে পাঠালে—আমিও যেতে রাজী ছিলুম না।

নব। আমি কি এর ভিতর এত কাণ্ড আছে জানি? তোমার উপর আমার রাগ হচ্ছে তুমি সেই কালামুখী নফরার মাকে ঝাঁটা মেরে এলে না কেন? আর রামময় বাবুর স্ত্রীর পেটে পেটে এমন বিদ্যা! তুমি বল্‌ছো—তাই আমার একথায় বিশ্বাস হলো। ভদ্রলোকের মেয়ের চরিত্র কি এত খারাপ হতে পারে? এই জন্যই বুঝি মাস-শাশুড়ীকে ঝগড়া করে তাড়িয়ে দিলে? তোমার উপর যখন তাকে দেখবার শুন্‌বার ভার, তার ব্যবস্থা এখন তুমি কি করবে? আমি কিন্তু তোমায় আর সেখানে যেতে দেবো না। সুবোধ চন্দ্র তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আমি শীঘ্রই তার ব্যবস্থা করছি। আমায় কি বিশ্বাস হয় না—নবদুর্গা তখন একটু অপ্রস্তত হইয়া নীরব হইল।

( ৫ )

পাপের স্রোতে যখন কেহ একবার গা ভাসাইয়া দেয়, তখা তার আর রক্ষা থাকে না। ফল শেষে বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। অনঙ্গমোহিনীর দশাও তাহাই হইল। দুই সপ্তাহ পরে সুবোধ চন্দ্র শুনিলেন যে অনঙ্গমোহিনীর ভগনীপতি রাজমোহন বাবু তাহার বন্ধুর গৃহে যাওয়া আশা আরম্ভ করিয়াছেন। একদিন অধিক রাত্রে সেই বাবুটিকে বাহির হইতে দেখিলেন। তখন সন্দেহ হইল বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করা চলে না। শেষে গোপনে থাকিয়া সেই নরকের দৃশ্যই একদিন স্বচক্ষে দেখিলেন। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল।

এখন উপায়? অনেক চিন্তা করিয়া প্রথমে একদিন নফরার-মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সে সাবধানের কোন ফল হইল না। তখন বন্ধুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ তোমার ছুটি লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব, একবার বাড়ীতে আসিতে হইবে। আর দেশে আসিয়াই প্রথমে গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। কোন মতে অন্যথা করিও না, অন্যথা করিলে তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে।"

রামময় সেই পত্রের উত্তরে লিখিলেন—তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী তোমায় নানারূপ দোষারোপ করিয়া আমায় এক পত্র লিখিয়াছে। তোমার পত্র পাইয়া আমিত একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। যাহা হউক, আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে ছুটি লইয়া বাড়ী যাইতেছি। মন এতদূর অস্থির যে ছুটি না পাইলে আমি চাকুরীতে জবাব দিয়া যাব।"

দুই সপ্তাহ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে অনেক কানাঘুসি চলিতে লাগিল। কিন্তু যাক-সে পাপ কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। কুড়ি দিনের দিন, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় রামময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুবোধ চন্দ্রের গৃহে প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"ভাই, ব্যাপার খানা কি—আমায় সব কথা খুলে বল। আমার অনঙ্গমোহিনী ভাল আছে ত?"

সুবোধ। ভাই, তোমার সে ভয় মনে স্থান দিও না। এই মাত্র আসিলে, একটু ঠাণ্ডা হও, তোমায় সে সকল কথা বল্‌বো বলেই ছুটি নিয়ে আনালুম।

রামময় অনেক জেদ করিলেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্র

কৌশলে তখন সে ভয়ঙ্কর কথাটা প্রকাশ করিলেন না। আহারাদির পর, অন্যান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সময় কাটান হইল। ঠিক্ যখন রাত্রি দুপুর, তখন সুবোধ চন্দ্র বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুর গৃহের দিকে চলিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে কথায় কথায় সুবোধ চন্দ্র স্ত্রীলোকের চরিত্রের কথা তুলিলেন। স্ত্রীলোকের চরিত্র মন্দ হইলে, স্বামীর কর্ত্তব্য কি—এ পর্য্যন্ত কথাও উঠিল। এই সময় রামময় বাবুর প্রাণটা হঠাৎ কি জানি কেন ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে বাহির হইল —"আমার অনঙ্গমোহিনীর চরিত্রে সেরূপ কোন দোষ দেখেছ না কি ?"

সুবোধ এবার অনেক কষ্টে কহিলেন—"তাতে বিচিত্র কি ভাই! মনে কর—যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তুমি সে স্ত্রীকে কি কর—আমি সেই কথাই তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। রামময় বাবু দাঁতে দাঁত দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। আমি তা হইলে স্বহস্তে সে স্ত্রীকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলি।"

অন্ধকারে বন্ধুর মুখ-ভঙ্গিমা সুবোধচন্দ্র দেখিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে মনে সে মুখভঙ্গিমা কল্পনা করিয়া লইতে পারিলেন। এ সময় উভয়ে রামময় বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। রামময় সদর দরজার দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই সময় সুবোধচন্দ্র তাহাকে সেদিকে যাইতে বাধা দিয়া কহিলেন—"আমাদের সদর দরজা দিয়া যাওয়া হবে না, খিড়কীর দিকের ছোট পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে চুপি চুপি বাড়ীর মধ্যে যেতে হবে।"

তিনটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রামময় কহিলেন,— "বুঝিয়াছি কিন্তু সে পাপীয়সী যে তোমারই চরিত্রের উপর অন্যায় দোষারোপ করে আমায় পত্র লিখেছিল।"

"সেই জন্যই তোমায় স্বচক্ষে সমস্ত দেখাইব"—এই কথা বলিয়া কৌশলে সেই খিড়কীর দিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে নিঃশব্দে পড়িলেন। সেই রাত্রি দুইপ্রহরের সময় তখনও একটা ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট হাসির ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে দুইজন লোকের কথা বার্ত্তা সেই ঘর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতে ছিল।

কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চালিত হইয়া সেই খোলা জানালার পার্শ্বে দুইজনে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল। মুহূর্ত্তপরেই ঘরের দরজায় সজোরে আঘাত হইতে লাগিল। গৃহের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইয়া—"কেও নফরার মা ?"

"নফরার মা নয়, তোর যম।" কি সর্ব্বনাশ! এ যে অনঙ্গমোহিনীর স্বামীর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠস্বর! গৃহের আলো নিবিয়া গেল।

তার পর সে অর্গলবদ্ধ দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ঘর অন্ধকার! আলো জ্বলিল!. কেবল অনঙ্গমোহিনী পালঙ্গের উপর শুইয়া রহিয়াছে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শিকার দেখিয়া যেমন তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে, ক্রোধান্ধ রামময় বাবু সেইরূপ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। তখন পশ্চাৎ হইতে সুবোধ চন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন—"কর কি ?"

উন্মত্তবৎ রামময় কহিলেন—"এ অবস্থায় মানুষ যা করে তাই, খুন! খুন! খুন!"

"পাগল হলে নাকি ? এ দিকে কে একবার দেখ।" —এই কথা বলিয়া সেই পালঙ্গের নিম্নে ভয়ে থরথর কম্পমান আর এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিল। তখন রামময় তার শিকার ছাড়িয়া নূতন শিকারের দিকে ধাবিত হইল। দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া রামময় তাহাকে সজোরে বাহিরে টানিয়া আনিল! কি পাপ! এ যে রামময় বাবুরই বড় ভায়রা ভাই—রাজমোহন দাদা!

দাদা ত একবারে আধোবদন! দূর হক্—আর এ পাপ চিত্র দেখাইব না। এইখানে এই পাপ নাটকের যবনিকা পাত করাই ভাল। তবে একটা কথা বলি— সেই রাত্রে অনঙ্গমোহিনীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালা হইল। আর রাজমোহন দাদার ডান কর্ণের দীর্ঘতাও কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা হইয়াছিল। শেষে উভয়কে রামময় জন্মের মত সেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। খুন খরাপি কিছুই হইল না।. তার মূল—রামময়ের বন্ধু সুবোধ চন্দ্র। আমরা সেই জন্যই বলি বন্ধু বটে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# আরতি।*

—০:*:০—

আরতি—ভাবুক ভক্তের ভাব-মাতোয়ারা প্রাণে দিব্যদ্যুতি বিকাশ করে। আরতির আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া পথ উদ্ভাসিত হয়। আরতির বাদ্যোদ্যমে আগুয়ান হইবার জন্য প্রাণ উন্মত্ত করিয়া তোলে।

ভক্তের আরতি, ভাবুকের আরতি, কবির আরতি, সেই এক মহান্ ভাবের দ্যোতনা করে। কবি প্রমথ নাথ, ধন্য তুমি! তুমি এমনই ভাবে আরতি করিয়াছ যে,—

'জাগিয়া উঠিছে অযুত ভক্ত
করিতে তোমার আরতি।'

কবি প্রমথ নাথ—একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র। তিনি ঐশ্বর্য্যে যদ্রূপ গরীয়ান্, কবিত্ব-যশ-সিংহাসনে তদ্রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। একাধারে এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিতে পাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হউন; এবং তাহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-সৌন্দর্য্য-সম্ভারে মাতৃভাষার মলিন মুখ উজ্জ্বল করুন।

আরতি—ছোট বড় ১৩টি কাব্য-গাথায় সমলঙ্কৃত। কোথাও ভাবের লহর ছুটিয়াছে, কোথাও কবিত্বের উৎস উৎসারিত হইয়াছে, কোথাও পর দুঃখ কাতরতার অমৃত স্রাবিনী মন্দাকিনী ধারা বহিয়াছে। ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরিয়া পান করি; ইচ্ছা হয়, স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া রাখি! সমবেদনার প্রক্ষেপে "আভীর দম্পতির" মর্ম্মভেদী চিত্র তিনি কি সুন্দর আঁকিয়াছেন,—

* * * * * *

এত বলি,' তেজে বেগে কিছুদূর চলে' যেতে,
কানে এল রোদনের স্বর;
দেখিনু পশ্চাতে চাহি,—লুটায়ে লুটায়ে ভূমে,
বক্ষে হানি কর
কাঁদিছে অভাগা রোগী। লাজে দুঃখে মর্ম্মাহত,
ফিরিয়া আসিনু কাছে তার;
দেখিলাম,—নারী তারে ক্রোড়ে লইয়াছে টানি,
মুছি' অশ্রুধার।
যত্নে প্রবোধিয়া দোঁহে কহিলাম সকাতরে,—
'অকারণে করেছি ভৎর্সনা,
তোমাদের কাছে আমি গুরুতর দোষে দোষী,
করগো মার্জ্জনা!'
চকিতে মুছিয়া অশ্রু চাহিয়া রহিল দীন
ক্ষণকাল মোর মুখ পানে,
কহিল কম্পিত কণ্ঠে—
* * * 'চিরদিন এই ভাবে
কাটে নাই জীবন আমার;
আমারো আছিল গৃহ, কোলাহল মুখরিত
বৃহৎ সংসার,
* * * * * *
রুমালে মুছিয়া আঁখি কহিলাম,—'তার পর'?—
কাহিনী আবার
কহিতে লাগিল যুবা,—"কি আর বলিব? শেষে,
কাল-ব্যাধি ধরিল আমারে;
ঋণে গেল যথাসর্ব্ব, নিমেষে পড়িনু ছুটি'
অকূল পাথারে!
* * * * * *
কে যেন প্রাণের মাঝে বিঁধিতে লাগিল মোরে
কণ্টকের তীক্ষ্ণ কশা দিয়া;
ত্রস্তে দু'টি মুদ্রা রাখি ত্যজিলাম সেই স্থান
নীরবে কাঁদিয়া।
নিরুদ্দেশে ঘুরি ঘুরি ফিরিনু আলয়ে যবে,
মিলাইছে পঞ্চমীর শশী;
জ্বলে কক্ষে ম্লানালোক; ভৃত্য মোর প্রতীক্ষায়
রহিয়াছে বসি;
জানাইনু রুক্ষস্বরে বিস্মিত ভৃত্যেরে,—'মোর
আহারের নাহি প্রয়োজন!'
শয্যা লইলাম যবে, উচ্ছসি উঠিল বেগে
নিরুদ্ধ রোদন!
* * * * * *

"আরতি"র কবিতা প্রাণ-স্পর্শী প্রায় সকল গুলিই, কোনটি রাখিয়া কোন্‌টি দেখাইব। 'গৌরাঙ্গ' শীর্ষক ক্ষুদ্র

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কাব্যে 'চরিতকারগণের বর্ণিত প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য ঘটনাবলীর যথাযথ অনুসরণ' না করিলেও 'বর্ণনীয় চরিত্রগুলির ক্রম-বিকাশ ও ঘটনা নিচয়ের যথাবিন্যাস ও সুসঙ্গতি সম্পাদনে' ত্রুটি করেন নাই। তবে,—'সমালোচনার সমালোচন' এরূপ অভিনব গ্রন্থমধ্যে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

আরতির আরও বিশেষত্ব, সুন্দর ছাপা মসৃণ রেশমী রেব স্বর্ণাক্ষর যুক্ত সুচারু বাঁধাই দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

'আরতি' দর্শনে আমরা সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

---

# প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্যারীচরণ সরকার (জীবন বৃত্ত) শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, 'বিরচিত', সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত ও এল্‌ম প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই।

স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচরণ সরকারের জীবন চরিতে জানিবার শুনিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় আছে। বারান্তরে আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

২। বাঙ্গালীর যশোগান। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ [illegible]ায় প্রণীত। নব্য ভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵১০ [illegible]ঙ্গ কবিতা স্থলে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অধঃপতনের [illegible]ত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চিত্রিত হইয়াছে। ইহার সকল স্থান আমাদের ভাল না লাগিলেও মোটের উপর ইহা [প]াঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি বলিতে পারি। যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের বিষয় চিন্তা করেন তাঁহারা একবার এই পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

৩। মোহ মুদ্গর। শ্রীখেলারাম নন্দী কর্ত্তৃক অনূদিত। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কৃত সুপ্রসিদ্ধ মোহমুদ্গর নামক ১৭টি শ্লোক নন্দী মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মন্দ হয় নাই।

৪। তত্ত্ব-নির্ণয়। শ্রীখেলারাম নন্দী প্রণীত। হর সুন্দর প্রেসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে আরোপিত দোষ স্খালন মানসে মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত নন্দী মহাশয় এই 'তত্ত্বনির্ণয়' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং রাজভক্তির চিহ্ন স্বরূপ ইহা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের নামে উৎসর্গী কৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম ও উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। তাঁহার শ্রম সফল হইলেই আমরা সুখী হইব।

---

# আমার কৈফিয়ৎ।

(গ্রাহকগণের নিকট)।

সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য করিলেই তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আমি পাঁচ মাসের কাগজ একত্রে বাহির করিতেছি সুতরাং গ্রাহকগণের নিকট ইহার একটা কৈফিয়ৎ না দিলে চলিবে কেন? ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে বাকীর বোঝা মস্তকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি; তাহার উপর আমারও কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে। ভাবিয়াছিলাম এই সংখ্যার প্রদীপ যথাকালে আমাদের সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের হস্তে দিতে পারিব। কিন্তু কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। আশা করি আমাদের অনিচ্ছাকৃত এই অপরাধ গ্রাহক গ্রাহিকাগণ কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। এই সংখ্যার প্রদীপ বিলম্বে বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, আমাদের প্রেসে মেসিন ছিল না, সুচারুরূপে প্রদীপ মুদ্রণের জন্য আমরা [illegible]হু ব্যয়ে একটী উৎকৃষ্ট মেসিন প্রেস আনিয়াছি। উক্ত মেসিন খাটাইয়া কার্য্যক্ষম করিবার জন্যও কিছু কাল-বিলম্ব হইয়াছিল।

আমরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা লাভবান হইব বলিয়া প্রদীপ পরিচালন ভার গ্রহণ করি নাই। প্রদীপের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের একখানি মাসিক পত্র অকালে কালগ্রাসে

নিপতিত হইবে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ইহা ভাবিয়াও আমরা প্রদীপের পরিচালনে ব্রতী হইয়াছি। মাতৃভাষার সেবা ও দেশের অশুবিধ হিতসাধনই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা প্রদীপের জন্য কি প্রকার অর্থব্যয় করিতেছি তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই ছয় মাস কাল গ্রাহকদিগকে বিনামূল্যে প্রদীপ প্রদান করা যে কিরূপ বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহাও গ্রাহকগন বিবেচনা করিবেন। বিনামূল্যে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী মহাশয়, সকল গ্রাহকের নিকট হইতেই পঞ্চমবর্ষের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে গ্রাহকগণের প্রাপ্য এই ছয় মাসের কাগজ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া ভূতপূর্ব্ব সত্বাধিকারী মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ করিলাম।

প্রদীপ সকলেরই—সকলেই যদি প্রদীপকে আপনার বলিয়া মনে করেন এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে ইহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্নবান্ হয়েন তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই। আমরা দেশের যাবতীয় সহৃদয় নর নারীর মুখাপেক্ষী হইয়াই প্রদীপ প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্য পাইব না কি? এইত প্রদীপ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল, এই সময়ে সকলেই লেখা দিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া প্রদীপ প্রচার কল্পে সুপরামর্শ দান করিয়া এবং আরোও অশেষ প্রকারে আমাদিগের সাহায্য করিতে পারেন।

আগামী মাস হইতে প্রদীপ পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। প্রদীপের উন্নতির জন্য আমরা যে অধিকতর যত্নবান হইয়াছি ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই হয়ত সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ প্রদীপের ছবি, বিশেষতঃ—লেখা যাহাতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর হয়, তজ্জন্য আমরা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছি। প্রদীপের বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ আড়াই টাকা অগ্রিম দেয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা এত সচ্ছল নহে যে, হাজার হাজার গ্রাহককে ধারে কাগজ যোগাই। সুতরাং আমাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি গ্রাহকগ সকলেই ষষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেন, অথবা ভিঃ পিঃ পোষ্টে প্রদীপ পাঠাইয়া মূল্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা বড়ই উপকৃত ও বাধিত হই। আমরা জানি, ভিঃ পিঃ পোষ্টে কাগজ পাঠাইলে কোন কোন গ্রাহকের বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বাহ্নেই এ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আমরা কিন্তু ভিঃ পিঃ পোষ্টই গ্রাহকগণের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ করি। যেহেতু ইহা দ্বারা তাঁহারা মণিঅর্ডার করিবার পরিশ্রম হইতে রেহাই পান। ভিঃ পিঃ ও মণিঅর্ডার খরচা উভয়ই তুল্য।

এই সংখ্যায় পঞ্চমবর্ষের সম্পূর্ণ সূচী সন্নিবিষ্ট হইল। আমাদিগের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও তিনটি প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মোটের উপর এই সংখ্যায় ৪ চারি ফর্ম্মা কম রহিল, অবশ্য কালবিলম্ব হেতু গ্রাহকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে আরও কালবিলম্ব করিয়া ঐ চারি ফর্ম্মা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল না। তবে আমরা এই বৎসরের অবশিষ্ট চারি ফর্ম্মা ষষ্ঠ বর্ষে পূরণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। গ্রাহকদিগকে প্রতারিত করিয়া চারি ফর্ম্মা কম করা হইল ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ষষ্ঠ বর্ষে ৪৮ ফর্ম্মা স্থলে গ্রাহকগণ ৫২ ফর্ম্মা পাইবেন।

অনুগ্রহপ্রার্থী
শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।